বৌদ্ধ দর্শনে কর্মবাদ: স্বরূপ অন্বেষণ

এম.ফিল ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

গৌতম দাস
এম. ফিল গবেষক
রেজি নং : ১৬৬/২০১৫-২০১৬
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রফেসর ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
তত্ত্বাবধায়ক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম. ফিল গবেষক গৌতম দাস কর্তৃক উপস্থাপিত ‘বৌদ্ধদর্শনে কর্মবাদ : স্বরূপ অন্বেষণ’ শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্যকোনো প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া)
অধ্যাপক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
ও
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকার পত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, 'বৌদ্ধ দর্শনে কর্মবাদ: স্বরূপ অন্বেষণ' শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার এম. ফিল ডিগ্রি অর্জনের গবেষণা কর্ম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধি-ধিান অনুয়ায়ী আমি গবেষণাকমর্টি সমাপ্ত করেছি। এটির পূর্ণ অথবা আংশিক কোনো অংশ প্রকাশের জন্য আমি কোথাও জমা করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

(গৌতম দাস)
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং- ১৬৬/২০১৫-২০১৬
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বৌদ্ধ দর্শনে কর্মবাদ : স্বরূপ অন্বেষণ' শীর্ষক গবেষণা কর্মটি আমার জন্য খুবই দূরুহ ব্যাপার ছিল। গবেষণা কর্মটি করতে গিয়ে আমি অনেকের নিকট ঋণী। বিশেষ করে আমার প্রিয় শিক্ষক এবং গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গবেষণা কর্মটি সমাপ্ত করার জন্য আমাকে যেভাবে পরামর্শ, উপদেশ ও তাগিদ দিয়েছেন তা কখনো ভুলে যাবার মতো নয়। তিনি আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতা সাথে সহায়তার না করলে এই গবেষণা কর্ম শেষ করা আমার পক্ষে কখনো সম্ভবপর হতো না। এ জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে গভীর ভাবে স্মরণ করছি।

এছাড়া বিভাগের অন্যান্য সম্মানিত শিক্ষকগণও বিভিন্ন ভাবে আমাকে সহায়তা ও পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন : অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. সুমন কান্তি বড়ুয়া, সহযোগী অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া, প্রভাষক রত্না রানী দাস, জ্যোতিস্বী চাকমা, আশিকুজ্জামান খান কিরণ, শামীমা নাসরিন, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া প্রমুখ শিক্ষকগণ। তাছাড়া যাঁর অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ ব্যতীত গবেষণা কর্মটি পূর্ণতা পেতো না , তিনি হলেন বিভাগের সম্মানিত সহযোগী অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় ড. নীরু বড়ুয়া। তিনি বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে বেগবান করেছেন। এজন্য সকল শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদেরকে আমি গভীর কৃতজ্ঞতাসহ ধন্যবাদ জানাই।

আমার মা মিসেস গীতা রানী দাস ও বাবা নৃপেন্দ্র নাথ দাস তাঁরা দুইজনই সবসময় উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কর্মে আমাকে নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁদেরকে স্মরণ করছি। আমার সহধর্মিনী মিসেস প্রিয়াংকা রানী দাস অনেক পরিশ্রম করে যেভাবে আমার থিসিস জমা দেয়ার কাজে সহায়তা করেছেন তা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তার কখনো ঋণ শোধ করা যাবে না। আমার বড় বোন নন্দিনী দাস ও স্নেহের ছোট বোন নীলিমা রানী দাস এই গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করার ব্যাপারে সবসময় আমার পাশে নানাভাবে উৎসাহ ও সাহায্য করেছেন। তাদের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

এছাড়া আমার এই গবেষণা কর্মের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে। তাদের সাহায্য ব্যতীত এই গবেষণা কর্মের মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত ও রেফারেন্স সংগ্রহ করা কখনো সম্ভবপর হতো না। বিভাগীয় সকল কর্মকর্তা কর্মচারী বিশেষ করে মি. বিশ্বজিৎ বড়ুয়া, ড. মৈত্রী তালুকদার, মি. অঞ্জন বড়ুয়া বিটু এবং অভি বড়ুয়া আমাকে বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করেছেন। তাছাড়া আমার দুই বন্ধুবর রোমানা পাপড়ি ও শাহানা পারভীন সীমা আমাকে বিভিন্ন সময় উৎসাহ জুগিয়ে ও বিভিন্ন তথ্য প্রদানে সহায়তা করে আমাকে সাহায্য করেছেন। এজন্য আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ। সর্বশেষ আমার

Dhaka University Institutional Repository

থিসিস কম্পোজ করার কাজে যিনি আমাকে সাহায্য করেছেন তার কথা না বললেই নয়। আমার সম্পূর্ণ কাজটিতে যার অবদান রয়েছে তিনি হলেন রাজ মণ্ডল দাদা। তিনি আমার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে লেখাটি কম্পোজ করেছেন। তাঁর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

অভিসন্দর্ভটি শুদ্ধ ভাবে লেখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। ভুলত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ করছি।

গৌতম দাস
এম.ফিল গবেষক
রেজি নং-১৬৬/২০১৫-২০১৬
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদ : উৎস সন্ধান

দ্বিতীয় অধ্যায় : বৌদ্ধ কর্মবাদ : প্রায়োগিক ব্যবহারের স্বরূপ অন্বেষণ

তৃতীয় অধ্যায় : কর্মের শ্রেণি বিভাজন

চতুর্থ অধ্যায় : জাতক সাহিত্যে বর্ণিত কর্মবাদ তত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা

উপসংহার

সহায়ক গ্রন্থ

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর উপদেশের মধ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সমগ্র দর্শনের আধার বা আশ্রয়। কুশল-অকুশল, ভালো-মন্দ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকেই আমার সচরাচর কর্ম বলে অভিহিত করি। আবার অন্যভাবেও বলা যায়, চিত্ত ও চৈতসিকের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অভিব্যক্তিই কর্ম। তবে যেকোনো কর্ম আগে চিত্তে উৎপন্ন হয় তারপর কায়িক সহযোগে তা সংগঠিত হয়। প্রতিটি কর্মই অপর একটি কর্মের সাথে ওতোপ্রেতভাবে জড়িত। বুদ্ধ মনে করেন, কর্মনিয়ম যান্ত্রিক নিয়ম নয়। নিয়মটি স্বীকার করে যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ তিনটির মধ্যে মানুষ ইচ্ছা করলে তার পূর্বতন কর্মের পরিবর্তন করে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তর করতে পারে। এমনকি অমৃতময় মুক্তি লাভ (নির্বাণ) করতে পারে। এরূপ নিজের কৃতকর্মের নিয়ন্ত্রক অন্যকেউ না হয়ে মানুষের উপর নির্ভর হওয়ায় মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে আরো বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের যাপিতজীবনে প্রাণীদের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে অসংখ্য মতবাদ রযেছে। তবে বুদ্ধ মতে, বৈষম্যের অন্যতম কারণ কর্ম। এখানে কর্মকে মানসিক কার্য-কারণ বিধি-বিধান বলা হয়। কর্মের অনুসিদ্ধান্তই হলো পুর্নজন্ম। বলা বাহুল্য, কর্ম এবং পুর্নজন্ম একে-অপরের পরিপূরকও বটে। মহামতি গৌতম বুদ্ধই সর্বপ্রথম প্রজ্ঞোচিত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্য উপস্থাপন করেন।

জীবের জীবন হচ্ছে কর্ম নির্ভর। কর্মের বিশ্বব্যাপী শক্তি সমস্ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কর্মের বিচিত্র ও বহুমুখি শক্তির কারণে জীবনপ্রবাহ অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলছে।কুশল ও অকুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে, কর্মের বিভাজনে কেউ কেউ ব্রহ্মলোক, কেউ দেবলোক, কেউ মনুষ্যলোক আবার কেউ অন্য প্রাণীরূপে জন্ম গ্রহণ করছে। বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে কর্মবাদ। নীচ কূলে জন্মগ্রহণ করে সুকর্ম করে সে পরবর্তীতে উচ্চ স্থানে আসীন হচ্ছে আবার উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করে ও দুস্কর্মের মাধ্যমে তার পদমর্যাদা হারিয়ে সে তার স্থান হচ্ছে নীচুকূলে। সুতরাং কর্মই বন্ধু আবার দুষ্কর্মই তার শত্রু। বুদ্ধ বলেন কর্মফল অচিন্তনীয় এবং জগতে কর্মই শ্রেষ্ঠ। কর্মের অসাধারণ ও বিচিত্র শক্তি দার্শনিক সমাজকে মুগ্ধ করেছেন।

প্রত্যেক মানুষই আলাদা চরিত্র আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদের মধ্যে কেউ স্বল্পায়ু, আবার কেউ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী, কেউ সুন্দর আবার কেউ কুৎসিত, কেউ ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী, আবার কেউ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, কেউ অন্ধ, বধির, প্রতিবন্ধী আবার কেউ অনেক উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী। কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ রোগী, কেউ নিরোগ, কেউ জ্ঞানী, কেউ অজ্ঞানী ইত্যাদি কর্ম ফলের কারণেই হয়ে থাকে। কারণ প্রাণী মাত্রই কর্মের অধীন। মহামতি বুদ্ধের মতে, মানুষে মানুষ প্রাণীতে প্রাণীতে এ বৈষ্যমের কারণ হচ্ছে কর্ম।

কর্মই প্রাণীগণকে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পদ প্রদান করে। তাদের উৎপত্তির কারণ, কর্ম বন্ধু, কর্ম প্রতিশরণ। কেননা, কর্মই হীন-উৎকৃষ্টরূপে বিভক্ত করে। এই কর্মপরিণতির সবিস্তার গৌতম বুদ্ধ শুভ মানবককে উপলক্ষ করে চুল্লকর্মবিভঙ্গ সূত্রে মানুষের বৈষম্যের কারণ প্রদর্শন করে বলেন : মানুষ মাত্রই কর্মের অধীন। কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কর্ম তাদের উৎপত্তির কারণ, কর্ম বন্ধু, কর্ম প্রতিশরণ। কেননা, কর্মই হীন-উৎকৃষ্টরূপে বিভক্ত করে। বুদ্ধ বলেন: জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, কৃষক, শিল্প, বণিক, চাকর, চোর, যুদ্ধজীবী, যাজক ইত্যাদি হয়। এই জন্য প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শনকারী ও কর্মফলে বিশ্বাসী পণ্ডিত কর্মকে সম্যকভাবে দর্শন করে সতত সুন্দরভাবে জীবন যাপন করেন।

বুদ্ধ তাঁর দর্শনে কর্মবাদকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর সমগ্র দর্শনে কর্মবাদকে জানার জন্যই আমি উপরি-উক্ত শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করি। আমার গবেষণা কর্মের অধ্যায় উপসংহারসহ অধ্যায় পাঁচটি। অধ্যায়গুলো হলো : প্রথম অধ্যায়: বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদ : উৎস সন্ধান; দ্বিতীয় অধ্যায় : বৌদ্ধ কর্মবাদ : প্রায়োগিক ব্যবহারের স্বরূপ অন্বেষণ; তৃতীয় অধ্যায় : কর্মের শ্রেণি বিভাজন; চতুর্থ অধ্যায়: জাতক সাহিত্যে বর্ণিত কর্মবাদ তত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা এবং উপসংহার। প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে আমি যথাসাধ্য আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

প্রথম অধ্যায়

বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদ : উৎস সন্ধান

পৃথিবীতে যতোগুলো ধর্ম বা যতগুলো দর্শন রয়েছে তন্মধ্যে বৌদ্ধ দর্শন আপন আলোয় আলোকিত যা ভারতীয় দর্শনে অন্যতম স্থান দখল করে আছে। বৌদ্ধদর্শনের মূল উপজীব্য হলো বুদ্ধের বাণীগুলোর বাস্তব রূপ প্রকাশ করা। বৌদ্ধদর্শনে ধারণাগুলোর স্বরূপ আলোচনার পর পুনরায় মধ্যপন্থায় ফিরে আসার প্রবণতা পুনঃপুন আলোচিত হয়েছে।[১] বৌদ্ধ দর্শনে কোনো দেব-দেবীর সন্তুষ্টির জন্য পূজা বা কোনো প্রকার অন্ধ বিশ্বাসের স্থান দেওয়া হয়নি। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বাণী ধর্ম হিসেবে নয়, বরং দর্শন হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে। তাঁর বাণী ও উপদেশের উপর ভিত্তি করে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে যে মতবাদ গড়ে উঠেছে তাই বৌদ্ধ দর্শন।[২] বৌদ্ধ দর্শন হচ্ছে কীভাবে দুঃখময় জগৎ পাড়ি দিয়ে দুঃখ জয় করা যায়।

খ্রি. পূর্ব ষষ্ঠ অব্দে মহামতি গৌতম বুদ্ধের জন্ম। উল্লেখ থাকে যে, কপিলাবস্তু থেকে পিত্রালয়ে যাওয়ার সময় লুম্বিনী কাননে (বর্তমান নেপাল) তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম রাখা হয় সিদ্ধার্থ। পারিবারিক উপাধি 'গৌতম' নামের সাথে সংযুক্ত হলে তার নাম হয় সিদ্ধার্থ গৌতম। জন্মের প্রথম সপ্তাহ পর সিদ্ধার্থ মাতৃহারা হোন। তখন তাকে লালন-পালন করেন বিমাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী। শৈশব থেকেই সিদ্ধার্থ গভীর চিন্তামগ্ন হয়ে থাকতেন। রাজা শুদ্ধোধন এ অবস্থা পরিলক্ষিত করে ১৯ (উনিশ) বছর বয়সে যশোধরা নামের পরম সুন্দরী যুবতীর সাথে তাঁর বিয়ে দেন। নানারকম ভোগ বিলাসের ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু এ ভোগ বিলাস সিদ্ধার্থকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। কথিত আছে, সিদ্ধার্থ নগর পরিভ্রমণের সময় চারিনিমিত্ত অর্থাৎ, ক. কঙ্কালসার এক বৃদ্ধ, খ. বেদনা কাতর এক রোগী, গ. শ্মশানের দিকে নিয়ে যাওয়া একটি মৃতদেহ এবং ঘ. সৌম্য মূর্তি এক সন্ন্যাসী রোগ, শোক ও দুঃখের কারণ বের করার জন্য সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। ২ (উনত্রিশ) বছর বয়সে তার যেদিন প্রথম পুত্র সন্তান রাহুলের জন্ম হয় ঠিক সেদিনই তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে সংসার ত্যাগ করেন।

সংসার ত্যাগী রাজপুত্র যখন অনিশ্চয়তার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে পাহাড় ঘেরা রাজগৃহের কাছে এসে পৌঁছালেন, তখন তিনি আলাঢ় কালাম ও উদ্রক রামপুত্র নামে দুই মুনি ঋষির সংস্পর্শে আসেন। বেশ কিছুদিন জ্ঞান সাধনার পরেও দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের নিশ্চিত কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না। তিখন তিনি ভাবলেন, কঠোর কৃচ্ছসাধনা করলে হয়তো দুঃখের হাত থেকে মুক্তি সম্ভব। নাম মাত্র খাওয়া ও বিশ্রাম নিয়ে তিনি কঠোর ধ্যান মগ্ন হয়ে দুঃখ মুক্তির উপায় খুঁজতে লাগলেন। কঠোরতম কৃচ্ছ সাধনে তিনি চিরমুক্তির পথ যেহেতু খুঁজে পেলেন না, তাই তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি এই ধরনের চিন্তা করার সময়, সুজাতা নামক এক মহিলা পায়াসন্ন নিয়ে উপস্থিত হোন। পায়াসন্ন খেয়ে তিনি কিছুটা সুস্থবোধ করলেও

তাঁর দীর্ঘদিনের সহচর, পাঁচ সন্ন্যাসী কৌণ্ডিন্য, মহানাম, অশ্বজিৎ, বপ্প, ভদ্রিয় যাঁরা দীর্ঘদিন তাঁর ছায়া সহচর ছিলেন তাঁরা তাকে ভুল বুঝে ত্যাগ করলেন। তাঁদের মধ্যে ধারণা জন্মাল, এতদিন কঠোর তপস্যার পরেও তার মধ্যে কামভাব রয়ে গেছে। তাই যার মধ্যে কামভাব এখনো বিদ্যমান, সে গুরুর শিষ্য হয়ে থাকার কোন আবশ্যকতা নেই। তারা সিদ্ধার্থ গৌতমকে ত্যাগ করে সারনাম নামক স্থানে গিয়ে নতুন করে সাধনা শুরু করল।

সুদীর্ঘ ছয় বছর কঠোর সাধানার পর সিদ্ধার্থ গৌতম পরম জ্ঞান লাভ করে 'বুদ্ধ' (আলোকপ্রাপ্ত মানুষ) হোন। বুদ্ধত্ব লাভ করার পর তিনি তার সাধনালব্ধ পরমসত্যকে বলার জন্য গেলেন তাঁর সেই পপঞ্চশিষ্যের কাছে বেনারসের অদূরে সারনাথে। তুলে ধরলেন সেই বিখ্যাত পরম সত্য চারি আর্যসত্য। এই সত্য চারটি হলো:

- ❖ জগতে দুঃখ আছে
- ❖ দুঃখের কারণ আছে
- ❖ দুঃখ নিরোধ আছে
- ❖ দুঃখ নিরোধের উপায় আছে।[৩]

চতুরার্য সত্যকে বুদ্ধের প্রধানতম শিক্ষাপদ হিসেবে ধরা হয়। সারাজীবন তিনি চারসত্যের শিক্ষাকে বার বার তাঁর শিষ্যদের শিক্ষা দিয়েছেন।[৪] বুদ্ধ দুঃখ থেকে নিবৃত্তির জন্য ৮টি পথ দেখিয়েছেন যা আর্য আষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে পরিচিত।[৫] এই আটটি উপদেশ বা পথ সম্যক প্রজ্ঞা, সম্যক শীল ও সম্যক সমাধি এই তিনটি ভাগে বিভক্ত। সম্যক প্রজ্ঞা হলো সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্প এই দুই ভাগে বিভক্ত। কায়িক, বাচনিক ও মানসিক কর্মের সঠিক জ্ঞানই হলো সম্যক দৃষ্টি।অহিংসা, চুরি না করা, সত্য কথা বলা হলো কায়িক সুকর্ম। কারো নিন্দা না করা, সুন্দর কথা বলা ও লোভ না করা হলো বাচনিক সুকর্ম এবং মিথ্যা না বলা কারো প্রতি প্রতিহিংসা পরায়ণ না হওয়া হলো মানসিক সুকর্ম।

সম্যক শীল তিন প্রকার । সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকা। মিথ্যা না বলা, পরনিন্দা না করা, সত্য বলা, অতিকথন ত্যাগ হলো সম্যক বাক্য। অহিংসা, চুরি না করা, ব্যাভিচার না করা হলো সম্যক কর্ম এবং অসৎ পন্থা ত্যাগ করাকে সম্যক জীবিকা বলে।

সম্যক সমাধি ও তিন প্রকার। সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। ব্যায়াম, কুচিন্তা ত্যাগ এবং সৎ চিন্তা স্থায়ী করার চেষ্টা হলো সম্যক চেষ্টা। কায়া, বেদনা ও চিত্তের সঠিক স্থিতি সমূহ ও তাদের বিধ্বংসী চরিত্রকে সব সময় মনে রাখাকে সম্যক স্মৃতি এবং চিত্তের একাগ্রতাকে সম্যক সমাধি বলে।[৬]

গৌতম বুদ্ধ দ্বিতীয় আর্যসত্য অর্থাৎ, দুঃখের কারণ আছে তা চমৎকার ভাবে প্রমাণ করেছেন দ্বাদশ নিদান বা প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের মাধ্যমে। এর আরেক নাম ভবচক্র।

বুদ্ধ বলেছেন ১. দুঃখের কারণে জরা মরণ ২. জরা মরণের কারণে জন্ম ৩. জন্মের কারণে ভব ৪. ভবের কারণ উৎপাদন ৫. উৎপাদনের কারণ তৃষ্ণা ৬. তৃষ্ণার কারণ বেদনা ৭. বেদনার কারণ স্পর্শ ৮. স্পর্শের কারণ ষড়ায়তন ৯. ষড়ায়তনের কারণ নামরূপ ১০. নামরূপের কারণ বিজ্ঞান ১১. বিজ্ঞানের কারণ সংস্কার ১২. সংস্কারের কারণ অবিদ্যা।[৭]

প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের উপর মূলত মহামতি গৌতম বুদ্ধের কর্মবাদ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। এই কর্মবাদের উপর ভিত্তি করে মানুষ তার কৃতকর্মের ফল পায়। যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে। কর্মফল কখনোই নষ্ট হয় না। কর্মফলের মধ্যেই কর্ম লুকায়িত থাকে। বুদ্ধের কর্মবাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো অতীত কর্মের সংস্কারের ফলই হচ্ছে আমাদের বর্তমান জীবন। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে (As you sow, so you shall reap) অর্থাৎ, যেমন বপন করা হবে তেমন ফলই পাওয়া যাবে । ভালো কর্ম করলে তার ফল ও ভালো হবে আবার কুকর্মের ফলাফল ভয়ংকর ভাবেই আসবে। বৌদ্ধ দর্শন অনুসারে, আমাদের কর্ম ফল ভোগ করতেই হবে। এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হবে না। বাতাসের প্রচণ্ড বেগ আমাদের কর্মফলকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে না, আবার আমাদর কৃতকর্ম আমরা আকাশে বা সাগরে লুকাতে পারি না। সমগ্র পৃথিবীর কোন স্থানেই আমরা পাপকে লুকাতে পারি না।

লোহা যেমন নিজ দেহে মরিচার সৃষ্টি করে এবং মরিচাই লোহাকে ব্যবহার অনুপযোগী করে ফেলে তেমনি পাপকর্ম আমাদের জীবনকে ক্রমশ দুঃখের দিকে ধাবিত করে। এভাবে সারা জীবন মানুষ তার কর্মের বিধানের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। অতীত কর্মের দ্বারা মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবন পরিচালিত হচ্ছে। কার্যকারণ বা দ্বাদশ নিদানের বিধির উপরই এই কর্মবাদ প্রতিষ্ঠিত।[৮] Edward Conze সংস্কৃত ধর্মপদ গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। এখানে তিনি কর্মবাদ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন :

> "Even a flight in the air cannot free you from suffering,
> After the deed which is evil has once been committed.
> Not in the sky nor in the ocean's middle,
> Nor if you were to hide in cracks in mountains,
> Can there be found on this wide earth a corner
> Where karma does not catch up with the culpit...
> Whatever deeds a man may do, be they delightful, be they bad,
> They make a heritage for him; deeds do not vanish without tracce.....
> The iron itself creates the rust,
> Which slowly is bound to consume it.
> The evil-doer by his own deeds

Is led to a life full of suffering."[৯]

বুদ্ধ কোনো কারণ ব্যতীত অযথা কথা বলা, মিথ্যা তর্ক, অর্থহীন দর্শন পছন্দ করতেন না। মানুষের চিরন্তন দুঃখ জয় ও বিমুক্তির জন্য যা দরকার, তা তিনি সবার কাছে প্রচার করতেন। মানুষের আজন্ম দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের উপায় দিতেন। পরবর্তীতে এই সব উপদেশ ও বাণী ধর্মদর্শন হিসেবে পরিচিত লাভ করে এবং বৌদ্ধ দর্শন নামে আখ্যায়িত হয়।

বৌদ্ধ দর্শন হচ্ছে সম্পূর্ণ প্রয়োগিক দর্শন, যা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের গতানুগতিক দর্শনের পর্যায়ে পরে না। মানবমুক্তি ও কল্যাণে বৌদ্ধ দর্শন চিরমুক্তির পথ প্রদর্শন করে। বুদ্ধ সর্বদা কুশল জ্ঞানের কথা বলেছেন। তিনি শ্রুতময়, চিন্তাময়, ভাবনাময় রূপে জ্ঞানকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। গ্রন্থপাঠ বা কথাবার্তা শুনে অর্জিত জ্ঞান হলো শ্রুতময় জ্ঞান, গবেষণা ও চিন্তাময় প্রসূত জ্ঞান হলো চিন্তাময় জ্ঞান এবং ধ্যান ও ভাবনার মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান হলো ভাবনাময় জ্ঞান। শ্রুতিময় ও চিন্তাময় জ্ঞান যেখানে তাত্ত্বিক জ্ঞানের দিক নির্দেশ করে, সেখানে ভাবনাময় জ্ঞান হলো প্রায়োগিক জ্ঞান। মহামতি প্রায়োগিক জ্ঞানকেই মূলত গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাবনাময় জ্ঞানের পরিধি চিন্তাময় জ্ঞানের পরিধি অপেক্ষো অনেক বেশী এবং এই ভাবনাময় জ্ঞান দ্বারা চিরতরে মুক্ত হওয়া যায়। অনেকে গৌতম বুদ্ধের দর্শনকে দুঃখবাদী দর্শন বললেও আসলে এই দর্শন হলো দুঃখ নিরোধবাদী দর্শন। বৌদ্ধ দর্শনের মূলকথা হচ্ছে, জীবনের দুঃখ নামক সত্যতা উপলব্ধি এবং এই দুঃখ জয়ের উপায়। তিনি দুঃখকে সত্য হিসেবে ধরে তা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন। বৌদ্ধদর্শনে আছে দুঃখময় সংসার পাড়ি দেবার কথা, তাই এই দর্শন হচ্ছে দুঃখ জয়ের দর্শন।

বৌদ্ধ দর্শনের বিকাশ হয়েছে প্রতীত্যসমুৎপাদ তত্ত্বের মাধ্যমে। এই তত্ত্বের মাধ্যমে মহামতি জীবন ও জগতের স্বরূপ ব্যাখ্যার মাধ্যমে দুঃখের উৎপত্তি ও স্বরূপের এবং এর নিরসনের উপায় দেখিয়েছেন। মানুষ তার কর্মানুসারে বিভিন্নকুলে জন্মগ্রহণ করে এবং মুক্তি লাভ না করা পর্যন্ত আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুবরণ করে, আবার জন্মগ্রহণ করে। এভাবে ভবচক্র চলতে থাকে। এর অর্ন্তনিহিত কারণ রূপে তিনি বারোটি কারণের কথা বলেছেন যার শুরুতেই রয়েছে অবিদ্যা। অবিদ্যার কারনেই এই ভবচক্র চলমান থাকে। অবিদ্যার কারণে জাগতিক বস্তুকে স্থায়ী মনে হয়। কিন্তু, জগৎ স্থায়ী না, এটি নিত্য পরিবর্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। এখানে এক জিনিসের উৎপত্তি হচ্ছে তো আরেকটির বিনাশ হচ্ছে। সুতরাং-এ দুঃখময় জগতে আসক্তি থাকলে ভবচক্রে ঘুরপাকের মাধ্যমে বারবার কষ্ট পেতে হয়, তাই সমস্ত তৃষ্ণা ক্ষয় করে চরম মুক্তি বা নির্বান লাভ করাই যথার্থ।[১০]

বৌদ্ধ দর্শনের কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যার কারণে এই দর্শন অন্যান্য দর্শন থেকে আলাদা। বৈশিষ্ট্য গুলো[১১] হলো :

- বুদ্ধের উপদেশ, চিন্তাধারা ও বাণীই এই বুদ্ধের দর্শনের মূলভিত্তি।
- যুক্তি ব্যতীত এই দর্শনে কোনো কিছু গৃহীত হয় না
- অলৌকিক অতীন্দ্রিয়, অতিজাগতিক, অন্ধবিশ্বাসের স্থান বৌদ্ধ দর্শনে নেই।
- কোনো দেব দেবীর সন্তুষ্টির জন্য পূজা অর্চনার বিধি বিধান নেই।
- অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে প্রজ্ঞা ও শ্রদ্ধার স্থান পেয়েছে
- এখানে কোন উপদেশ বা মতবাদ অন্ধভাবে বা নির্বিচারে বিশ্বাস করতে বুদ্ধ নিষেধ করেছেন।
- অলৌকিক ধ্যান ধারণা ও রহস্যবাদ থেকে এই দর্শন মুক্ত।
- জ্ঞানের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নিছক বিশ্বাসের কোনো স্থান এই দর্শনে নেই।
- বুদ্ধ এই জগৎকে বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। তার ভাষিত বক্তব্য যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক
- বিশ্লেষণ দ্বারা তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। অন্য দর্শন যেখানে বিশ্বাসকে প্রাধান্য দিয়েছেন, সেখান বৌদ্ধ দর্শনে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণই অগ্রগণ্য।
- দুঃখময় জীবন ও এ থেকে পরিত্রাণের উপায় স্বরূপ ও দর্শনে চতুরার্য সত্য এসেছে। এর ব্যাখা এসেছে। পরিত্রাণের উপায় ও দর্শনে লিপিবদ্ধ হয়েছে।
- বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের কারণ স্বরূপ কার্যকারণ সম্পর্কের কথা এসেছে। কোনো একটি ঘটনা একটি আরেকটি অন্য ঘটনা থেকে উদ্ভূত, জগতে কোন কিছুই এমনি এমনি হয় না। অবিদ্যার কারণে মানুষ ভবচক্রে ঘুরতে থাকে। বৌদ্ধ দর্শনে একে প্রতীত্যসমুৎপাদ বলা হয়। এখানে দুঃখের কারণ বুদ্ধ ভবচক্রের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।
- দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় স্বরূপ বুদ্ধ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথাও উল্লেখ করেছেন। সম্যক শীল, সমাধি প্রজ্ঞা এই তিন ভাগে দুঃখ মুক্তি লাভে মোট আটটি উপায় বর্ণনা করেছেন।
- শুদ্ধতত্ত্ব জিজ্ঞাসা বা অধিবিদ্যায় বুদ্ধ আগ্রহ না দেখিয়ে জীবনমুখী দর্শনে তিনি মনোনিবেশ করেছেন। সমস্যা সমাধানে অপ্রয়োজনীয় জিনিসকে বুদ্ধ সর্বদা অগ্রাহ্য করেছেন। জগৎ কি নিত্য বা অনিত্য, সসীম না অসীম, ঈশ্বর আছেন নাকি নেই এই ধরনের তত্ত্ব বিচারে বুদ্ধ অনাগ্রহ পোষণ করেছেন। কারণ এতে দুঃখের কোনো অবসান হয়না, জীবনের লক্ষ্য ও অর্জিত হয় না। এতে শুধু মাত্র সময়ের অপচয় হয়।
- বৌদ্ধ দর্শন অত্যন্ত বাস্তববাদী দর্শন। পৃথিবীর জীব ও জগৎকে নিয়েই এই দর্শন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখানে দুঃখ জর্জরিত জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ দেখানো হয়েছে।
- তাছাড়া বৌদ্ধ দর্শনে অনাত্মবাদ, জন্মান্তর বা পুনর্জন্মবাদ, মানবতাবাদ, ঈশ্বর ও বিশ্বতত্ত্ব, নির্বাণ

মতবাদ সহ আর ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই মতবাদ গুলোর গভীর ব্যাখায় মানুষ মুক্তির দিশা পেয়েছে, পাশাপাশি হয়েছে জ্ঞানে সমৃদ্ধ, উদারমনা, যুক্তিবাদী ও জীবনমুখী।

- বৌদ্ধ দর্শনে কোনো প্রার্থনা নেই। প্রার্থনার মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব নয়। এখানে অতি জাগতিক কিছু নেই। বৌদ্ধ দর্শনে মানুষের মুক্তিদাতা মানুষ নিজেই। মানুষ নিজেই নিজেকে মুক্তি দিতে পারে।

মানবতাবাদী দর্শনের ভিত্তিস্বরূপ মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য বিধাতা। কর্মের মাধ্যমে মানুষের মূল্যায়ন হবে। যে যেমন কর্ম করবে, তার ফলও সে সেইরূপ ফল ভোগ করবে। কর্মের দ্বারা মানুষ যেমন উন্নত জীবন লাভ করতে পারে, তেমনি কর্মই মানুষকে হীন জীবনও প্রদান করে।[১২]

কর্মবাদ : বিষয় ও প্রকরণ

সংস্কৃত 'কৃ' ধাতু থেকে কর্ম শব্দের উদ্ভব, যার অর্থ হচ্ছে কাজ করা। কর্ম মানুষের ইচ্ছা শক্তির প্রকাশ। যে মতবাদ অনুসারে মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। সেই মতবাদকেই কর্মবাদ বলে। কর্মবাদের এই নীতি অলঙ্ঘনীয়, ব্যতিক্রমহীন বা সর্বজনীন। সব মানুষকেই তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে, হোক তা সুকর্ম বা হোক তা দুস্কর্ম। এটি একটি সার্বজনীন বিধি। প্রত্যেকটি কার্যের যেমন কারণ থাকে, তেমনি প্রত্যেকটি কর্মেরও ফল থাকে। কর্ম ও কর্মফল কার্যকারণ সম্বন্ধে যুক্ত।[১৩]

জীবের জীবন হচ্ছে কর্ম নির্ভর। কর্মের বিশ্বব্যাপী শক্তি সমস্ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রন করছে। কর্মের বিচিত্র ও বহুমুখী শক্তির কারণে এই জীবন প্রবাহ অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলছে।কুশল ও অকুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে, কর্মের বিভাজনে কেউ কেউ ব্রহ্মলোক, কেউ দেবলোক, কেউ মনুষ্যলোক আবার কেউ অন্য প্রাণী রূপে জন্ম গ্রহণ করছে। বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে কর্মবাদ। নীচ কূলে জন্মগ্রহণ করে সুকর্ম করে সে পরবর্তীতে উচ্চ স্থানে আসীন হচ্ছে আবার উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করে ও দুস্কর্মের মাধ্যমে তার পদমর্যাদা হারিয়ে সে তার স্থান হচ্ছে নীচুকূলে। সুতরাং কর্মই বন্ধু আবার দুষ্কর্মই তার শত্রু। বুদ্ধ বলেছেন কর্মফল অচিন্তনীয় এবং জগতে কর্মই শ্রেষ্ঠ। এই কর্ম সবকিছু হার মানাতে পারে। কর্মের অসাধারণ ও বিচিত্র শক্তি দার্শনিক সমাজকে মুগ্ধ করেছেন। দার্শনিক কবি শিলহন মিশ্র কর্মকে শ্রেষ্ঠ রূপে স্বীকার করেছেন, কর্মকে তিনি নমস্যরূপে দেখেছেন। কর্ম সম্বন্ধে তার একটি চমৎকার উক্তি নিম্নে বর্ণিত হলো।

"দেবগণকেই নমস্কার করব, না তারা বিধাতার বশীভূত। তারা বলেন বিধাতা যাহা করেন, তাই হবে। অতএব, বিধাতাকে নমস্কার করি, তিনি অভীষ্ট ফল প্রদান করবেন। না, তাও সম্ভব নহে কেননা তিনি ও নিয়ত একমাত্র কর্মের, ফলই প্রদান করে থাকেন। তবে ফলকেই নমস্কার করা হোক না, ফলও কর্মের অধীন। অতএব দেবতাগণই কি, বিধাতাই বা কি, কেহই অভীষ্ট ফল প্রদান করতে পারে না। সুতরাং জগতে কর্মই শ্রেষ্ঠ, এবং নমস্য কারণ কর্মের দ্বারা অভীষ্ট ফল লাভ করা যায়।[১৪]

সচরাচরকর্ম কুশল ও অকুশল ভেদে দুই প্রকার।

কুশল কর্ম

'কুশল' শব্দের সমার্থক শব্দ গুলো হচ্ছে যথাক্রমে-শুভ, নিপুণ, পুণ্যধর্ম, সৎধার্মিক, দোষশূন্য, নির্দোষ, প্রশংসনীয়, গুণসম্পন্ন, কল্যাণ, মঙ্গল ইত্যাদি। যে কর্মে কোনো লোভ, দ্বেষ, মোহ থাকে না, কোনো পাপের স্পর্শ থাকে না, সবসময় সততা সম্পূর্ন কর্মকেই কুশল কর্ম বলা হয়। দান, শীল, ভাবনা, সেবা, পূর্ণদান, ধর্মশ্রবণ ইত্যাদি হচ্ছে 'কুশল কর্ম'। একজন কুশল চিত্তের অধিকারী ব্যক্তিই কুশল কর্ম করতে পারে। কুশল কর্মের কর্ম ফল সর্বদা কুশলই হয়। পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে ক্ষেমা নামের এক রমনী হংসবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন যার পেশা ছিল ভিক্ষা করে জীবনযাপন করা করা। একদিন ভিক্ষু সুজাত ভিক্ষার্থে বের হলে ক্ষেমা তাকে তিনটি সুশিষ্ট পিঠা দান করেছিলেন এই কুশল কর্মের ফলে তিনি বিপশী বুদ্ধের সময় সুকৃতি অর্জন করে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন। ককুসুদ্ধ বুদ্ধের সময় তিনি ধনবান গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং একটি মনোরম উদ্যান প্রমুখ ভিক্ষুসংখকে দান করেন। কোনাগমন বুদ্ধের সময় তিনি একই দানাদি প্রক্রিয়া চলমান রাখেন। অবশেষে গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি রাজা বিম্বিসারের পত্নী হন। অর্থাৎ, কুশল কর্মের ফল কুশলই হয়।

কায় দ্বারা কৃতকর্ম, বাক দ্বারা কৃতকর্ম ও মন দ্বারা কৃতকর্ম অনুসারে কুশল কর্ম[১৫] নিম্নোক্ত :

- কায় দ্বারা কৃত কুশল কর্ম : দান, শীল, অপচায়ন, সেবা।
- বাক্ দ্বারা কৃত কুশল কর্ম-:দান, অপচায়ন, পূণ্যদান, পূণ্যানুমোদন, ধর্ম দেশনা,
- মন দ্বারা কৃত কুশল কর্ম: ভাবনা, ধর্মশ্রবণ, সত্যাজ্ঞানোদ্রেকতা।

অকুশল কর্ম

'অকুশল' শব্দের অর্থ গুলো হলো-পাপ, দোষ, ত্রুটি, অপূণ্য, অসৎকর্ম, অপরাধ, অমঙ্গল কাজ অহিতকর, অন্যায়, নীতি বিরুদ্ধ, অযথার্থ, নিকৃষ্ট ইত্যাদি। অকুশল কর্মের ফলস্বরূপ মানুষকে অপমানিত হতে হয়। মান সম্মানের হানি হয়, সর্বত্র তাদের নিন্দা প্রচারিত হয়। শারিরীক লাঞ্চনা সহ্য করতে হয়। অর্থাৎ, মৌদগল্যায়ন পূর্বজন্মে মাকে কষ্ট দেওয়ার ফলস্বরূপ অর্হৎ হওয়ার পরে ও শেষ বয়সে শারীরিক লাঞ্চনা সহ্য করতে হয়েছিল। মহামতি বুদ্ধকে প্রাণ নাশের চেষ্টা করায় মৃত্যুর পরবর্তীতে দেবদত্তকে নরক ভোগ করতে হয়েছিল। কায দ্বারা কৃত কর্ম, বাক্ দ্বারা কৃত কর্ম এবং মন দ্বারা কৃত কর্ম অনুসারে অকুশল কর্ম ১০ প্রকার।

কায়দ্বারা কৃত কর্ম তিন প্রকার। যথা: প্রাণী হত্যা, চুরি ও ব্যভিচার।বাক্য দ্বারা কৃত কর্ম চার প্রকার। যথা : মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য (এক জনের কথা অন্য জনকে বলে বিভেদ সৃষ্টি করা), কর্কশ বাক্য (অন্যের মনে আঘাত দিয়ে কথা বলা) এবং বাচালতা (অর্থহীন, অবান্তর বাক্য বলা)।মন দ্বারা কৃত কর্ম তিন প্রকার। যথা : রাগ (এখানে রাগ মানে ক্রোধ নয়, অন্যের জিনিসের প্রতি লোভ করা), দ্বেষ (অন্যের অনিষ্ট চিন্তা) এবং মোহ

(সত্য ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞানতা) কোনো মানুষের সুখ স্বচ্ছন্দ্য পূর্ণজীবন অচিরেই নষ্ট হয়ে যায় উপরি-উক্ত দশটি অকুশল কর্মের যে কোন একটি করলেও মৃত্যুর পর নরক যন্ত্রনা। ইহজীবনে অন্যায় অপদার্থ হতে হয়। আমাদের সকলের উচিত অকুশল কর্ম গুলিকে বর্জন করে কুশল কর্মের অনুশীলন করা।[১৬]

শুভ নাম এক শ্রেষ্ঠীপুত্র একসময় বুদ্ধকে মানুষে মানুষে এই বৈষম্যের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। উত্তরে তথাগত বলেছিলেন-

"কম্মসসকা মানবা কম্ম দায়াদা কম্ম বন্ধু
কম্মযোনি, কম্ম পটিসবণা....কম্ম, সত্তে
বিভজতি যদিদং হীন-পণীত তায়া তি।"

হে মানব! প্রাণীগণের কর্মই স্বকীয়, জীব স্বীয় কর্মফলভোগী সত্ত্বা মাত্র। কর্মই উত্তরাধিকারী, কর্মই জন্মের কারণ, কর্মই বন্ধু কর্মই আশ্রয়, কর্মই সত্ত্বগণকে উচু নীচু নানা ভাবে বিভাগ করে থাকে।

বন্ধন মোক্ষণ ব্যাপারে সব সময় কর্মেরই আধিপত্য থাকে। শুধু মাত্র ধর্ম পালনে মোক্ষ লাভ সম্ভব নয়। কর্ম দ্বারাই মোক্ষ লাভ সম্ভব। কর্মের প্রভাব এতটাই বেশী যে, শুধুমাত্র গভীর ঘুম ব্যতীত স্বজ্ঞানে, জাগরনে, তন্দ্রাচ্ছন্নতায়, উঠতে বসতে সকলেই কর্ম করে থাকে।[১৭]

কর্ম সম্পর্কে বুদ্ধ বলেছেন।

"কম্মুনা বত্ততি লোকো, কম্মুনা বত্ততি পজা
কম্মনিবন্ধনা সত্তা রথস্সানী ব যায়রে।"

অর্থাৎ, জগৎ কর্ম প্রভাবেই চলছে। কর্মের কারণেই প্রাণীগণ সংসার ভ্রমণ করছে। আনিবদ্ধ হয়ে রথ যেমন আঁকাবাঁকা পথে গমন করে, তদ্রুপ কর্মনিবন্ধন প্রাণীগণ বিভিন্ন গতিপ্রাপ্ত হয়।[১৮]

মহামতি বুদ্ধ আরে বলেছেন:

"চেতনাহং ভিক্খবে কম্মং বদাম। চেতয়িত্বা কম্মং করোতি কায়েন, বাচায মনসা'পি।"

হে ভিক্ষুগণ! চেতনাকেই (ইচ্ছাকে) আমি কর্ম বলি। কারণ চেতনার দ্বারা ব্যক্তি কায় বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম সম্পাদন করে।

চেতনা মনের সহজাত প্রবৃদ্ধি বিশেষ। চিত্ত থেকে যে উপলব্ধ উৎপন্ন হয় তাকেই চেতনা বলে। একটি ক্ষণের একটি চেতনা সুখ-দুঃখ প্রদান করে। চিত্ত বা মন কায় ও বাক্য উভয় কর্মই নিয়ন্ত্রন করতে সক্ষম। অন্তরের চেতনাই কর্ম। দুই প্রকার চেতনা রয়েছে। যথা :সহজাত চেতনা ও নানাক্ষণিক চেতনা। এর মধ্যে নানাক্ষণিক চেতনাই প্রকৃত চেতনা । সহজাত চেতনা হচ্ছে সর্বচিত্ত সাধারণ চৈতসিক। মোট যে ৮৯ প্রকার চিত্ত রয়েছে, তার প্রত্যেকটিকেই এই চেতনা বিদ্যমান। কুশল ও অকুশল ভেদে নানাক্ষণিক চেতনা তিন প্রকার। লোভ-দ্বেষ, মোহ ও অলোভ-অদ্বেষ-অমোহ এই দুই প্রকার চেতনার জনক হচ্ছে সহজাত চেতনা। এই ছয় চেতনার

যে কোন একটির সাথে মিলিত হয়ে কর্ম সম্পাদন হয়। এই কর্ম কায়বাক্য ও মনদ্বারে তিনভাবে সম্পাদিত হয়ে থাকে। কায় বাক্য দ্বারে যে কর্ম করা হয় তা মনকর্মের বহিঃপ্রকাশ।[১৯]

পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষই আলাদা চরিত্র আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদের মধ্যে কেউ স্বল্পায়ু, আবার কেউ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী, কেউ সুন্দর আবার কেউ কুৎসিত, কেউ ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী, আবার কেউ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, কেউ অন্ধ, বধির, প্রতিবন্ধী আবার কেউ অনেক উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী। কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ রোগী, কেউ নিরোগ, কেউ জ্ঞানী, কেউ অজ্ঞানী ইত্যাদি কর্ম ফলের কারণেই হয়ে থাকে। কারণ প্রাণী মাত্রই কর্মের অধীন। মহামতি বুদ্ধের মতে, মানুষে মানুষ প্রাণীতে প্রাণীতে এ বৈষ্যমের কারণ হচ্ছে কর্ম। কর্মই প্রাণীগণকে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পদ প্রদান করে। জীবনে সুখ দুঃখ কোন দেবতার মাধ্যমে আসে না, এগুলো সব কর্মের প্রতিক্রিয়া।'সুত্ত নিপাত' এ বিষয়ে উক্ত হয়েছে :

"ন জচ্চা ব্রাহ্মণো হোতি, ন জচ্চা হোতি অব্রাহ্মণো
কম্মুনা ব্রাহ্মণো হোতি, কম্মুনা হোতি অব্রাহ্মণো।"

অর্থাৎ, জন্ম দ্বারা কেউ ব্রাহ্মণ হয় না, জন্ম দ্বারা কেউ অব্রাহ্মণ ও হয় না। কর্ম দ্বারাই ব্রাহ্মণ হয়, কর্ম দ্বারাই অব্রাহ্মণ হয়।

"কস্সকো কম্মুনা হোতি, সিপ্পিকো হোতি কম্মুনা
বাণিজো কম্মুনা হোতি, পেস্সিকো হোতি কম্মুনা।

অর্থাৎ, কর্ম দ্বারা কেউ চাষী হয়, কর্ম দ্বারা কেউ কারিগর হয়, কর্ম দ্বারা মানুষ বণিক হয় এবং কর্ম দ্বারাই চাকর হয়।

কর্মফল জীবনে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে রয়েছে এক অদৃশ্য বন্ধন। তাই প্রত্যেকের উচিত কুশল-অকুশল, শুভ-অশুভ, ভালো-মন্দ কর্ম করার আগে তার পরিণতি নিয়ে চিন্তা করা।[২০]

বৈষম্যের কারণ :

সাধারণত যে কোনো অনুসন্ধিৎসু মনে প্রশ্ন জাগে যে কেন জগতে এত বৈষম্য এর কারণ কি? আজ থেকে আড়াই হাজার বছরের পূর্বে বারানসীর শ্রেষ্ঠীকুমার শুভ মানবকের মনেও একই প্রশ্ন এসেছিল এবং তিনি জেতবনে অবস্থিত বুদ্ধের শরণাপন্ন হয়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন কী হেতু প্রত্যয় যে মানুষদের মধ্যে মানুষরূপে থাকা অবস্থায় হীনতা এবং উৎকর্ষতা দেখা যায়? অল্পায়ু, দীর্ঘায়ু, অল্পরোগ গ্রস্থ, দীর্ঘরোগ গ্রস্থ, দুবর্ণ, বর্ণসম্পন্ন, অল্প-শক্তিযুক্ত, মহাশক্তিযুক্ত, নীচুকুল জাত, উচ্চকুল জাত, অল্পভোগ সম্পন্ন, মহাভোগ সম্পন্ন দেখা যায়? এর কারণ কি?

তদুত্তরে বুদ্ধ, জগতে কর্মই সব। কর্মই সবকিছু উৎপত্তির কারণ, কর্মই বন্ধু, কর্মই তাদের জন্মের কারণ, কর্মই আশ্রয়। কর্মই প্রতিটি মানুষ থেকে মানুষে উচু নীচু বিভাজন করে।

শুভ মানবিক মহামতির এই সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। তাই তিনি বিস্তৃত ধর্ম দেশনা তথা ব্যাখা জানতে চাইলেন। উত্তরে বুদ্ধ নিম্নোক্ত দেশনা প্রদান করেন।

" হে মানবক কোনো স্ত্রী বা পুরুষ যদি প্রাণ হন্তা, রুদ্র প্রকৃতি, প্রাণী হত্যায় নিরত বলে লোহিত পাণি, হনন ও প্রহার কাজে যুক্ত থাকেন, সকল প্রকার জীবের প্রতি নিষ্ঠুর ও অদয়ালু হন তাহলে তিনি জীবনাসানে মৃত্যুর পর অপায়, দুর্গতি, বিনিপাত নরকে উৎপন্ন হন। আর যদি দেহাবসানে মৃত্যুর পর পুনরায় মনুষ্যত্ব লাভ করে, তাহলে যেখানে যেখানে জন্ম গ্রহণ করেন, সেখানে সেখানে জন্মগ্রহণ করে স্বল্পায়ু হন। "

" হে মানবক, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ যদি প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থেকে, প্রাণী হত্যা পরিত্যাগ করে নিহিতদন্ড, নিহিতশাস্ত্র, লজ্জী, দয়ালু, সব জীবের প্রতি উপকারী হন, তাহলে তিনি তার কর্মের জন্য মৃত্যুবরণে স্বর্গলাভ করবেন। আর যদি মানুষের জীবন পান তাহলে যেখানে যেখানে জন্মগ্রহণ করবেন, সেখানেই তিনি দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হবেন। "

"হে মানবক, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ যদি জীবগণের প্রতি স্বভাবে অনিষ্টকারী হয়, অন্যকে হাত দিয়ে, লোষ্ট্র দিয়ে, দন্ড বা শাস্ত্র দিয়ে আঘাত করেন, তাহলে তিনি তার কর্মের ফলস্বরূপ নরকে উৎপন্ন হন। আর যদি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, তাহলে তিনি নানা প্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত হন।"

"হে মানবক, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ যদি অনিষ্টকারী না হয় তাহলে তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন। মানুষ হিসেবে তিনি জন্মগ্রহণ করলে নীরোগ বা অল্পরোগগ্রস্থ হন।"

"হে মানবক, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ যদি অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ হন, সামান্য কথা বললেও রাগান্বিত হয়, কুপিত হয়, অন্যের ক্ষতি করে, অন্যের প্রতি দ্বেষ ও দৌর্মনস্য পোষণ করে তাহলে দেহাবসানে সে নরক ভোগ করে, আর যদি মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে সে কুৎসিত বা দুবর্ণ হয়।"

"হে মানবক, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ যদি ক্রোধহীন হয়। কটু কথাতেও সহজে রাগান্বিত হন না, কারো প্রতি কুপিত হন না, অন্যের প্রতি দ্বেষ পোষণ করেন না, সৌমনস্য পোষণ করেন তাহলে তিনি মৃত্যুর পর যদি মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি সুশ্রী হন, সুন্দর হন।"

" হে মানবক, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ যদি ঈর্ষাপরায়ণ হয়, অন্যের লাভ, সৎকার, গুরুত্বে, সমান পূজালাভে হিংসা করেন তাহলে জন্মান্তরে তিনি হীন দুর্বল হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন।"

" হে মানবক, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ যদি হিংসা পরায়ণ না হোন, মনে কোন হিংসা পোষণ না করেন, তাহলে মৃত্যুর পর তিনি মহাশক্তি সম্পন্ন হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। "

" হে মানবক, কোনো স্ত্রী বা পুরুষ যদি কৃপণ হয়, শ্রমন ব্রাহ্মণের প্রতি অন্ন-পানীয়-বস্ত্র-যান-মাল্য-গন্ধ বিলেপন-শয্যা-আবাসন প্রদীপের দাতা না হয় তাহলে তিনি মৃত্যুর পর দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেন।"

"হে মানবক, যদি কোনো স্ত্রী বা পুরুষ অকৃপণ হয়, যথাসময়ে শ্রমন, ব্রাহ্মণদের দান ধর্ম করেন, তারা দেহাবসানে ধনী ও মহাভোগসম্পন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। অভাব, অনটন তাদের স্পর্শ করতে পারে না।"

" হে মানবক, যদি কোনো স্ত্রী বা পুরুষ স্তব্ধ, অতিমানী ও অহংকারী হয়, অভিবাদন যোগ্যকে অভিবাদন করে না, মাননীয়কে মান্য করে না, পূজনীয়কে পূজা করে না, আসন লঅভীকে আসন দেয় না, মার্গলাভীকে মার্গ দেয় না তাহলে সে দেহাবসানে নীচকূলে জন্ম গ্রহণ করে।"

"হে মানবক, যদি কোন শ্রী বা পুরুষ স্তব্ধ, অতিমানী, অহংকারী হয় না, অভিবাদন যোগ্যকে অভিবাদন দেয়, মাননীয়কে মান্য করে, আসনার্হকে আসন দেয়, যে সঠিক পথের সন্ধান পায় না, তাকে সঠিক পথ দেখায়, পূজনীয়কে পূজা করে, দেহাবসানে তার জন্ম হয় সম্ভ্রান্তবংশে, উচুকূলে।"

সুতরাং, মানবক আমি বলি যে, জীবগণের কর্মই নিজের, তারা কর্মের ফল ভোগ করে, কর্মই তাদের যথাকর্ম অনুযায়ী তাদের পরিণতি ঠিক করে, কর্মই বন্ধু, কর্মই শত্রু, কর্মই শরণ, কর্মই জীবগণকে উচু-নীচু-হীন-উৎকৃষ্ট রূপে বিভক্ত করে।[২১]

সব কিছুই কর্মের অধীন নয়

বুদ্ধের মতে, কর্মই মানুষকে নানা শ্রেণিতে বিভক্ত করে। কর্মের কারণেই সমাজে উচু নীচু শ্রেণি বিভাজন হয়। "আমরা যা পাই, সুখ-দুঃখ বা অদুঃখ অসুখ অনুভূতির স্বীকার হই তার পশ্চাতে শুধু কর্মই আছে। " এই ধারণার বিরোধিতা করে বুদ্ধ বলেছেন, যদি সব কিছু পূর্ব কর্মই নিয়ন্ত্রন করতো, তা হলে পূর্বকর্মের কারণে মানুষ হত্যাকারী, চোর, মিথ্যাবাদী, ব্যভিচারী, লোভী, ঈর্ষাপরায়ণ, মাৎসর্যপরায়ণ হতো। এর ফলে মানুষ বর্তমান জন্মে কর্ম থেকে বিরত থাকত, কর্ম থেকে নিবৃত্ত থাকত। এর ফলে একজন খারাপ মানুষ সর্বদাই খারাপ থাকত। কারণ কর্মই তাকে খারাপ বানিয়েছে, কোন অসুস্থ রোগী ডাক্তারের কাছে যেত না, কারণ কর্মই তাকে অসুস্থ বানিয়েছে। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু থাকত না। মানুষ নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যতকে শুদ্ধ করার চেষ্টা করত না। জীবন হয়ে যেত যন্ত্রের মত। আমরা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছি যিনি আমাদের সকল কিছু নিয়ন্ত্রন করেন অথবা পূর্বকর্ম যা আমাদের ভাগ্য ও জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রন করে উভয় এক হয়ে যেত। বৌদ্ধ কর্মবাদের মধ্যে অদৃষ্টবাদের কোন স্থান নেই। বুদ্ধের মতে জড় ও চেতনা রাজ্যের পাঁচটি নিয়ম রয়েছে। যথা-

- **ঋতু শিক্ষা:** যেমন সময় অনুযায়ী বৃষ্টি হওয়া, বাতাস প্রবাহিত হওয়া।
- **কর্ম শিক্ষা:** কর্ম ও কর্মফলের নিয়ম। ভালো কর্ম ভালো ফল প্রদান করবে। খারাপ কর্ম খারাপ ফল প্রদান করবে।

- **বীজ নিয়মঃ** অঙ্কুর বা বীজের নিয়ম। যেমন ধানের বীজ থেকে ধান, গমের বীজ থেকে গম জন্মায়। ইক্ষু থেকে আমরা চিনির স্বাদ পাই, মধু থেকে মধুর স্বাদ। সৃষ্টিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক ব্যাখা এবং যমজ সন্তানদের মধ্যে শারীরিক মিলের ব্যাখ্যা এই প্রণালীতে করা যেতে পারে।
- **চিত্ত নিয়মঃ** মানসিক নিয়ম। যেমন চিত্তের গতি প্রণালী ও মনের শক্তি ইত্যাদি।
- **ধর্ম নিয়মঃ** স্বাভাবিক নিয়ম। যেমন বোধিসত্ত্বের শেষ জন্মে সংঘটিত ঘটনা এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতি।

উপরি-উক্ত পঞ্চ নিয়মের দ্বারা জড় জীবিত প্রত্যেক পদার্থের ব্যাখা সম্ভব। সমগ্র বিশ্বে বিদ্যমান এই পাঁচটি নিয়মের মধ্যে কর্ম নিয়ম একটি নিস্প্রয়োজন। যেমন-প্রাকৃতিক ও মাধ্যকর্ষণ নিয়মে কর্তা অনুপস্থিত। কোন প্রকার কর্তার হস্তক্ষেপ বাদেই এই নিয়ম নিজের কাজ করে যাচ্ছে। তেমনি কর্ম যেমন অদৃষ্ট নয়, আবার এটি কোন পূর্ব নির্ধারিত বিধান ও নয়। যা কোন রহস্যময়, অজ্ঞাত শক্তি আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে, যার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করতে হবে। মানুষ তার সুকর্ম ও দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ স্বাভাবিক ভাবেই সুখ দুঃখ ভোগ করে। কর্ম ফল দেয়, ফলই কারণ নির্দেশ করে। বীজ যেমন ফল দেয় এবং ফল বীজের বর্ণনা করে। উভয়েই যেমন একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত। ফল পূর্ব থেকে কর্মের মধ্যে অঙ্কুররূপেই থাকে। তাই, যে যেমন কর্ম করে, তার ফল ও সে সেই রূপে পায়।[২২]

কর্মের উৎপত্তিস্থল

সাধারণত সকল প্রকার কুশল ও অকুশল চেতনাই কর্ম। যেখানে চেতনা থাকে না বা অনিচ্ছাকৃত কিছু করা হয় তাকে কর্ম বলা চলে না। চেতনার দ্বারা কোন ব্যক্তি কার্য, বাক্য ও মনের দ্বারা কর্ম করে থাকে। কর্মের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন। কায়কর্ম ও বাক্যকর্ম সমস্তই মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ *'ধম্মপদ'* গ্রন্থের *'যমক বর্গে'* মনের কার্যকারিতা সম্পর্কে সুন্দর ধারণা দেওয়া হয়েছে এভাবে:

"মনোপুব্বং গমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোমায়া।
মনসা চে পদুট্ঠেন ভাসতি বা করোতি বা।
ততো নং দুক্খমকেন্বেতি চক্ক'ব বহতো পদং।[২৩]"

অর্থাৎ, বস্তু সমূহের গুণ মন থেকে প্রাপ্ত। মন ধর্ম সমূহের পূর্বগামী। মন এদের প্রধান এবং এরা মনের দ্বারা গঠিত। কেউ যদি দোষযুক্ত মনে কোন কথা বলে বা কাজ করে তাহলে শকট চক্র যেমন ভারবাহী বলদের পদানুসরণ কবে আবর্তিত হয়, তেমন দুঃখ তাকে অনুসরণ করে চলে।

আবার, "মনোপুব্বংগমা ধম্মা মনোসেট্ঠা মনোমায়া।
মনসা চে পসন্নেন ভাসতি বা করোতি বা।

ততো নং সুখমন্বেতি ছায়া অনপায়িনী।"[২৪]

অর্থাৎ, মনই ধর্ম সমূহের পূর্বগামী, ধর্মসমূহের মধ্যে মনই প্রধান, ধর্ম মন থেকেই উৎপাদিত হয়। কেউ যদি নিষ্পাপ মনে, প্রসন্ন চিত্তে কোন কথা বলে বা কাজ করে তাহলে সুখ সব সময় তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে।

কর্ম বলতে অতীত কর্ম এবং বর্তমান কর্ম উভয়কেই বুঝিয়ে থাকে। শুধুমাত্র অতীত কর্মই কর্ম নয়। আমাদের অতীত কর্ম যেমন বর্তমানকে নিয়ন্ত্রণ করছে তেমনি আমাদের বর্তমান কর্মই আমাদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করবে। কিন্তু সরাসরি বলা যুক্তিযুক্ত হবে না যে, শুধুমাত্র অতীতই বর্তমান কোন কিছু বা বর্তমান কোন কিছুই ভবিষ্যতে চলমান থাকবে। কারণ যে মানুষটি আজকে খারাপ মানুষ সে যে ভবিষ্যতে ভাল মানুষ হবে না বা অতীত যে খুব ভাল ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল, সে যে বর্তমানে কদাকার রূপ ধারণ করবে না তার নিশ্চয়তা নেই। যে কোন ব্যক্তি তার বর্তমান সুকর্মের ফলে, খারাপ মানুষ থেকে ভাল মানুষে পরিবর্তিত হতেই পারে। মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, কর্ম হচ্ছে বিচিত্রময়, অচিন্তনীয়। নিজের সুকৃত-দুস্কৃত বা সুচারিত-দুশ্চারিত কর্ম সমূহের ফল ও বিপাক আছে। কর্ম হচ্ছে ক্রিয়া আর বিপাক হচ্ছে সেই ক্রিয়ার ফল। সুতরাং-কর্ম বিপাক হলো নিজের কৃত কর্মের অনুরূপ ফল ভোগ করা। শকটের চাকা যেমন সবসময় বলদকে অনুসরণ করে তেমনি কর্ম বিপাক ও কর্মকে অনুসরণ করে। কর্ম যদি ভালো হয়, তাহলে বিপাক ও ভালো হবে, তদ্রুপ কর্ম খারাপ হলে বিপাক ও খারাপ হবে। যেহেতু কর্মের উৎপত্তিস্থল হচ্ছে মন সুতরাং কর্মফলের উৎপত্তিস্থল ও হচ্ছে মন। সুকর্মের বিপাক স্বরূপ যেমন উন্নতি, আয়বৃদ্ধি, সুস্বাস্থ্য লাভ, সুখানুভূতি অনুভূত হয় তেমনি কুকর্মের বিপাক স্বরূপ দারিদ্র্য লাভ, স্বাস্থ্যের অবনতি, বিভিন্ন রোগ শোক হয়। আমরা যেরূপ বীজ বপন করব, সেই রূপ ফল প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। হোক সেটা ইহজন্মে বা পরজন্মে। কর্ম করলে ফল ভোগ করতেই হবে।[২৫] আমরা যা বর্তমানে ভোগ করছি তা বর্তমান বা অতীত যে কোন কর্মের ফল। যেমন বীজ বপিত হয়, তেমনি ফল লাভ হয়। কিন্তু মানুষ চেষ্টার মাধ্যমে তার কর্মফলকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

কর্মের কারণ

অবিদ্যা হচ্ছে কর্মের প্রধান কারণ। অবিদ্যা হলো বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি পরিভাষা যা অজ্ঞতা হিসেবে অনুবাদ করা হয়। সাধারণত কোন বিষয় সম্পর্কে ভুল ধারণা বা কোন বস্তু বা বিষয়কে যথাযথ ভাবে না জানাকেই অবিদ্যা বা অজ্ঞতা বলে। তথাগত সম্যক সমৃদ্ধ বলেছেন

"যং খো, আবুসো,দুকেখ অঞ্ঞাণং, দুকখ সমুদযে অঞ্ঞাণং
দুকখ নিরোধে অঞ্ঞাণং,দুকখ নিরোধ গামিনিযা পটিপদা
অঞ্ঞাণং-অযং বুচ্চতাবুসো 'অবিজ্জা'।[২৬]"

অর্থাৎ, আবুসো! এ যে দুঃখ তাকে না জানা বা দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখ সমুদয়কে না জানা বা দুঃখ সমুদয়ে অজ্ঞান,দুঃখ নিরোধকে না জানা বা দুঃখ নিরোধে অজ্ঞান এবং দুঃখ নিবোধগামিনী প্রতিপাদকে না জানা বা দুঃখ নিরোধ গামিনী প্রতিপদায় অজ্ঞানই হল অবিদ্যা। যতক্ষণ পর্যন্ত অবিদ্যা থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভবমুক্তির দরজা ও খুলবে না।

একজন অবিদ্যা সম্পন্ন ব্যক্তি কখনো ও বুঝতে পারে না যে, সংসারে জাগতিক যত কাম্য বস্তু রয়েছে, সেগুলোকে সদা সুখের বলে মনে হলেও প্রত্যেকটির মধ্যে দুঃখ লুকায়িত রয়েছে। একজন অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তি কখনও জানতে পারে না যে, সমস্ত দুঃখের কারণ হচ্ছে তৃষ্ণা বা আসক্তি বা মোহ। একজন ব্যক্তি যত বেশি তৃষ্ণা সমূহকে বাড়াতে থাকবেন, দুঃখ ও তত দ্রুতই তার কাছে আসতে থাকবে। সে জন্য বলা হয় যে, তৃষ্ণাই হলো সমস্ত দুঃখের কারণ। একজন অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তি বুঝতে পারে না যে, দুঃখ নিরোধের একমাত্র উপায় হলো তৃষ্ণাকে সমূলে উৎপাটন করা। একজন অবিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তি কখন কোন কর্ম করতে হবে, তা বুঝতে পারেন না। তিনি জানেন না যে, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অনুশীলন অবশ্যাম্ভাবী ও অনিবার্য। এই না জানাকে বুদ্ধ অবিদ্যা বলে অভিহিত করেন।[২৭] অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণ অসারকে সার এবং সারকে অসার বলে মনে করে। ফলে প্রকৃত পক্ষে তারা সত্যিকার সার বস্তু লাভ করতে পারে না। অন্ধকারে পথ চললে যেমন দিক বিদিক নির্ণয় করা যায় না তেমনি অজ্ঞানতার কারণে প্রাণীগণ অশেষ দুঃখ ভোগ করে চলছে। অবিদ্যাচ্ছন্ন ব্যক্তির কোন কর্মই যথাযথ হয় না, যার ফল স্বরূপ ভব দুঃখ সাগরে তিনি জীবনব্যাপী সাঁতার কাটতে থাকেন। তাই মহামতি বুদ্ধ কর্মের মূখ্য কারণ হিসেবে অবিদ্যাকেই নির্দেশ করেছেন।

কর্মের অবস্থান

বৌদ্ধ দর্শন হচ্ছে কর্মের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত একটি দর্শন। সুকর্ম সুখকর ও আনন্দ দায়ক । পূণ্যবান ব্যক্তি সব সময় আত্মতৃপ্তিতে ভোগেন। তাদের নির্বান লাভের পথ থাকে সুপ্রসস্থ। কুকর্মে লিপ্ত ব্যক্তিগণের জীবন থাকে দুঃখদায়ক, অন্ধকার ও হতাশায় নিমজ্জিত। কুকর্ম অনিষ্টকর ও দুঃখ দায়ক। তারা সকলের নিন্দার পাত্র হয়ে থাকে। তাদের দুষ্কর্মের ফল স্বরূপ তারা যেমন দুঃখ ভোগ করতে থাকে। তেমনি তারা অন্য ব্যক্তিদের ও এই রাস্তায় আসতে উৎসাহিত করে। ‘ *মিলিন্দ পঞ্হ*’ গ্রন্থে দেখা যায়, একসময় রাজা মিলিন্দ ভদন্ত নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন: ভন্তে, কর্ম কোথায় থাকে? ভদন্ত নাগসেনের উত্তর এই ক্ষণ পরিবর্তনশীল। শীলরূপের মধ্যে কর্ম কোথাও ও সঞ্চিত থাকে না কিছু নামরূপকে ভিত্তি করে এর জন্ম হয় এবং উপযুক্ত মুহূর্ত উপস্থিত হলে ফল প্রসব করে। যেমন আমফল গাছের কোথাও লুকিয়ে থাকে না, তবে আম গাছকে ভিত্তি করেই এর অবস্থান এবং যথাসময়ে ফলরূপে এর আর্বিভাব হয়। বায়ু বা তেজঃ যেমন কোন স্থানে লুকায়িত থাকে না। কার্য কারণের শৃঙ্খলার দ্বারা এর অনুভব করা যায়। তেমনি কর্ম এই নামরূপ

সমন্বিত দেহের ভিতরে বা বাইরে অবস্থান করে না। তা জন্ম জন্মান্তরে ব্যক্তির স্বভাবকে প্রভাবিত করে। এর ফলে আমরা অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ও প্রতিভাধর শিশু দেখতে পাই, যমজ সন্তান দুই জনের মধ্যে দুই রকম স্বভাব দেখা যায়। একই পিতামাতার সন্তানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গুণাবলী ও আচার ব্যবহার দেখা যায়। সন্তানদের মধ্যে নানা রকম ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। তাই, কর্মবাদ নিয়ে সকলের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।[২৮]

কর্মের কারক বা কর্তা

কে কর্মফল ভোগ করেন? কর্মের কর্তা কে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'বিশুদ্ধিমার্গ' গ্রন্থে বুদ্ধঘোষ বলেছেন :

"কম্মস্স কারকো নত্থি, বিপাকস্স চ বেদকো,
সুদ্ধধম্মা পবত্তন্তি, এবেতং সম্মাদস্সনং।।"

অর্থাৎ, শুভাশুভ কর্মের কর্তা ও বিপাকের ভোক্তা নেই। ক্ষণ-বিধ্বংসী জড় চেতনময় ধর্মপ্রবাহ, কর্ম ও কর্মফলরূপে চলছে। বৌদ্ধ সাহিত্যে একে উপলব্ধি করাই সম্যক দর্শন। আমি কর্ম করি এবং আমিই ফল ভোগ করি, এই সকল উক্তি ব্যবহারিক সত্য মাত্র। ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমরা যাকে চেয়ার টেবিল বলি, পারমার্থিক দৃষ্টিতে চেয়ার টেবিল হচ্ছে কিছু কর্মশক্তি ও দ্রব্য গুণের সমষ্টি মাত্র। একজন বিজ্ঞানী সাধারণ ভাষায় যাকে জল বা পানি বলে থাকে, তিনিই ল্যাবরেটরীতে একে $H2O$ বলে। একই ভাবে ব্যবহারিক ভাবে আমরা যাকে নারী, পুরুষ, সত্ত্ব, জীব ইত্যাদি বলি, বাস্তবিকভাবে এইগুলো ক্ষণবিধ্বংসী ও ক্ষণ পরিবর্তনশীল ঘটনা প্রবাহমাত্র। সেই জন্য বৌদ্ধরা শাশ্বত কোন সত্ত্বাকে বিশ্বাস করে না। অনুভূতি ব্যতীত অনুভব কারীকে স্বীকার করে না, চেতনা ব্যতীত চেতন কোন সত্ত্বাকে স্বীকার করে না, কর্ম ব্যতীত কোন কর্তাকে স্বীকার করে না। তা হলে কর্মের কর্তাকে? কর্মের ফল ভোক্তাই বা কে? বুদ্ধের মতে চেতনা কর্তা আর অনুভূতি হচ্ছে কর্মের ফল ভোক্তা। এগুলো ভিন্ন বীজবপকও নেই। ফল ভোক্তা ও নেই। সংক্ষেপে বলা যায় "চিন্তাই চিন্তনকারী"।

কর্মের কার্যকারিতা

যদি কর্মবাদ সম্পর্কে বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন হয়, তাহলেই চিত্তবীথির (চিত্তের ভ্রমণ পথ) সাথে পরিচয় থাকা আবশ্যক। যেহেতু চিত্ত বা মন মানুষের সবকিছু নিয়ন্ত্রন করে তাই বলা যায় চিত্তই মানুষকে সুপথে এবং বিপথে পরিচালিত করে। সুতরাং চিত্তই একদিকে মানুষের পরম বন্ধু রূপে থাকে আবার চিত্তই মানুষের চরমতম শত্রু রূপে বিবেচিত হয়।

চিত্তবীথি সম্পর্কে জানতে হলে ভবাঙ্গ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। যে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান নতুন/নবীন জন্মের সাথে প্রতিসন্ধি ঘটায়, সেই প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান প্রতিসন্ধি ক্ষণের পরবর্তী ক্ষণ হতে বীথি চিত্তোৎপত্তির অনুপস্থিতিতে

ভবের অঙ্গ বা কারণ রূপে আমরণ প্রবাহিত হতে থাকে। ভবের অঙ্গরূপী এই প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের নাম ‘ভবাঙ্গ’। চিত্তবীথি হচ্ছে চিত্তের ভ্রমণ পথ। চক্ষু শ্রোতাদি দ্বার পথে আলম্বনের স্পর্শে ভবাঙ্গ অবস্থা হতে চিত্ত জাগ্রত হয়ে নির্দিষ্ট স্থানের মধ্য দিয়ে নির্দিষ্ট কর্মের কাজ সম্পন্ন করে পুনরায় ভবাঙ্গে পতিত হয়। এই ভাবে চিত্ত পরম্পরায় অশ্রান্তভাবে বীথি ও ভবঙ্গে উঠে পড়ে চলছে। কিন্তু চিত্ত পরম্পরায় ভবাঙ্গের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ দ্রুত গতিতে বীথির পর বীথি অতিক্রম করে যে আলো চক্রের আলো রেখার মত এই চিত্ত পরম্পার পার্থক্য আমাদের সাধারণ জ্ঞানে দৃশ্যমান হয় না। সেই জন্য এই অসংখ্যচিত্ত পরম্পরাকে আমরা একটি মাত্র চিত্ত বলে মনে করি।

ভবাঙ্গ ও চিত্তবীথি উভয়েই নিজ নিজ আলম্বন,কৃত্য, স্বভাব সম্বন্ধে বিপরীত ভাবাপন্ন। তরঙ্গহীন নদী যেমন শান্ত, সৌম্য থাকে, ভবাঙ্গ তেমনি শান্তভাবে প্রবহমান। কিন্তু কোন প্রকার ব্যতয় ঘটলে শান্ত নদী প্রবাহে যেমন তরঙ্গের উৎপত্তি হয়, তেমনি চক্ষু, শ্রোতাদি দ্বারাপথে আলম্বনের অভিখাতে ও ভবাঙ্গ প্রবাহে চিত্তোৎপত্তি হয়। নদী তরঙ্গের যেমন উৎপত্তি, স্থিতি ও পতন আছে তেমনি চিত্তের উৎপত্তি, স্থিতি ও পতন আছে। যখন কোনো বিষয়বস্তু কোনো ইন্দ্রিয় দ্বারে এসে উপস্থিত হয়,তখন ভবাঙ্গ প্রবাহ থেমে যায় এবং বিষয়বস্তুকে জানার জন্য একটি চিত্তবীথি সক্রিয় হয়ে উঠে। চিত্তবীথি সম্পূর্ণ হওয়ার পরপরই আবার ভবাঙ্গ চিত্ত ক্রমাগত ভাবে উৎপন্ন ও বিলীন হতে থাকে এবং অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে থাকে, যতক্ষণ না পর্যন্ত আরেকটি চিত্তবীথি সক্রিয় হয়।

কোনে কোনো দার্শনিক চিত্তের, ‘স্থিতিক্ষণ’ স্বীকার করতে চান না। স্থিতি বলতে চিত্তের নিশ্চল অবস্থাকে বোঝায় না। বীথিতে এবং ভবাঙ্গবস্থায় চিত্তচির প্রবাহমাণ। চিত্তের উৎপত্তিক্ষণের পর ভবাঙ্গভিমূখী ক্ষণটিই হলো স্থিতিক্ষণ। চিত্তের ক্ষণ বলতে এক নিমেষের আঙ্গুলের এক চুটকী দিতে যত সময় ব্যয় হয় তার কোটি-শত-সহস্র ভাগের এক ভাগ সময়কে বোঝানো হয়। এই ভাবে এক উৎপত্তিক্ষণ, এক স্থিতিক্ষণ ও এক ভঙ্গ-ক্ষণ এই প্রকার তিন ক্ষণে এক চিত্তক্ষণ হয়। এই এক চিত্তক্ষণই চিত্তের আয়ু। চিত্ত কিভাবে আলম্বনের স্পর্শে শান্তভাবে প্রবাহমান। ভবাঙ্গ অবস্থা থেকে উত্থিত হয়ে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে ঐ নির্দিষ্ট কাজ সমাপ্ত শেষে পুনরায় ভবাঙ্গে পতিত হয় তা আচার্য বুদ্ধঘোষ নিম্নোক্ত উপমার সাহায্যে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

চিত্তের ভবাঙ্গবস্থা	একটি আমগাছের নিচে এক ব্যক্তি কাপড়ে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন।
অতীত ভবাঙ্গ কাল। দ্বারপথে আগত আলম্বন এক চিত্তক্ষণের জন্য ভবাঙ্গ স্রোতের সাথে প্রবাহিত হল।	এক দমকা বাতাস ঐ আমগাছের উপর দিয়ে বয়ে গেছে।
ভবাঙ্গ চলন কাল। এক চিত্তক্ষণের জন্য ভবাঙ্গে কাঁপুনি	তাতে আমগাছের শাখা দুলতে থাকল

উপস্থিত হলো	
ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ কাল। এই এক চিত্তক্ষণে ভবাঙ্গ নিজের আলম্বনে বিরত থাকল।	একটি আম, গাছ থেকে নিচে পড়ল।
মনস্কারের জাগরণ কাল। নবীন/নতুন আলম্বনের দিকে মনস্কার আবর্তিত হলো। এটিই পঞ্চদ্বারা বর্তন চিত্ত। এই মানে বীথি ভ্রমণ শুরু হলো। এটি বীথির প্রথম চিত্তক্ষণ।	আম পড়ার শব্দে লোকটি জেগে উঠল।
চক্ষুবিজ্ঞান কাল (২য় চিত্তক্ষণ)	মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে তিনি আমটি দেখলেন।
সম্প্রতীচ্ছ কাল (৩য় চিত্তক্ষণ) (চিত্তের নিষ্ক্রিয়ভাবে প্রতি গ্রহণই সম্প্রতীচ্ছকৃত্য) সম্প্রতীচ্ছ শব্দের অর্থ হচ্ছে গ্রহণ, সমর্থন। সং+প্রতি+ইচ্ছা=সম্প্রতীচ্ছ। পঞ্চবিজ্ঞান গৃহীত আলম্বনকে পুনঃইচ্ছাকারী বা গ্রহণকারী চিত্তই হচ্ছে সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত।	তিনি আমটি কুড়িয়ে নিলেন।
সন্তীরণ কাল (৪র্থ চিত্তক্ষণ) সম্প্রতীচ্ছ চিত্তের দ্বারা সমর্থিত আলম্বনের লক্ষণ বিচারই সন্তীরণকৃত্য।	টিপে টিপে আমটি পরীক্ষা করল
ব্যবস্থাপন কাল (৫ম চিত্তক্ষণ) ঐ আলম্বন নিয়ে চিত্ত কি করবে তার ব্যবস্থা করাই ব্যবস্থাপন কৃত্য।	আমটি খাওয়ার মত এবং পাঁকা বলে নির্ধারণ করল।
১জবন কাল (৬ষ্ঠ-১২তম চিত্তক্ষণ) ব্যবস্থাপনের পর সেই ব্যবস্থানুযায়ী চিত্তের অশনি বেগে বারবার সেই আলম্বনের অনুভূতি জবন কৃত্য (জু+অনট্=জবন=বেগ) জবন চিত্ত অর্থাৎ বেগবান চিত্ত, ক্রিয়াশীল বা কর্মশীল চিত্ত। চিত্তবীথির এই জবন স্থানেই সংস্কার বা কর্ম পুনগঠিত হয়।	তিনি আমটি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করলেন।
তদালম্বন কাল (১৩-১৪ তম চিত্তক্ষণ সেই জীবন গৃহীত আলম্বনের পুনরালোচনা তদালম্বন কৃত্য	আমটি খেয়েছি এই স্মৃতি অনুভব করল।

পুনঃভবাঙ্গ কাল অর্থাৎ, চিত্ত ভবাঙ্গ স্থানে ভবাঙ্গকৃত্যে ও ভবাঙ্গলম্বনে পুনরায় নিযুক্ত হলো।	ঐ ব্যক্তি পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

উপরি-উক্ত উপমা থেকে বোঝা গেল যে, চিত্তবীথির এই ভ্রমণপথে বীথির জবন স্থানেই অর্থাৎ, ৬ষ্ঠ থেকে ১২তম চিত্তক্ষণ সক্রিয় থাকে একেই কর্মভব বলে। জবন স্থানেই কর্ম নতুন ভাবে গঠিত হয়। তাই বলা হয়েছে কর্ম্মসস কারকো নথি।" অর্থাৎ, কর্মের কোনো কর্তা নেই। বীথির এই চিত্তপরম্পরা যেমন প্রত্যেক বীথির পর, তেমন বীথির প্রত্যেক স্থানে চিত্তক্ষণের ভবাঙ্গে পতিত হয় এবং পুনরায় উৎপন্ন হয়। এই রকম উঠা-নামার দ্বারা বীথি পরম্পরায় প্রত্যেক বীথি ১১তম স্থান বা তদালম্বন স্থানে সমাপ্ত হয় ও ভবাঙ্গপাত হয়। আবার বীথি ভ্রমণ, পুনরায় ভবাঙ্গে পতন, আবার ভ্রমণ, পুনরায় পতন চলতেই থাকে। এই ভাবেই চিত্ত সক্রিয় হয়, কাজ করে। চিত্ত ভিন্ন কর্মের কোন কর্তা নেই। চিত্ত বীথির জবন স্থানে চিত্ত কিভাবে সক্রিয় হয়ে কর্মভবের কারণ হয় তা বিস্তারিত ভাবে নিম্নে দেওয়া হলো।

'জবন' শব্দের অর্থ 'বেগ' বা 'গমন' বুঝালে ও দার্শনিক অর্থে এটিকে চিত্তের বেগ বা চিত্তের দমনই বোঝায়। আলম্বনে চিত্তের গমন অর্থ সক্রিয় ভাবে চিত্তের আলম্বন উপলব্ধি বোঝায়। সম্প্রতীচ্ছ চিত্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে আলম্বন গ্রহণ করেন। এটি স্বাধীনতাহীন। এটি কর্মফল থাকে লৌকিক ভাষায় বলা হয় ভাগ বা অদৃষ্ট। কিন্তু জবনচিত্ত আলম্বনকে সক্রিয়ভাবে গ্রহণ করতে জানে ও ব্যবহার করে এটি স্বাধীন। এই জবনস্থাণে চিত্ত স্বাভাবিক অবস্থায় ৭ চিত্তক্ষণ (৬ষ্ঠ থেকে ১২তম চিত্তক্ষণ) আলম্বন উপলব্ধি করে। ১ম জবন অভ্যাসের অভাবে দুর্বল ২য় জবন চিত্তক্ষণ নিজের শক্তি এবং ১ম জবন থেকে প্রাপ্ত শক্তির সংযোগে ১ম জবন থেকে বলশালী। একই ভাবে ৩য় জবন ২য় জবন অপেক্ষা এবং ৪র্থ জবন ৩য় জবন থেকে শক্তিশালী। ৫ম, ৬ষ্ঠ ও ৭ম জবন চিত্তক্ষণ পতনোম্মুখ বলে ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর। আবার ১ম জবনের বিপাক সেই জন্মেই ফলে ৭ম জবন পতনোন্মুখ হলেও ১ম জবন থেকে শক্তিশালী। এই জন্য পরবর্তী এর বিপাক ফলে। সেই জন্মে ফলার সুযোগ না পেলে ক্ষীণবীজ হয়ে যায়। মধ্যের ৫ জবনের ফলনোপযোগী শক্তি শত সহস্র জীবন বা নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকে। তবে এক স্বভাবের জবন যতই সুগঠিত হয়, বিপরীত স্বভাব বিপাক শক্তি ততই কমতে থাকে। এটা সম্ভব না হলে জীবের মুক্তিও সম্ভব ছিল না।

কোনো এক ভবে প্রতিসন্ধির পর সেই প্রতিসন্ধি চিত্ত ১৫ বা ১৬ চিত্তক্ষণ ভবাঙ্গাবস্থায় থাকে। পরবর্তীতে "ভব-নিক" নামক লোভ জবন চিত্ত মনোদ্বার উৎপন্ন হয়ে নতুন জন্মকে অভিনন্দন জানায় এবং পুনরায় ভবাঙ্গে পতিত হয়। এটি এই নতুন ভবের প্রথম বীথি। এই প্রথম চিত্তবীথি থেকে শুরু করে ছয় দ্বারিক চিত্তবীথি ভূমি, পুদ্গল, দ্বার ও আলম্বন অনুসারে উৎপত্তির অনুরূপে আমৃত্যু শুধু ভবাঙ্গ দ্বারা বারবার ভাগ হয়ে নিরন্তর

প্রবর্তিত হয়। ভবাঙ্গের সাথে বীথির এবং বীথির সাথে ভবাঙ্গের এই প্রত্যয় হচ্ছে অনন্তর প্রত্যয়।[২৯] সুতরাং এই তত্ত্ব সকলের জানার সৌভাগ্য হলে "শাশ্বত উচ্ছেদ আত্মবাদ সৎকায়" প্রভৃতি যাবতীয় মিথ্যা দৃষ্টি ভিত্তিহীন হয়ে যায়। দৃষ্টি বিচিকিৎসার সেখানে শ্মশান সেখানেই লোকত্তবের সিংহদ্বার। এক নজরে চিত্তবীথি

১। অতীত ভবাঙ্গ	২। ভবাঙ্গ চলন	৩। ভবাঙ্গ উপচ্ছেদ	৪। পঞ্চ দ্বারা বর্তন
৫। পঞ্চবিজ্ঞান	৬। সম্প্রতীচ্ছ	৭। সন্তীরণ	৮। ব্যবস্থাপন
(সপ্তচিত্তক্ষণ) জবন (৯-১৫)		(দুই চিত্তক্ষণ) তদালম্বন (১৬-১৭)[৩০]	

কর্মফলের তারতম্য

'যে যেমন কর্ম করবে সে তেমন ফল পাবে' এটি চিরন্তন সত্য যা কর্মের নিয়ম নামে জগতে সমাদৃত। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মফলের তারতম্য দেখা যায়। অর্থাৎ কর্মবীজ অনুযায়ী ফলপ্রাপ্তি হয় না। কর্মবীজ অনুযায়ী কখনও ফলপ্রাপ্তি বেশিও দেখা যায় আবার কমও দেখা যায় আসলে মানুষ তার সৎকর্ম, সৎপ্রচেষ্টা, সৎজীবিকা দ্বারা তার কর্মফলকে প্রভাবিত করে পরিবর্তিত করতে পারে।

অবশ্য '*ধম্মপদ*' গ্রন্থে ১২৭ নং শ্লোকে বলা আছে,

"ন অন্তলিক্খে ন সমদ্দমঝ্ঝো
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্স।
ন বিজ্জতি সো জগতিপ্পদেসো
যত্থট্ঠিতো মুঞ্চেয়্য পাপকম্মা।"[৩১]

অর্থাৎ, অন্তরীক্ষে, সমুদ্রের মাঝে কিংবা পর্বতের অন্তরালে যেখানেই প্রবেশ করনা কেন, জগতে এমন কোন স্থান নেই যেখানে থেকে পাপকর্মের ফলভোগ থেকে নিষ্কৃত পাওয়া যায়।

তাছাড়া এ কথাও সত্য যে, সঠিক চেষ্টার দ্বারা পূর্বকৃত পাপকর্মফল থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এটি অসম্ভব হলে দুঃখ শাশ্বত হয়ে যেত। মানুষ নিরাশায় পর্যবসিত হত। তার মধ্যে জীবন রূপ দর্শনের কোনো মূল্যায়ন থাকত না। কোনো মানুষ তার চেষ্টার দ্বারা কর্মকে নিয়ন্ত্রনে আনতে পারে। তাই এ রকম ঘটনা অনেকবার ঘটেছে যে, সৎচেষ্টার দ্বারা ব্যক্তি পাপী থেকে মহা পূণ্যবান হয়েছে। খ্রিষ্ট ধর্মের প্রবর্তক মহামানব যীশু বলেছেন, "পাপীকে নয়, পাপকে ঘৃণা কর"। কারণ এটা অসম্ভব নয় যে, পাপী ব্যক্তিই তার পাপকর্ম ব্যাখ্যা করে, সম্যক চেষ্টার ফলে সমাজে আদর্শ ও অনুকরণীয় হয়ে রয়েছেন। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে-অঙ্গুলিমালের ঘটনা। কুখ্যাত নরঘাতক অঙ্গুলিমাল দস্যু একাই নয়শত নিরানব্বই ব্যক্তির জীবন নাশ।

ঘটনা প্রবাহে একদিন তিনি বুদ্ধের সাক্ষাৎ পান এবং তিনি বুদ্ধের প্রাণ নাশ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধের ভাষণ শ্রবণে তার মনের অন্ধকার দূর হয়। তার অন্তরে পাপবোধ জাগ্রত হয়। পরবর্তীতে সেই

অঙ্গুলিমালই, মহামতি প্রদত্ত পথ পরিভ্রমণ করে, সম্যক প্রচেষ্টায় অন্তিম জীবনে অহর্ত্ব লাভ করেছিলেন। দস্যু অঙ্গুলিমালের থেকে তিনি অহৎ অঙ্গুলিমাল হয়েছিলেন।[৩২] কুখ্যাত আলবক যক্ষ বুদ্ধের দ্বারা দমিত হয়ে, তার পদ প্রদর্শন করে প্রাণীহত্যা ত্যাগ করেছিলেন এবং ইহজীবনেই তিনি স্রোতপত্তি ফল লাভ করেছিলেন। গণিকা আম্রপালি বুদ্ধ নির্দেশিত পথে চলে অর্হৎফল লাভ করতে সক্ষম হোন রাজ্য বিস্তারের লোভে যে অশোকে চন্ডাশোক হয়েছিলন, বুদ্ধ নির্দেশিত পথে চলে তিনিই ধর্মাশোক হয়েছিলেন। বুদ্ধের পর, যিনি বৌদ্ধ ধর্ম তথা দর্শনের সর্বাধিক প্রচার প্রচারণা করেছেন, তিনি হলেন এই সম্রাট অশোক।[৩৩]

ব্যতিক্রম ঘটনা ও দেখা গিয়েছে। সুকর্মের ফল অবশ্যই ভাল হবে। কিন্তু দেখা যায় সবসময় তা হয় না। কর্ম সম্পাদনের সময় কর্ম সম্পাদনকারীর চেতনা কেমন ছিল, তা ভেদেও কর্মফলের তারতম্য দেখা যায়। একদিন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ বুদ্ধের কাছে এসে বললেন, "প্রভু শ্রাবস্তীতে এক ধনবান শ্রেষ্ঠীর মৃত্যু হয়েছে। তার কোন পুত্র সন্তান বা উত্তরাধিকারী না থাকায় তার সম্পত্তি আমি আমার রাজ কোষে যুক্ত করেছি। তার এককোটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল এবং একটি ও রূপার মুদ্রা ছিল না। অথচ শুনেছি, তিনি জীর্ণ/ছেঁড়া পোশাক পরিধান করতেন, আমানি এবং পরিত্যক্ত খাবার গ্রহণ করতেন। প্রায় ভাঙ্গা একটি শকটে চড়তেন। এর কারণ কি?"
উত্তরে মহামতি বললেন, "মহারাজ-অতীতের কোন এক জন্মে এই শ্রেষ্ঠী তগরসিখী নামক প্রত্যেক বুদ্ধকে অন্নদান করেছিলেন। কিন্তু পরমূহুর্তে তিনি অনুশোচনা করে মনে মনে চিন্তা করেছিলেন, এই অন্ন তিনি তার ভৃত্য, কর্মচারীদের দিলে তারা খুশী হত। তিনি সম্পত্তির লোভে তার নিজ ভাইয়ের ছেলেকে হত্যা করেছিলেন। প্রত্যেক বুদ্ধকে অন্নদান করার সময় যেহেতু তার চেতনা শুদ্ধ ছিল, তাই তিনি সাতবার স্বর্গে উৎপন্ন হয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করেন। তার ফলেই তিনি এই জন্মে ধনবান শ্রেষ্ঠী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু অন্নদান করার পর যেহেতু তার অনুশোচনা হয়েছিল তাই তিনি এ জন্মে ভাল খাদ্য, বস্ত্র ভোগ করতে পারে নি। আর যেহেতু তিনি সম্পত্তির জন্য ভাইয়ের ছেলেকে হত্যা করেছিলেন, তাই বহু শত সহস্র জন্মে তিনি নরকে উৎপন্ন হবেন এবং এই কারনেই তিনি পুত্রহীন হয়েছেন এবং তার সব সম্পত্তি রাজার অধিকারে চলে গেছে।" তাই বুদ্ধ বলেন :"চেতনাহং ভিকখবে কম্মংবদামি চেতয়িত্বা কম্মং করোতি যদিদং হীনপ্ পণীততায়।" অর্থাৎ, চেতনাকেই কর্ম বলা হয়। কর্ম অনুষ্ঠানের পূর্বে, কর্ম অনুষ্ঠানের সময় এবং কর্ম অনুষ্ঠানের পর যে চেতনা উৎপন্ন হবে, সেই অনুসারে তার ফল ভোগ করতে হবে।
সুকর্ম ও দুষ্কর্মের পরিণাম কর্ম নিয়মকে প্রভাবিত করতে পারে। পূর্বজন্মের সুকর্মের কারণে কোন ব্যক্তি উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে সুখ ভোগ করতে থাকে। অতীত পাপ কর্মের ফলাফল তার জীবনে অনেক দেরীতে আসে। অন্যদিকে কোন ব্যক্তি পূর্বজন্মে দুষ্কর্মের কারণে পরবর্তী জন্মে নীচুকূলে জন্মলাভ বশতঃ দুঃখ ভোগ করতে থাকে। এই ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির অতীতের পাপকর্মের ফল তার জীবনে ত্বরান্বিত হয়। প্রচেষ্টা এবং অকর্মণ্যতাও দেখা যায় যে, কর্মফলকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে। কঠোর শ্রম,ধ্যান ও প্রচেষ্টার দ্বারা কেউ কেউ

নতুন কর্মসৃষ্টি করে তার নিজের পরিবেশ ও নিজের জগৎকে পুরোপুরি পরিবর্তন করতে পারে। আবার কেউ কেউ সুবর্ণ সুযোগের অধিকারী হয়েও নিজের অকর্মণ্যতার দ্বারা নিজের সমস্ত সুযোগ হারিয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সৎ প্রচেষ্টা জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে পরম সহায়ক। বুদ্ধ বলেছেন:

"উট্ঠানেন, প্ পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ,
দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওযো নাভিকীরতি।"[৩৪]

অর্থাৎ, উত্থান, অপ্রমাদ, সংযম, ইন্দ্রিয় দমনের দ্বারা জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের জন্য দ্বীপ বা প্রতিষ্ঠা গঠন করতে সমর্থ হন, যাকে সংসার স্রোত বিধ্বস্ত করতে পারে না।

যদি কোনো দুর্দশা গ্রস্থ ব্যক্তি তার দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন নিজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য চেষ্টা না করেন তাহলে তার পূর্ববর্তী পাপকর্ম, পাপফল প্রদানের জন্য চেষ্টা করবেন। অপরদিকে কেউ যদি তার দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্তির জন্য সর্বদা চেষ্টা করেন, নিজের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির জন্য নিয়ত পরিশ্রম করেন, তাহলে তার পূর্বকৃত কুশল কর্ম কুশল ফল প্রদানের চেষ্টা করবে। '*মহাজনক জাতকে*' উল্লেখ আছে যে, যখন তাদের জাহাজ ডুবি হয়, বোধিসত্ত্ব নিজেকে রক্ষার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে থাকেন আর তার সহযোগীরা ঈশ্বরের ভরসায় ঈশ্বরের প্রার্থনায় সময় নষ্ট করতে থাকে। ফলে জাহাজডুবিতে বোধিসত্ত্ব প্রাণে বেঁচে গেলে ও অন্যদের সমুদ্রে সলীল মৃত্যু হয়।[৩৫]

যে ব্যক্তি বৌদ্ধ কর্মবাদে বিশ্বাসী চূড়ান্ত সীমাহীন কোন অপরাধীকে ও ঘৃণা করেন না। কারণ যথা সময়ে যথা সুযোগ পেলে তিনিই অপরাধী থেকে সকলের মধ্যে সম্মানী ও দৃষ্টনীয় হতে পারেন। দুষ্কর্ম করলে দুঃখলাভ সুনিশ্চিত হলে ও পরবর্তীতে তিনি তার কুশল কর্মের দ্বারা বর্তমান জীবনেই সুখের স্বর্গ নির্মাণ করতে পারেন। এক বৌদ্ধ কর্ম বা বিশ্বাসী ব্যক্তি দৈব শক্তির উপর আত্মসমর্পণ না করে, নিজের কর্মে আস্থা রেখে, নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজে সকলের কাছে দিক দর্শন হতে পারে। মহামতি তাই বলেছেন,

"অত্তা হি অত্তনো নাথো, কোহি নাথো পরো মিয়া?
অত্তনা'ব সুদন্তেন নাথং লভতি দুল্লভং।"

অর্থাৎ, নিজেই নিজের ত্রাণকর্তা, অন্য ত্রাণকর্তা কোথায়? সুদান্ত ব্যক্তি নিজের মধ্যেই দুর্লভ নাথ বা আশ্রয় খুঁজে পান।

মহামতি বুদ্ধ আরও বলেছেন,

"সব্বে সত্তা মরিস্সন্তি মরণন্তং হি জীবিতং
যথাকম্মং গমিসসন্তি, পুঞ্ঞপাপফল পগা॥
নিরয়ং পাপকম্মন্তা পুঞ্ঞকম্মা চ সুগতিং

তস্মা করেয্য কল্যাণং, নিচয়ং সম্পরায়িকং,

পুঞ্ঞানি পরলোকস্মিং, পতিট্ঠা হোন্তি পাণিনং॥"[৩৬]

অর্থাৎ, সকল সত্ত্বগণের মৃত্যু ধ্রুব, জীবনের শেষ মুহূর্তেও পাপ পুণ্যের ফলানুসারে তারা গতিপ্রাপ্ত হয়। পাপকর্মের ফলে নরক উৎপন্ন হয়। পূণ্যকর্মের ফলে স্বর্গলাভ। অতএব, সকলের উচিত কল্যাণ জনক কর্ম সম্পাদন করা। কারণ কর্মফল সত্ত্বগণকে নিয়ত অনুসরণ করে। পুণ্য-কর্ম পরলোকে প্রাণি গণের প্রতিষ্ঠা স্বরূপ হয়ে থাকে।

কর্মবাদ বৌদ্ধ দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বুদ্ধ প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে আমাদের জীবন পরিচালনা করা উচিত। আমাদের সকল প্রকার অন্যায়, গর্হিত কাজ, অসামাজিক কাজ, পরিহার করা উচিত। আমাদের এমন সুকর্ম করা উচিত যা সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকে। এমন কর্ম করা উচিত যা নিজের পরিবার সহ সমাজের সর্বস্তরের সকলের সুনাম বৃদ্ধি করে। সকলের কাছে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে থাকে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. Kalupahana, David J, *A History of Buddhist Philosophy*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited) and (David Kalupahana, *Mulamadhyamakakarika of Nagarjuna*, Delhi : 1994, Motilal Banarsidass, 2006, P. 1

২. ড. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বৌদ্ধ ধর্ম, *গৌতম বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম*, প্রজ্ঞা প্রকাশনী সংস্থা: ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৮৭

৩. নীরুকুমার চাকমা, বুদ্ধ কে? *বুদ্ধ ঃ ধর্ম ও দর্শন*, অবসর প্রকাশ; ২০০৭, পৃ. ১৭-১৯) এবং (দেব স্মারক বক্তৃতা ২০১৬, *গৌতম বুদ্ধের দুঃখ দর্শন*, অধ্যাপক ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র; ২০১৬, পৃ. ৩-৫

৪. Walapola Rahula 2007, kindle loc. 514-524

৫. Traleg Kyabgon 2001, p. 7

৬. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *দর্শন দিগদর্শন*, অনুবাদ, ছন্দা চট্টোপাধ্যায় প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

৭. *বুদ্ধ: ধর্ম ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৮. *গৌতম বুদ্ধের দুঃখ দর্শন*, দেব স্মারক বক্তৃতা-২০১৬, অধ্যাপক ড.আজিজুন্নাহার ইসলাম, গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ২০১৬, পৃ. ৬

৯. Edward Conze, *The Sanskrit Dharmapada*, Karmavarga, vi. p. 4-58, 19. cf. Edward Conze, ed. *Buddhist Texts Through the Ages* (Oxford,:1954)

১০. ড.জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বৌদ্ধ দর্শন, *গৌতম বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম* (ঢাকা :প্রজ্ঞা প্রকাশনী সংস্থা, ২০১৩), পৃ. ১৮৮-১৯৪

১১. বৌদ্ধ দর্শনের বৈশিষ্ট্য: *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৭-৯

১২. George Chryssides; Margaret Wilkins *A Reader in New Religious Movements*, (2006: A & C B), P. 248-249, ISBN 978-0-8264-6167-4

১৩. অধ্যাপক এন. মূখার্জী, *দর্শন পরিক্রমা* (কলকাতা: বাণী প্রকাশন, ২০১৫), পৃ. ১৫-১৬

১৪. শান্তি ভূষণ চাকমা, কর্ম বিভঙ্গ, *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*, মুদ্রনে-রাহাত প্রিন্টার্স, পৃ. ৮১

১৫. কুশল ও অকুশল কর্ম, বৌদ্ধ কর্মবাদ, *বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা*, এস এস সি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ১২৭-১২৮

১৬. সালয়ক সুত্ত ও বেরঞ্চক সুত্ত, মজ্ঝিম নিকায় দেখুন।

১৭. আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন* (কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১০), পৃ. ১০৭

১৮. ড.সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত, *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (কলিকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী), পৃ. ১১৯ খণ্ড

১৯. *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১০৯

২০. কর্মবাদ, বৌদ্ধধর্ম, *বাংলাদেশ স্টাডিজ*, বিবিএস প্রোগ্রাম, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯

২১. ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক অনুদিত, *মধ্যম নিকায়*, ৩য় খণ্ড সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত, ১৯৯৩, পঞ্চম খণ্ড (বাংলাদেশ:ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ৯৬৫-৯৬৮

২২. কর্মতত্ত্ব, *গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, ড.সুকোমল চৌধুরী, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৭; পৃ. ১২২-১২৩

২৩. গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া, *ধম্মপদ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬) পৃ. ৩৯-৪০

২৪.ভিক্ষু শীলভদ্র, *ধম্মপদ* (কলকাতা:মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৯), পৃ. ১-২

২৫. Robert Buswell and Donald Lopez (2013), P. 86 & 1070

২৬. Dan Lusthaus *Buddist Phenomenology: A Philosophical Investigation of Yogacora Buddhism and the ch'eng wei-shih,Lun,* (2014: Routledge) P. 533-534

২৭. অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (রাঙ্গামটি : ২০০৪, বনভান্তে প্রকাশনী), পৃ. ২২৭

২৮. সাধনকমল চৌধুরী, *মিলিন্দপঞ্হ*, (কলিকাতা: করুণা প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ৭৫

২৯. *গৌতমবুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬-১৩৩

৩০. Bhikkhu Bodhi Pariyatti, *A comprehensive monual of Abhidhamma,* (2000) P. 163-165

৩১. মিহির গুপ্ত অনূদিত, *ধর্মপদ*, শ্লোক নং-১২৭, হরফ প্রকাশনী: ১৯৯৬; পৃ. ৮৭

৩২. শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা: ১৩৯১, করুণা প্রকাশনী, পৃ. ৫২৭-৫৩০

৩৩. Charles Drekmeier Kingship *and* C*ommunity in Early India*, (1962: Standford University Press), P. 173, ISBN 978-8047-0114-3

৩৪. ভিক্ষু শীলভদ্র *ধম্মপদ* (কলিকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি; ১৯৯৯), পৃ. ৮

৩৫. শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, ষষ্ঠ খণ্ড (কলিকাতা:১৩৯১ বঙ্গাব্দ, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ৫০৭-৫৫০

৩৬. *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, প্রাগুক্ত,পৃ. ১৪২-১৪৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৌদ্ধ কর্মবাদ : প্রায়োগিক ব্যবহারের স্বরূপ অন্বেষণ

দর্শন জগতের মধ্যে বৌদ্ধ দর্শন যেমন এক আলাদা স্থান দখল করে রেখেছে তেমনি কর্মবাদ ও বৌদ্ধ দর্শনের মধ্যে অন্যতম আলোচ্য বিষয়। বৌদ্ধ দর্শনের এক গভীর আলোচনার বিষয় হচ্ছে এই কর্মবাদ তত্ত্ব। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত সকল প্রাণী নিজের চিত্তের চেতনায় সুকর্ম ও দুষ্কর্ম সম্পাদন পূর্বক কর্মের ফলস্বরূপ বিভিন্ন লোকে জন্মগ্রহণ করছে। কেউ দেবলোক, কেউ ব্রহ্মলোক, কেউ মনুষ্যলোক আবার কেউ পশু হিসেবে জন্মধারণ করছে। এই জন্মে তারা কেউ দৈহিক, কেউ মানসিক আবার কেউ আয়ুগতভাবে সুখ ও দুঃখ ভোগ করে চলেছে অবিরত। এই সুখ দুঃখ কোথা থেকে কিভাবে আসছে, কেন কেউ সুখ ভোগ করে চলেছে, আবার কারো জীবনে ক্রমাগতভাবে দুঃখ চলমান। এই সকল আলোচনা বৌদ্ধ দর্শনের কর্মবাদ তত্ত্বে বিশদভাবে আলোচিত। সুখ-দুঃখ কেউ কউকে দিতে পারে না। প্রতিনিয়ত প্রত্যেকেই নিজের কর্মের দরুণ এই সুখ-দুঃখ ভোগ করছে। মহামতি বলেছেন, কর্মফল অচিন্তনীয় এবং জগতে কর্মই শ্রেষ্ঠ। কর্ম সব কিছুকেই পরাভূত করতে পারে। বৌদ্ধ দর্শনে কর্মের এই অসাধারণ শক্তি সকল দার্শনিক সমাজে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে।

অত্থি ভিক্খবে কম্মং কণ্হং কণ্হবিপাকং সুক্কং
সুক্ক বিপাকং, কণ্হসুক্কং কণ্হ-সুক্কবিপাকং, অত্থি
কমং অকণ্হং অসুক্কং এতং কম্মং কম্মক্খয়ায় সংবত্ততি।[১]

অর্থাৎ, দুঃখদায়ী পাপকর্ম, সুখদায়ী পূণ্যকর্ম, সুখ-দুঃখ মিশ্র ফলদায়ী পাপ-পুণ্যকর্ম এবং সর্বপ্রকার কর্মক্ষয়কর কর্ম, যা মুক্তি লাভের একমাত্র সহায়ক।

বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে মনে সব সময় বিশুদ্ধ চিন্তা ধারণ করতে হবে এবং খারাপ চিন্তা পরিহার করতে হবে। কুশল চিন্তা চেতনার মাধ্যমে কুশল কর্ম সম্পাদন করতে হবে। আমরা যে কর্মই সম্পাদন করব তার চেতনা হতে হবে কুশল। কুশল কর্মের কুশল ফলাফল অবশম্ভাবী। এজন্যই বৌদ্ধ দর্শনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কর্মবাদ। কুশল কর্মের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি তার জীবনকে সুন্দরভাবে গঠন করতে পারে। কর্মই ব্যক্তির মূল শক্তি। কর্মই ব্যক্তিকে উচু, নীচু পদে প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং মানুষ নিজেই নিজের কর্মফল বহন করে। বৌদ্ধ দর্শনের প্রায়োগিক দিকে প্রথমেই আসে দশবিধ কুশল কর্মের আলোচনা।

দশ প্রকার পূণ্য কর্ম

লোভ, দ্বেষ, মোহবিবর্জিত যে সকল কর্ম সকলের জন্য শুভ, কল্যাণ ও মঙ্গলজনক, যে কর্মে পাপের কোন অস্তিত্ব নেই, সেই কর্মই বৌদ্ধ দর্শনে কুশল কর্ম নামে পরিচিত। কুশল কর্মের শক্তি বিশ্বব্যাপী। কুশল কর্মের মাধ্যমে দেশ, জাতি ও সমাজের আমূল উন্নতি সম্ভব। বৌদ্ধ দর্শনে তাই কুশল কর্মের উপর ব্যাপক গুরুত্ব

আরোপ করা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে উল্লেখিত হয়েছে নির্বাণ লাভের পূর্ব পর্যন্ত সকলের কুশল কর্ম করা আবশ্যক। মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, পূণ্য কর্মের অনুশীলন হওয়া উচিত বারবার। কেউ যদি পূণ্য কর্ম করে তাহলে তিনি যেন সেটা বারবার করেন। সেই পুণ্যকর্ম যেন তিনি আঁকাঙ্খা করেন, কারণ পূণ্য সঞ্চয় হচ্ছে কল্যাণদায়ক ও সুখদায়ক। বৌদ্ধ দর্শনে মতে পূণ্য কর্ম হচ্ছে দশ প্রকার। যথা: ১. দান জনিত পূণ্য কর্ম ২. শীল জনিত পূণ্যকর্ম ৩. ভাবনা জনিত পূণ্যকর্ম ৪. সেবা জনিত পূণ্যকর্ম ৫. সম্মান জনিত পূণ্যকর্ম ৬. পূণ্যদান জনিত পূণ্যকর্ম ৭. পূণ্যানুমোদন জনিত পূণ্যকর্ম ৮. ধর্মশ্রবণ জনিত পূণ্যকর্ম ৯. ধর্ম দেশনা জনিত পূণ্যকর্ম ১০. সত্যানুসন্ধান বা দৃষ্টি ঋজু পূণ্য কর্ম। নিচে এ বিষয়ে একটি সক্ষিপ্ত আলোচনা উপস্থাপন করা হলে :

দানজনিত পূণ্য কর্ম

সাধারণত কোনো কিছু নিঃস্বার্থ ভাবে যা ত্যাগ করা হয় তাই দান। বৌদ্ধ দর্শনে আলোচিত হয়েছে যে, নর-নারী সবারই দানজনিত পূণ্যকর্ম সম্পাদন করা উচিত। এতে ইহকাল ও পরকাল উভয় ক্ষেত্রেই সুখ-সমৃদ্ধি উপভোগ করা যায়। অতীত জন্মে দান না করলে বর্তমান জীবনে যেমন সুখ-সমৃদ্ধি পাওয়া যায় না। আবার বর্তমান জীবনে দান না করলে ভবিষ্যত জীবন ও সুখ মধুর হয়ে উঠে না। দান অত্যন্ত মানবিক কর্ম। মহৎ চিত্ত থাকলে বিত্তবান, বিত্তহীন সকলেই তাদের সাধ্যমত দান করতে পারে। বৌদ্ধ দর্শনে দানের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যথা : ১. বস্তু সম্পত্তি ২. চিত্ত সম্পত্তি ৩. প্রতিগ্রাহক সম্পত্তি

বস্তু সম্পত্তি

সৎ উপায়ে অর্জিত বিষয়, সম্পত্তি, টাকা-পয়সা, বস্তুকে বস্তু সম্পত্তি বলা হয়েছে। ন্যায় সম্মতভাবে দানীয় বস্তুটি অর্জিত হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা। যদি অসৎপথে কোন বস্তু অর্জিত হয় তাহলে তা দিয়ে দান কার্য করা উচিত নয়। অসৎপথে অর্জিত টাকা পয়সা বা বস্তু দান করার চেয়ে সৎ পথে উপার্জিত টাকা পয়সা বা বস্তু দান করেন তারা বেশী পূণ্য লাভ করে থাকে বলে একে বস্তু সম্পত্তি দান বলা হয়েছে।

বস্তু সম্পত্তি দানের ক্ষেত্রে মহামতি ৩ প্রকার দাতার কথা বলেছেন। যথা:১. দান দাস ২. দান সহায় ৩. দান পতি।

দান দাস : যে ব্যক্তি নিজে ভালো খাদ্য গ্রহণ করেন, কিন্তু দানের সময় খারাপ দান করেন তাকে দান দাস বলে। দান সহায় : যে ব্যক্তি যেমন খাদ্য গ্রহণ করেন, তেমন খাদ্যই যদি দান করেন তাহলে তাকে দান সহায় বলে। দান পতি : যে ব্যক্তি নিজে যেমন গ্রহণ করেন, কিন্তু দানের সময় যদি তার চেয়ে ভালো দান করেন তাকে দান পতি বলে।

বস্তু সম্পদ ১০ প্রকার। যথা : ১. অন্ন ২. বস্ত্র ৩. জল ৪. যান ৫. মালা ৬. গন্ধ ৭. বিলেপন ৮. শয্যা বা বিছানা ৯. গৃহ বা আবাস ১০. আলো বা প্রদীপ। এগুলোর এর বাইরেও ভিতরের বস্তু দান (নিজের হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, রক্ত দান যা গ্রহিতার উপকারে আসবে জেনে দান), অভয় দান (বিপদাপন্ন ও অসহায়কে আশ্রয়, নির্ভয় বা অভয়দান।) ও ধর্ম দান উল্লেখযোগ্য (মৈত্রী দান, পূণ্যদান, জ্ঞান দানের মাধ্যমে মানুষকে নৈতিকতার পথে আনয়ন হলো ধর্ম দান)।

চিত্ত সম্পত্তি

চিত্ত বা মনের মধ্যে কুশল চিত্ত উৎপন্ন করে যে দান করা হয় তাকে চিত্ত সম্পত্তি দান বলে। বুদ্ধ ৩ প্রকার চিত্তের কথা বলেছেন। যথা : ১. পূর্ব চেতনা ২. মোচন চেতনা ৩. অপর চেতনা

পূর্ব চেতনা

মনে মধ্যে দান করার সংকল্প উৎপন্ন হওয়া এবং প্রসন্ন মনে সেই দান সংগ্রহ করাকে পূর্ব চেতনা বলে।

মোচন চেতনা

দানীয় বস্তু গ্রহণ করার পর গ্রহণকারীকে যখন সেই দান তুলে দেওয়া হয়, তখন মনে যে প্রসন্ন চিত্ত উৎপন্ন হয় তাকে মোচন চেতনা বলে।

অপর চেতনা

দান করার পর চিত্তে যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাকে অপর চেতনা বলে। দানের সময় যিনি কুশল চিত্তে দান করেন, তিনি একাই সে পূণ্যের ভাগী হন না, তার সাথে সেই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সকল পূণার্থী যারা ও মনে কুশল চিত্ত উৎপন্ন করেছেন তারাও পূণ্যফল অর্জন করেন।

প্রতি গ্রাহক সম্পত্তি

যাকে উদ্দেশ্য করে দান কার হয় বা যার উদ্দেশ্যে দান কার্য করা হয় তাকেই প্রতি গ্রাহক সম্পত্তি দান বলে। প্রতি গ্রাহক চিত্তে দানের সময় মহামতি ৫ প্রকার দানের কথা বলেছেন।

বৌদ্ধ দর্শন মতে, দানের শুদ্ধতা অনেকাংশেই নির্ভর করে দানগ্রহীতা কে? তার চারিত্রিক শুদ্ধি কীরূপ? তাই যে কোন দানের পূর্বে দান গ্রহীতা সম্পর্কে ও বিবেচনা করা উচিত। গ্রহীতার প্রয়োজন বিবেচনা করে দান করলে তাকে কালদান বলা হয় এবং এই দানের ফল শ্রুতিতে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই লাভবান হয়। মোট ১৪ প্রকার গ্রহীতা রয়েছে। এদের দান করা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম। এই ১৪ প্রকার গ্রহীতা হলো: ১. তিয্যকজাতি ২. পরপীড়নের দ্বারা জীবিকা নির্বাহকারী (ভিক্ষারি) ৩. সৎ বাণিজ্য (ব্রতধারী পৃথকজন বা যা সৎ কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে) ৪. তাপস (বুদ্ধ শাসনের বহির্ভূত অষ্টসমাপত্তি লাভী) ৫. স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ৬. স্রোতাপত্তি ফলস্থ ৭. সর্বদাগামী মার্গস্থ ৮. সকৃদিগামী ফলস্থ ৯. সকৃতিগামী মার্গস্থ ১০. অনাগামী মার্গস্থ ১১. অনাগামী ফলস্থ ১২. অর্হৎ মার্গস্থ ১৩. অর্হৎ ফলস্থ এবং ১৪. সম্যক সম্বুদ্ধ।

এছাড়া বৌদ্ধ দর্শনে আর ও বিভিন্ন রকম দানের কথা উল্লেখ রয়েছে। এদের নিম্নোক্ত ৫টি অন্যতমঃ

- পুদ্গলিক দান ; কোন ব্যক্তি বিশেষ কে দান করা বোঝায়।
- সংঘ দান : চারজন ভিক্ষুর অধিক ভিক্ষুকে দান করা বোঝায়।
- অষ্ট পরিস্কার দান ; ভিক্ষুদের জন্য ব্যবহৃত আটটি দ্রব্য দানকেই অষ্টপরিস্কার দান বলে।এগুলো হলো সংঘাটি, উত্তরাসংঘ, অন্তর্বাস, পাত্র, ক্ষুর, সুই, সুতা, কটিবন্ধনী ও জল ছাকনি। এই প্রত্যেকটি দানের আলাদা ফল ভোগ রয়েছে।
- কঠিন চীবর দান: প্রবারণা পূর্ণিমার পর থেকে কার্তিকী পূর্ণিমার পূর্ব পর্যন্ত যে কোন দিন ভিক্ষু সংঘকে চীবর দান করাকে কঠিন চীবর দান বলে।
- কালোচিত দান : পরিস্থিতি স্বীকার পূর্বক দান করাকে কালোচিত দান বলে। কালোচিত দানের ক্ষেত্রে বুদ্ধ ৫ প্রকার দানের কথা বলেছেন। যথ : আগন্তুক ভিক্ষুকে বিভিন্ন দানীয় বস্তু দান; বিদেশে গমনশীল ভিক্ষুকে দান;রোগ-শোকে আক্রান্ত ভিক্ষুকে দান ; দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে ভিক্ষুদের দান এবং নিজ গৃহে বা দেশে কোনো নতুন শস্য উৎপন্ন হলে প্রথমে ভিক্ষু সংখকে দান।

দান ও পূণ্য লাভের জন্য বুদ্ধ ২ ধরনের ব্যক্তির কথা বলেছেন। যথা : ক.. সৎপুরুষের দান এবং খ. সৎপুরুষের পূণ্য লাভ।

সৎপুরুষের দান

সৎ ও জ্ঞানী পুরুষদের ইহকাল-পরকাল এবং কর্ম ও কর্মফলের উপর প্রতি বিশ্বাস রেখে দান দিতে হয়। দান করার সময় তাদের মনের মধ্যে নিম্নোক্ত সাত প্রকার চিত্ত উৎপন্ন করতে হয়। যথা :

- শ্রদ্ধা সহকারে দান দিতে হবে
- গৌরব ও সম্মান প্রদর্শন পূর্বক দান দিতে হবে
- উপযুক্ত সময়ে দান দিতে হবে
- স্বহস্তে দান করতে হবে
- নির্লোভ চিত্তে দান দিতে হবে
- এই দানের ফলে কুশল কর্মের ফল লাভ করব এই চিন্তা করে দান দিতে হবে
- আত্ম প্রশংসা ও পরনিন্দা না করে দান দিতে হবে।

সৎপুরুষের পূণ্য লাভ

যারা সৎ ও জ্ঞানী ব্যক্তি বা পুরুষ তারা যে কোন কুশল কর্মে পরিশ্রম ও সাধুবাদ দিয়ে পূণ্য অর্জন করেন।

কর্ম ও কর্মফলে শ্রদ্ধাপূর্বক দানই প্রকৃত দান। সম্মান ও ভক্তি সহকারে, সুন্দর ও শৃঙ্খলা সহকারে নিজ হাতে দানই প্রকৃত দান রূপে স্বীকৃত। জ্ঞান সম্প্রযুক্ত চিত্তে সৌমনস্য সহকারে দানফল হয় সর্বোত্তম দান। জ্ঞান পূর্বক কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস স্থাপন করে শাসন হিত,জ্ঞাতি প্রেত হিতে ও আত্মহিতে দান করতে হবে যার ব্যাখ্যা নিম্নে দেওয়া হলো:

শাসন হিতে দান

বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের উদ্দেশ্যে জ্ঞান শ্রদ্ধা ও সৌমনস্য সহকারে দানই মূল শাসন হিতে দান। মহাউপাসক অনাথপিন্ডক, উপালি, রাজা বিম্বিসার, রাজা কোশন, মহারাজ অশোক, মহাউপাসিকা বিশাখা, কনিষ্কের দান হচ্ছে শাসন হিতে দানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

জ্ঞাতি প্রেত হিতে দান

"অটঠানং খো এতং ব্রাহ্মণ! অনবকাসো যং তং ঠানং বিবিত্তং অস্স, ইমিনা দীঘেন অদ্ধু না যদিদং পেতেহি ঞাতি-সালোহিতেহি। অপিচ ব্রাহ্মণ দায়কাপি অনিপ্ ফলা।"[২] অর্থাৎ, পরদত্তভোজী প্রেতের উদ্দেশ্যে দান হলো জ্ঞাতি-প্রেত-হিতে দান। জ্ঞাতিগণ মনুষ্যলোক থেকে পিন্ডদান লব্ধ যে পূণ্যাংশ দান করে থাকে,তাকেই জ্ঞাতি প্রেতগণ জীবন ধারণ করে। সাধারণত যার উদ্দেশ্যে দান তিনি যদি প্রেতলোকে উৎপন্ন না হলেও যিনি দান করেন তার উদ্দেশ্যে বৃথা যায় না। দানফল কখনোই ব্যর্থ হয় না। কারণ প্রেতলোকে খাদ্যাঙ্কাখী বহু জ্ঞাতি প্রেত ও প্রেতলোক থাকে। তারা ও দানফল প্রাপ্ত হয়। জ্ঞাতি প্রেত দানে ৪ টি কর্ম ও কর্মফল পাওয়া যায়। যথা : ক. জ্ঞাতি ধর্ম পালনে শীল, খ. স্বর্গীয় বা নারকীয় বা অর্হৎ যেই হোক তাদের উদ্দেশ্যে স্মৃতি পূজা হয়, গ. পরোপকার সাধিত হয় এবং ঘ. দাতার অফুরন্ত পূণ্য লাভ হয়।

পরহিতে দান

কর্মযোগের হেতু সমাজে নানা শ্রেণী পেশার মানুষ বিদ্যমান। সুকর্মের ও কুকর্মের কারণে কেউ সমাজের উচ্চ স্তরে অবস্থান করছে আবার কেউ নিম্নস্তরে। যে ব্যক্তি অর্থ দুর্বলতার কারণে নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশে অসমর্থ, তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পাচ্ছে না, তাকে সাহায্য করা, অস্বচ্ছল ব্যক্তি-বর্গকে সাহায্য করা, অস্বচ্ছল ব্যক্তি-বর্গকে সাহায্যের মাধ্যমে সমাজে তার সামান্যতম হলেও অবস্থান তৈরী করাকেই মূলত পরহিতে দান বোঝায়। কুকর্মের মাধ্যমে সমাজে যে ব্যক্তি দিন দিন অবহেলিত হচ্ছে তাকে সঠিক জ্ঞানদানের মাধ্যমে কুশল কর্ম করবে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে, প্রয়োজনে অর্থ সহযোগিতার মাধ্যমে সঠিক পথ প্রদর্শন করাই পরহিতে দান।

আত্মহিতে দান

পূর্বের আলোচনায় উক্ত হয়েছে যে, দান মানুষের মনকে বড় করে, লোভকে মন থেকে দূর করে, ব্যক্তির জয়-যাত্রাকে স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ করে, মনের কলুষতা দূর করে, সমাজে দাতার মান,সম্মান,সহায়,সম্পদ বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি নিজেকে সুগঠিত, সুসংহত, সুরক্ষিত, জ্ঞানবান করে সমাজ প্রত্যয়ের সৃষ্টি করে। অন্ন-পান-বস্ত্র-ভৈষজ্য, যান-শয্যা, ঘর-বাড়ি, রাস্তা, সেতু, জ্ঞান, মালা, গন্ধ, বিলেপন, প্রদীপ ইত্যাদি দানের দ্বারাই মানবীয় ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত হয়। এরূপ দান শক্তি সঞ্চয় মানুষের বহুজন্ম সাপেক্ষ। দানের প্রাচুর্য থেকেই মানুষ আত্ম হিত লাভ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে সমাজের উপকারও সাধিত হয়।

বৌদ্ধধর্মে শীল

'শীল" একটি গভীর অর্থবোধক শব্দ যার অর্থ সদাচার। বৌদ্ধ দর্শনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎকর্ম সাধনের মাধ্যমে সৎ চারিত্রিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়া। একজন সৎ নীতিসম্পন্ন ব্যক্তি তার সৎ চরিত্র ও সৎ কর্মের মাধ্যমে জীবনে যে সাফল্য আনতে পারে, তা অন্য কোন উপায়ে আনা সম্ভব নয়। মহামতির অহিংসা নীতি পালনের মাধ্যমে সৎ চরিত্র, সৎনীতি ও সৎকর্ম বা সুফল কর্মের মাধ্যমে, সকল প্রকার অকুশল বৃত্তি পরিহার করে দান,শীল ও ভাবনা দ্বারা জন্ম জন্মান্তরে সুখ-শান্তি সমৃদ্ধি লাভ করা যায়। বৌদ্ধ দর্শনে নিয়ম-শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, তাই বর্তমান জন্মে সুখ, শান্তি লাভ করতে হলে শীল পালন তথা পঞ্চশীল পালনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে। সুন্দর ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য পঞ্চশীল পালন আবশ্যক।

'শীল' শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বভাব বা চরিত্র। এর আরও কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ হচ্ছে সংযম, সদাচার, শৃঙ্খলা, নিয়ম-নীতি, আশ্রয় ইত্যাদি। মূলত কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সংযমকে শীল বলা হয়। নৈতিকতা অর্জনের জন্য শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হচ্ছে শীল পালন করা। বৌদ্ধ ধর্মে গৃহীদের জন্য রয়েছে পঞ্চশীল, উপোসথ গ্রহণকারীদের জন্য রয়েছে অষ্টশীল এবং শ্রমণগণের জন্য রয়েছে দশশীল। এগুলোর মধ্যে যে শীলের পালনের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান প্রয়োজন হয় না, নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজন হয় না। শীল সর্বত্র পালনীয়। গৃহীদের পালনীয় শীল পঞ্চশীল হচেছ অন্যতম পালনীয় শীল। এই শীল পালনে জন্ম-জন্মান্তরের কষ্ট ও লাঘব হয়। পঞ্চশীল ভঙ্গের কুফল ও পঞ্চশীলের মাহাত্ম্য তুলে ধরা হলো:

বৌদ্ধ কর্মবাদে পঞ্চশীল ভঙ্গের কুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। কর্মবাদে প্রাণীহত্যা না করা, অদত্তবস্তু গ্রহণ না করা, কাম ব্যাভিচার না করা, মিথ্যা না বলা, সুরা, মাদকদ্রব্য সেবন না করতে বলা হয়েছে। গুণহীন প্রাণী হত্যায় অল্প পাপ এবং বড় প্রাণী হত্যায় বড় পাপ। প্রাণীর দেহের আকারের উপর ও পাপ নির্ভরশীল। দীর্ঘদিন কাউকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করলে একরকম পাপ, আবার স্বল্প সময়ে কষ্ট দিয়ে হত্যার

উপর ও পাপ তারতম্য করে। এই রূপ কর্ম করলে কর্মফল ও ভয়ংকর। প্রাণী হত্যা করলে মৃত্যুর পর তিনি নরকে উৎপন্ন হন। নরকে দীর্ঘদিন নারকীয় যন্ত্রনা ভোগ করেন। যদি কোন রকমে নরক বাস শেষ হয়, তাহলে তার জন্ম হয় বিভিন্ন প্রাণীকূলে। সেখানে তাকে নানামাত্রিক দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। আর তিনি যদি মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি অন্ধ, বোবা, বধির, বিভিন্ন রোগাগ্রস্থ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর নানা দুঃখ-দুর্দশা শেষে অল্পায়ু বা অকাল মৃত্যু হয়ে তার জীবনের পরিসমাপ্তি হয়।

অদত্ত বস্তু গ্রহণ বা চুরি করলে তার ফলাফল ও ভয়াবহ। এরূপ কর্মের কর্মফল রূপে মৃত্যুর পর তার নরক বাস নিশ্চিত হয় এবং তিনি আবার মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করলে দরিদ্রকূলে বা অতি দরিদ্র হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হয়।

কামেসু মিচ্ছাচারা বা যৌন ব্যভিচার নামক কর্মের কর্মফল অত্যন্ত নির্মম হয় নিজ স্বামী বা নিজ স্ত্রী ব্যতীত অন্য পুরুষ বা নারীর সাথে গমনই হচ্ছে ব্যভিচার করা। তাছাড়া অযাচিত যৌন নিপীড়ন, ধর্ষণও ব্যভিচারের আওতায় পড়ে। ব্যভিচারের কর্মফল রূপে, পুরুষ যদি ব্যভিচার করে তাহলে তাকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নরক ভোগ করতে হয়। নরক ভোগ শেষে যদি মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে তাকে নারী হয়ে জন্ম নিতে হয়। নারী হয়ে জন্মগ্রহণ করার পর তার মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক জটিলতা দেখা যায়। গর্ভধারণ করতে পারে না এবং বিভিন্ন রকমের নারী ঘটিত সমস্যার মুখোমুখি হয়। আর কোন নারী যদি ব্যভিচার করে থাকে তাহলে তাকে একই রকমভাবে দীর্ঘ জীবন নরক বাস করতে হয় এবং নরক বাস শেষে যদি মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে তাহলে নপুংশক হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার জীবন হয়ে উঠে নানামাত্রিক সংগ্রাম ও প্রতিকূলতাপূর্ণ।

কামভাব উৎপন্ন হলে ৮টি বিষয় চিন্তনের মাধ্যমে তার প্রশমণ সম্ভব। আটটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয় ও যদি তিনি চিন্তা করেন তাহলে তার দুর্বিনীত কাম চিত্ত প্রশমন সম্ভব। এগুলো হলোঃ

১। অশুভ চিন্তা ২। আহার্য বস্তুর প্রতি ঘৃণা উৎপাদন ৩। মরণ চিন্তা ৪। জগতের সব বিষযে অনিত্যতা দর্শনে উদাসীন ভাব ৫। আনিত্য বিষয়ে দুঃখ চিন্তা ৬। দুঃখময় বস্তুতে অনিত্য চিন্তা ৭। ত্যাগ চিন্তা ৮। যাবতীয় বিষয়ে ত্যাগ চিন্তা।

কেউ যদি মিথ্যা ভাষণ করে, মিথ্যা ভাষণে অন্য কাউকে বিপদে ফেলে, কটু কথা বলে কাউকে দুঃখ দেয়, মানুষের মনে অশান্তি উৎপাদন করে, তাহলে তার মৃত্যুর পর নরকবাস অনিবার্য। মানুষ হয়ে জন্ম নিলে মুখ দিয়ে দুর্গন্ধ, কর্কশভাষী, তোতলা হয়ে জীবনপাত করতে হয়। এই কর্মের ফল হয় ভয়াবহ।

সুরা, মাদকদ্রব্য সেবন ও প্রমাদ কারণে ও বিরতি আবশ্যক। এরূপ কর্মের কারণে সুরা পানকারী নরকে, তির্যক যোনীতে, প্রেত ও অসুর লোকে জন্ম হয়। যদি মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে তাহলে বোবা, কুশ্রী দর্শন, পাগল প্রভৃতি হয়ে জন্ম গ্রহণ করতে হয় এবং জীবন পার হয় নানামাত্রিক দুঃখ কষ্টে।

সুতরাং, বুদ্ধের কর্মবাদের কথা স্মরণ রেখে আমাদের সবসময় এমন কর্ম করা উচিত যার মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ হয়, দেশ, দশ ও জনগণের উপকার সাধিত হয় সর্বোপরি রাষ্ট্রের সুনাম বৃদ্ধি হয়, সমাজে সকলের কাছে স্মরণীয় হয়ে থাকা যায়।

অষ্টশীল

মহামতি বুদ্ধ গৃহীদের প্রতি অমাবস্যা পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে শ্রদ্ধার সাথে যে আটটি নিয়মনীতি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, বৌদ্ধ দর্শনে তা অষ্টশীল নামে পরিচিত। ধর্মময় জীবন যাপনের জন্যই মূলত অষ্টশীল পালন করা হয়। গৃহী বৌদ্ধরা সাধারণত পঞ্চশীল পালন করে থাকলেও উপরোক্ত তিনটি বিশেষ তিথিতে তারা আরও ৩টি শীল বেশী পালন করেন। এ তিথি গুলো ছাড়াও অষ্টশীল পালন করা যায়। পঞ্চশীল পালনকারীরা সাংসারিক যাবতীয় কাজকর্ম করতে পারেন। কিন্তু অষ্টশীল পালনের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য

পালন, বিকালে ভোজন থেকে বিরত থাকা, নৃত্য-গীত-বাদ্য, উৎসবাদী দর্শন, মাল্যধারণ, সুগন্ধিদ্রব্য লেপন, মন্ডিত ও বিভূষিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হয়। সব সময় ধর্মচিন্তা করে শীল পালন করতে হয়। এ সময় সাংসারিক সকল চিন্তা পরিত্যাগ করতে হয়। পঞ্চশীলকে এজন্য গৃহী শীল বলা হলেও অষ্টশীলকে উপোসথ শীল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

অষ্টশীল পালনের সময় কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখা উচিত।[৩] যথা:

- এমন স্থান পরিভ্রমণ করা উচিত নয় যেখানে শীল ভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে।
- কারো অনিষ্ট কামনা ও অনিষ্ট করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
- লোভ, দ্বেষ-মোহ মুক্ত থাকতে হবে।
- সকল প্রকার মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত থাকতে হবে।
- কোন প্রাণীকে শারীরিক ও মানসিক কষ্টদান থেকে বিরত থাকতে হবে।
- সকল প্রকার অন্যায় কর্ম থেকে বিরতি দিতে হবে।
- প্রমাদমূলক বিনোদন থেকে দূরে থাকতে হবে।
- ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং ধর্মীয় দেশনা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে হবে।
- কায়-মন ও বাক্যে সংযত আচরণ করতে হবে।

- সকল জীবের প্রতি মৈত্রীপরায়ণ হতে হবে।
- ভাবনা অনুশীলন করতে হবে।

দশশীল

শ্রামণ বা প্রব্রজিতদের জন্য প্রতিদিন যে দশটি নিয়মনীতি মহামতি বুদ্ধ নির্দেশনা দিয়েছেন, তাই বৌদ্ধ দর্শনে দশশীল নামে পরিচিত। গৃহীরা যখন সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করে শ্রামণ জীবনে প্রবেশ করেন, তখন প্রব্রজিত হওয়ার সময় তারা দশ শীলে দীক্ষা নেন। ভিক্ষু বা উপসম্পদা লাভের পূর্ব পর্যন্ত তারা নিয়মিত দশশীল পালন করেন। দশশীল প্রার্থনার জন্য শ্রামনকে ভিক্ষুর সামনে সুন্দরভাবে উপবেশন পূর্বক দু'হাত জোড় করে সংক্ষেপে ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষু বন্দনা করার পর দশশীল প্রার্থনা করতে হয়। এর পরে ভিক্ষু শ্রামণকে দশশীল প্রদান করেন। পঞ্চশীলের পাশাপাশি আর ও পাঁচটি অতিরিক্ত শীল[৪]গুলো হলো:

১. বিকাল বেলা ভোজন থেকে বিরত থাকা

২. নাচ-গান-বাদ্যযন্ত্রের উৎসব দর্শন থেকে বিরত থাকা

৩. মালা ধারণ, সুগন্ধি দ্রব্যের প্রলেপ ও অলংকার গ্রহণ থেকে বিরত থাকা

৪. আরামদায়ক শয্যা থেকে বিরত থাকা এবং

৫. সোনা-রূপা মুদ্রা আদান প্রদান ও গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

ভিক্ষু শীলকেও নিম্নোক্ত বিভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল

প্রাতিমোক্ষ সংবরশীল চারিত্র ও বারিত্র দুই ভাগে বিভক্ত। বোধি অঙ্গন ও উপোসথাগারদি মেরামত করা। উক্ত স্থান সমূহ সম্মার্জন করা। তৃণ, পত্র, আবর্জনা ও সেলাইপত্রে যদি ময়লা হয়, তা নিজে হোক বা অপরের দ্বারা হোক পরিষ্কার করা। রুগ্ন, বৃদ্ধ, শীলবান ও গুণবানদের সেবা পরিচর্যা করা। আচার্য ও শীলবানদের দিনে তিনবার বন্দনা করা। লব্ধ খাদ্য, ভোজ্য আশ্রিতদের দিয়ে ভোগ করানো। সুন্দর করে পরিমন্ডলকারে ও সুপ্রতিচ্ছন্নভাবে চীবর পরিধান করা এবং খাদ্য, ভোজ্য এমনকি সামান্য জল ও প্রত্যবেক্ষণ করে যথাবিধান মতে পরিভোগ। এসব ব্রত প্রতিব্রত রক্ষা করার নাম চারিত্রশীল। কোনো কাজগুলো করা অনুচিত, কোন কাজগুলো মহামতি প্রত্যাখান করেছেন এবং অকরনীয় বিষয় যা তিনি নির্দিষ্ট করেছেন এবং দশ প্রকার কুশল কর্ম, আচার ইত্যাদি সমস্ত শীল পরিপূর্ণ করার নাম চারিত্রশীল।[৫]

২. ইন্দ্রিয় সংবর শীল

রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও ধর্ম এই ছয় প্রকার আরম্মণের প্রতি শুভচিন্তায় উৎপন্ন কাম-ইচ্ছা, অপরের অনিষ্ট করার চিন্তায় উৎপন্ন হিংসা ও বিপরীত চিন্তা দ্বারা উৎপন্ন প্রমাদ ভাব এই সবগুলো হল পাপশত্রু। এই

সব চিন্তা যাতে মনে স্থান না পায় তার উপায় স্বরূপ চক্ষু, শ্রোত, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মনোদ্বার বন্ধ করতে হবে। ছয়টি দ্বারে কবাট হলো স্মৃতি, প্রজ্ঞা হলো পাপ,শত্রু ধ্বংসকারী সুতীক্ষ্ম অস্ত্র। সুতরাং, স্মৃতি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে সতর্কতার সাথে ষড় ইন্দ্রিয়কে দমন করার নাম ইন্দ্রিয় সংবর শীল।

৩. আজীব পরিশুদ্ধি শীল

কায়-বাক্য সম্পাদিত প্রাণী ইত্যাদি। সাত প্রকার অকুশল কর্ম, কুহক বা মিথ্যা মায়াজাল ও ছল চাতুরিপূর্ণ অলিক কার্য বা বাক্য ইত্যাদি গর্হিত লাভ-সৎকার উৎপাদনে বিরত থেকে ধর্মত লব্ধ উপায়ে চতুপ্রত্যয় (আহার, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান) এ জীবিকা নির্বাহের নাম আজীব পরিশুদ্ধি শীল।

৪. প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল-ধর্মত

উৎপন্ন চারি প্রত্যয়ে লোভ, দ্বেষ, মোহ উৎপাদন না করা, অসন্তুষ্ট থাকা এবং অধিক লাভের ইচ্ছা না করাকেই প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল বলে।

৫. জ্ঞান সংবর শীল

জ্ঞান, প্রজ্ঞা দিয়ে রক্ষা করা। তৃষ্ণা, মান, দৃষ্টি, অবিদ্যা, ক্লেশ ধর্মগুলো যাতে বৃদ্ধি না হয় সেভাবে জ্ঞান প্রজ্ঞা দিয়ে রক্ষা করা। চারি প্রত্যয় ব্যবহারে যাতে ক্লেশ উৎপন্ন না হয় সেভাবে প্রজ্ঞার মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা।

৬. ক্ষান্তি সংবর শীল

শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অভাব, অনটন বিষয়ে সহনশীলতাই হলো ক্ষান্তি সংবর শীল।

৭. বীর্য্য সংবর

কামগুণ সম্পর্কিত চিন্তা, অপরের অনিষ্টের চিন্তায় উৎপন্ন হিংসা ও বিপরীত চিন্তা দ্বারা প্রমাদভাব যাতে উৎপন্ন না হয় সে জন্য বীর্য্য সহকারে পালন করা। বিশেষ করে আজীব পরিশুদ্ধ ও এর অর্ন্তভূক্ত। অর্থাৎ, সৎ জীবিকা দ্বারা জীবন নির্বাহ করার জন্য বীর্য দ্বারা রক্ষা করা।

৮. অব্যতিক্রমশীল

গ্রহণকৃত শিক্ষাপদ গুলোকে কায়িক-বাচনিক দ্বারা অনতিক্রমকে অব্যতিক্রমশীল বলা হয়।

'শীল' হচ্ছে সমস্ত কুশল কর্মের আধার স্বরূপ। যারা মুক্তিকামী ভিক্ষু তার শীলের উপর আশ্রয় করে। শীলের উপর ভিত্তি স্থাপন করে, প্রজ্ঞা, স্মৃতি, বীর্য, শ্রদ্ধা, সমাধি এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল ভাবনা করেন, বর্ধিত করেন। মহামতি বুদ্ধ শীলকে পৃথিবীর সাথে তুলনা করেছেন। পৃথিবী না থাকলে যেমন বীজ গাছপালা, মানুষ, প্রাণী, বাড়ি, গাড়ি, বড় দালান, কলকারখানা কিছুই থাকত না। এগুলো সব পৃথিবীর উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। অনুরূপভাবে, সকল প্রকার গুণধর্ম শীলের উপর ভিত্তি করে দাড়িয়ে রয়েছে।শীল পালনের সুফল

অনেক। মহামতি বুদ্ধ বলেছেন, যদি কোন ভিক্ষু আকাঙ্খা করে যে, সে সব্রহ্মচারিদের কাছে প্রিয় হবে, মনোজ্ঞ হবে, গৌরবনীয় হবে, সম্মানিত হবে, তাহলে তার শীল পরিপূরণ ও পালনকারী হওয়া উচিত।[৬]

শীল পালনের সুফল সম্পর্কে মহামতি আরও বলেছেন-"শীলবান ব্যক্তি শীল পালনে পাঁচ রকমের সুফল ভোগ করে। সেই পাঁচটি কী কী?

"গৃহপতিগণ, শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তি অধ্যবসায় সম্পন্ন হয়ে ও অপ্রমত্ত হয়ে অধিষ্ঠিত থেকে মহা ভোগসম্পদ লাভ করে। শীলবান শীল সম্পদের এই হচ্ছে প্রথম সুফল। "

"গৃহপতিগণ, শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তির সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। শীলবানের শীল সম্পদের এই হচ্ছে দ্বিতীয় সুফল।"

"গৃহপতিগণ, শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তি ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, গৃহপতি পরিষদ, শ্রমণ পরিষদ, যে পরিষদেই উপস্থিত হোক না কেন, তিনি সেখানে আত্মবিশ্বাসী ও প্রশান্তভাব নিয়ে উপস্থিত হন। এই হচ্ছে শীলবান শীল সম্পদের তৃতীয় সুফল "

"গৃহপতিগণ, শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তি অবিমূঢ় হয়ে বা সৎ জ্ঞানে মৃত্যুবরণ করে। এই হচ্ছে শীলবানের শীল সম্পদের চতুর্থ সুফল।

"গৃহপতিগণ, শীলবান শীলসম্পন্ন ব্যক্তি দেহত্যাগে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়। এই হচ্ছে শীলবান শীল সম্পদের পঞ্চম সুফল।

এই একই সূত্রে মহামতি শীল ভঙ্গের কুফল ও ব্যাখা করেছেন। শীল ভঙ্গের কুফল যে কতটা ভয়াবহ হয় তা বুদ্ধ নিম্নোক্ত উদাহরণে ব্যাখা করেছেন। পাঁচ প্রকার কুফল গুলো হলো :

"দুঃশীল বা শীল বিপন্ন ব্যক্তি প্রমাদের কারণে মহাসম্পত্তি বিনষ্ট করে। এটা হচ্ছে দুঃশীলের শীল লঙ্ঘনের প্রথম কুফল"

"দুঃশীল ব্যক্তির চারদিকে কুকীর্তি ও দুর্নাম ছড়িয়ে পড়ে। এটাই দুঃশীল ব্যক্তির শীললঙ্ঘনের দ্বিতীয় কুফল।"

"দুঃশীল ব্যক্তি ক্ষত্রিয় পরিষদ, ব্রাহ্মণ পরিষদ, ভিক্ষু পরিষদ, যে পরিষদেই উপস্থিত হন না কেন, তিনি হতবুদ্ধি, হতোদ্যম, মৌন হয়ে উপস্থিত হন। এটি দুঃশীল ব্যক্তির শীল লঙ্ঘনের তৃতীয় কুফল।"

"দুঃশীল শীল বিপন্ন ব্যক্তি অজ্ঞান, বিমূঢ় হয়ে মৃত্যুবরণ করে। এটাই দুঃশীল ব্যক্তির শীল লঙ্ঘনের চতুর্থ কুফল।

"দুঃশীল, শীলবিপন্ন ব্যক্তি কায়ভেদে মৃত্যুর অব্যবহিত পর নরক, তির্যক, প্রেত ও অসুরকূরে জন্ম ধারণ করে। এটাই শীল বিপন্ন ব্যক্তির শীল লঙ্ঘনের পঞ্চম কুফল।"[৭]

বৌদ্ধ দর্শনে বর্ণিত হয়েছে যে, শীল কর্ম পালন ব্যতীত সুখের আশা করা বোকামি। প্রবজিত হোক বা গৃহী হোক, প্রত্যেক নর-নারীর শীল পালন একান্ত কর্তব্য। এই কর্মের মাধ্যমে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক সকল

প্রকার দুর্দশা দূরীভূত হয়ে ব্যক্তি শান্ত, শীতল, নিশ্চল ও সুসংহত হয়। যে ব্যক্তি শীল পালনে উচ্চাকাঙ্খা প্রদর্শন করবে, তার কর্মফল ততই উজ্জ্বল হবে। শীল কর্ম পালনের মাধ্যমে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা যায় তেমনি সৎ গুণের অধিকারী হওয়া যায় একই সাজে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায় এবং সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

পঞ্চশীল পালনের সুফল বহুবিধ। যেমন : যথাযথ শীল কর্ম পালনে প্রাণীহত্যা, অদত্তবস্তু গ্রহণ, মিথ্যা ব্যভিচার, মিথ্যা কথা বলা, কটু কথা বলা ও মাদক দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত রাখে। মনকে সুসংহত ও শান্ত করে, চরিত্র সুসংহত হয়, মনের মধ্যে কালিমা থাকলে তা দূরীভূত হয় মানুষকে সৎ কাজে উৎসাহিত করে এবং অনৈতিক ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, কথা বলায় নৈতিক সংযত ভাব আসে, ব্যক্তিকে বিনয়ী ও ভদ্র করে তোলে। জীবনকে সুন্দর পথে পরিচালিত করে। নৈতিক জীবন যাপন করা যায়। পঞ্চশীল পালনে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন আলোচনায় আমরা বুঝতে পেরেছি যে, মানব জীবনের তাৎপর্য অনেক। এই জীবন দুর্লভ। যেহেতু মানব জীবন দুর্লভ সেহেতু কুশল কর্ম সম্পাদন পূর্বক শীল পালন পূর্বক এই দূর্লভ মনুষ্য জীবন স্বার্থক করা প্রয়োজন। তাই সুকর্ম তথা শীলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য ও অপরিসীম।

ভাবনা

ব্যক্তি মন মানেই অস্থির ও চঞ্চল। সেই অস্থির ও চঞ্চল মন যে কোন সময় ভুল ভ্রান্তি করতে পারে। বিভিন্ন অকুশল কর্ম করতে পারে। সেই অস্থির ও চঞ্চল মনকে একাগ্রতা বা সমাহিত করাকে ভাবনা বা ধ্যান বলে। মানসিক উন্নয়ন তথা মানসিক শান্তির জন্য ভাবনার গুরুত্ব অপরিসীম। মানসিক উন্নয়নের মাধ্যমে মুক্তির পথ বা নির্বাণ অর্জনের জন্য ভাবনার প্রয়োজন অপরিহার্য।

অশুভ ভাবনা (কোনো ব্যক্তির পর তার দেহে পচন ধরে। মানব দেহের এই দৈহিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন দশা বা অবস্থাকে নির্মিত করে বা তার উপর মনোনিবেশ করে যে ধ্যান করা হয়)। প্রতিত্যসমুৎপাদ, স্মৃতি ও অনুস্তৃতি (অনুস্তৃতি বল যে কোন কিছু বার বার স্মরণ করা বোঝায়)। বৌদ্ধ ধর্মে দশ প্রকার অনুস্তৃতি রয়েছে। যথা বুদ্ধানুস্তৃতি, ধর্মানুস্তৃতি, সংখ্যানুস্তৃতি, শীলানুস্তৃতি, ত্যাগানুস্তৃতি, দেবাতস্মৃতি, উপশমানুস্তৃতি, মরণানুস্তৃতি, কারাগতানুস্তৃতি এবং আনাপনা স্তৃতি। ব্রহ্মবিহার সহ ধ্যানের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে নির্বাণ লাভ হয়। ধ্যানের এই পদ্ধতি গুলো করে ব্যক্তির মানসিক উন্নয়ন সাধন করা যায়। এই পদ্ধতি গুলোর নিয়মিত অনুশীলনে মন শান্ত হয় ও মন কুপথে পরিচালিত হবার সুযোগ পায় না।[৮] বৌদ্ধ দর্শনে ধ্যানকে ২ ভাবে ভাগ করা হয়েছে। ১. বিদর্শন এবং ২. শপথ

বিদর্শন ভাবনা

নির্বাণ লাভের জন্য বিপাসনা সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। সাধারণত কোন কিছুকে বিশেষভাবে দেখা বা উপলব্ধি করাকেই বিপাসনা বলে। এই পদ্ধতিতে যে বস্তু যে ভাবে, যে অবস্থানে রয়েছে তাকে সে ভাবে দেখার মাধ্যমে নিজের সংশোধন করা যায়। এখানে স্তৃতিপ্রস্থানকে চারটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ক. কায়ানুদর্শন : শরীরের প্রতিটি ক্রিয়াকে বিশেষভাবে দর্শন করাকে কায়ানুদর্শন বলে।

খ. বেদনানুদর্শন : বৌদ্ধ দর্শনে সকল অনুভূতিকেই বেদনা বলে। সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা এই ধরনের সকল অনুভূতিকে বিশেষ ভাবে দর্শনকে বেদনানুদর্শন বলে। গ. চিত্তানুদর্শন : লোভ, হিংসা, কামাচ্ছন্নতা, ক্রোধাচ্ছন্নতা, অলস, অতিঘুম, অতিভোজনছন্নতা, অহংকারী, মানসিক দোটানাতে আচ্ছন্ন হওয়া সহ অন্যান্য যে সকল মানসিক বৃত্তির উদয় হয় সেগুলোকে বিশেষভাবে দর্শনই চিত্তানু দর্শন। ঘ. ধর্মানুদর্শন : চক্ষু আয়তন, শ্রোতায়তন, ঘ্রাণায়তন, জিহ্বায়তন, কায়ায়তন, ও মনানায়তন এই ষড়ায়তনের মাধ্যমে শরীর ও মনের অবস্থার পরিবর্তন কে বিশেষ ভাবে দর্শনই ধর্মানুদর্শন।

শমথ ভাবনা

প্রশান্তির মাধ্যমে মনোযোগ বা সমাধির গঠনকে শমথ ভাবনা বলে। এই ধ্যান বা ভাবনার মূল লক্ষ্য হলে মনের একাগ্রতা স্থাপন ও মনকে শান্তরাখা। শমথ ধ্যানে চল্লিশ প্রকারের অনুশীলন রয়েছে। এগুলো হলো : দশ কসিন ধ্যান, দশ অশুভ ধ্যান, দশ অনুস্মৃতি ধ্যান, চার ব্রহ্মবিহার ধ্যান, আহার প্রতিকূল সংজ্ঞা ধ্যান, এক ব্যবস্থান ধ্যান ও চার অরূপ ধ্যান। কথিত রয়েছে, শমথ ভাবনার মাধ্যমে অতি প্রাকৃতিক ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব।

থেরবাদ দর্শনে ধ্যান সম্পর্কে *'পটিসম্ভিদামগ্গ'* গ্রন্থটিতে কীভাবে শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিমিত্ত করে ধ্যান করা যায় তার বর্ণনা পাওয়া যায়। থেরবাদ দর্শনে বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমাগ্গ কে ধ্যানের নির্দেশিকা হিসেবে বলা হয়েছে। বর্মী বা মায়ানমারের ভিক্ষুরা শমথ ভাবনাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেন ও শ্যাম দেশীয় বা থাইল্যান্ডের ভিক্ষুরা আবার শমথ ভাবনা ও বিদর্শন ভাবনাকে একটি অপরটির পরিপূরক ভাবেন। আবার ভারতীয় মহাযান দর্শনে দেখা যায় যে, মহাযান অনুশীলনের মূল চিন্তা ভাবনা হচ্ছে বুদ্ধত্ব লাভ। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য অপরিহার্য হলো ধ্যান ও ভাবনা থাকা। মহাযান, পারমী গুলোর মধ্যে একটি। ভারতীয় মহাযান ধারার বিকাশই হয়েছে মূলত বুদ্ধের ধারা, তত্ত্ব, মতবাদ ও ধ্যানের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে।[৯]সুতরাং,এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, মানসিক শান্তির জন্য বিকাশের জন্য ধ্যান, ভাবনার অনুশীলন অপরিহার্য।

সেবাজনিত পূণ্যকর্ম

সূত্রপিটকের খুদ্দক নিকায়ের অর্ন্তগত *'সুত্ত নিপাত'* গ্রন্থের মঙ্গলসূত্রের দুই নং গাথায় উল্লেখ রয়েছে

অসেবনা চ বালানং, পণ্ডিতানঞ্চ সেবনা

পূজা চ পূজনীয্যানং এতং মঙ্গল সুত্তমং।[১০]

অর্থাৎ, মূর্খ (অজ্ঞানী/অসভ্য/হীন বা নীচমনা/অন্যায়কারী/অপরাধকারী/দুঃখ সৃষ্টিকারী, লোভী, হিংসাকারী, অত্যাচারী, প্রাণী হত্যাকারী, পরদ্রব্য চুরিকারী, মিথ্যাবাদী, ব্যাভিচারী, নেশা পানকারী, পাপী, মানুষরূপী অমানুষ) ব্যক্তির সেবা না করা, পন্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তির সেবা করা, পূজনীয় ব্যক্তির পূজা করা উত্তম মঙ্গল। পিতা ও মাতার সেবা, আচার্য ও উপাধ্যায় সেবা, যারা সৎ শিক্ষা দেয়, সৎ উপদেশ দেয়, অন্যান্য গুরুজনবর্গ সেবা, দেশসেবা, আর্তজনের সেবা করা উত্তম মঙ্গল।

সম্মানজনিত পূণ্যকর্ম

বয়স্ক ও শীলগুন সম্পন্ন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উত্তম। মানীর অপমান ব্রজপাঠতুল্য। মানী ব্যক্তিকে তার যথার্থ সম্মান প্রদর্শন না করে অপমান করলে সমাজে ঘোরতর অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন হয়। মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি হয়। শুরু হয় হানাহানি। বয়সে ছোট যারা তারা বড়দের, মানীদের মান্য না করলে তা হয় ভবিষ্যতে সমাজ ও জাতির জন্য অত্যন্ত হানিকর হয়। তাই অভিবাদন যোগ্য ব্যক্তিকে অভিবাদন করা, নমস্কার যোগ্য ব্যক্তিকে নমস্কার করা এবং সম্মানীয় ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শন করা উত্তম ও মঙ্গল।

পূণ্যদান জনিত পূণ্যকর্ম

পূণ্য শব্দের অর্থ হচ্ছে সংকার্য, সুকৃতি, ধর্মানুষ্ঠান, সৎকার্যাদির যে শুভ ফলে পরজন্মে সদগতি লাভ হয় আর দান অর্থ স্বল্পত্যাগ পূর্বক কাউকে কিছু অর্পন, উৎসর্গ, ত্যাগ, বলা যায়। কোন কুশলকর্ম করার মাধ্যমে মনে যে পবিত্রতা, আনন্দ ও পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়, যে সুখানুভূতি হয় তাই পূণ্য। সাধারণতভাবে পূণ্য হলো চেতনা বা মনকে সহজ সরল করা, নিষ্কলুশ করা। আর দান হচ্ছে সর্বাঙ্গীন ত্যাগ স্বীকার, অন্যের প্রতি উদারতা প্রদর্শন, নিজের অধিকারের কোন কিছু বিনা শর্তে অন্য কাউকে দিয়ে দেওয়া। কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে, মনে যে পবিত্রবস্থা বিরাজ করে দেবতা, মানুষ সহ সকল প্রাণীর ভালো হোক। সুখ প্রাপ্তি হোক এরূপ কামনা করা। অন্ন পান বস্ত্র দানীয় বস্তু উপযুক্ত পাত্রে দান করে লব্ধ পূণ্যের অংশ সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করা। এর ফলে মনে প্রশান্তি ভাব উৎপন্ন হয়। পূণ্য বৃদ্ধি পায় প্রশংসিত হয়।

পূণ্যানুমোদন জনিত পূণ্যকর্ম

পরের পূণ্যকাজকে সমর্থন জানানো, সাধুবাদ জানানো, প্রশংসা করা পূণ্য অর্জনকারী ব্যক্তিতে সাধু সাধু সাধু বললে বা তার প্রশংসা কররে তাকে পূণ্যানুমোদন বলে। পূণ্যদান ও পূণ্যানুমোদন সম্পর্কে শীলানিশংস জাতক ও সংঘব্রাহ্মণ জাতকে বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে। অপদান বর্ণনায় ও ত্রিলোক বিজয়ী নামধেয় রাজচক্রবর্তী বলেছেন:

মং কিঞ্চি কুসলং কম্ম কত্তব্বং কিরিয়ং মম

কায়েন বাচা মনসা তিদসেসু গতং কতং।

যে সত্তা সঞ্ঞিনো অত্থি যে চ সত্তা অসঞ্ঞিনো

কতং পুঞ্ঞফলং ময় হং সব্বে ভাগী ভবন্তু তে।

যে তং কতং সুবিদিতং দিন্নং পুঞ্ঞফলং ময়া

যে চ তত্থ ন জানন্তি, দেব গন্ত্বা নিবেদয়ং।

সব্বে লোকম্হি যে সত্তা জীবন্ত্যাহার হেতুনা

মনুঞ্ঞং ভোজনং সব্বে লভন্তু মম চেতসা'তি।"[১১]

পূণ্য শুধু দান করলেই চলবে না, যাকে দান করা হচ্ছে তার অনুমোদনও থাকা চাই। তাহলেই পূণ্যগ্রাহীর সুফল অনুভূত হবে। অপ্রত্যক্ষ পূণ্যদান সাধারণত পূণ্যাকামী দেবতা ও প্রেতগণই পেয়ে থাকেন। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত যাই হোক, পূণ্য দান করে নিজের পূণ্য চেতনা প্রসারিত করবে। রাজ চক্রবর্তী দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করছেন, যারা আমার দান বিষয়ে জানতে পারছেন না, আপনারা তা তাদের নিবেদন করুন-তারা যেন সুখী হয়। প্রত্যক্ষ পূণ্যদান ও পূণ্য অনুমোদন সম্পর্কে উপরিউক্ত দুই জাতকে উদাহরণ স্বরূপ লিপিবদ্ধ হয়েছে। এর ফল শ্রুতিতে আমরা পূণ্যদান ও পূণ্য অনুমোদনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অবগত হতে পারি।

ধর্ম শ্রবণ জনিত পূণ্যকর্ম

কর্মবহুল এই সংসার চক্রে চিত্তে শান্তি উৎপাদন করতে হলে, অন্তরের মোহ দূর করতে, কাম-ক্রোধ-লোভ-দ্বেষ-ঈর্ষা রিপু ধ্বংস করতে হলে, সংস্কারী তথা পরিমার্জিত সংস্কারী হতে চাইলে, সুখ-শান্তি চাইলে, জীবন রূপ সংসার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে পরম মুক্তির ইচ্ছা থাকলে ধর্ম শ্রবণ করা অপরিহার্য। সাধারণত বুদ্ধের ভাষণকৃত ধর্ম সহ শ্রাবক ভাষিত, দেব ভাষিত, ঋষি ভাষিত ধর্মই হলো প্রকৃত ধর্ম। ধর্ম শ্রবণের মাধ্যমে যেমন অজানা ধর্ম বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায় তেমনি পূর্বের ধর্ম শ্রবণ জনিত কোন বিষযে জিজ্ঞাসা বা সন্দেহ থাকলে তা ও দূরীভূত হয়। ধর্ম সম্পর্কে সকল প্রকার অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূরীভূত হয়। জীবনে আশার সঞ্চয় হয়, কুশল ও অকুশল কর্ম সম্পর্কে ও তাদের কার্যপরিধি, করণীয় এবং বর্জনীয় বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। গভীর ওদের জল যেমন পরিস্কার থাকে তেমনি পন্ডিত ব্যক্তিগণও বুদ্ধ ভাষিত নির্বাণ ধর্ম শুনে ধর্মের প্রতি চিত্ত প্রসন্ন করেন চিত্তের পাপ-ময়লা দূরীভূত করেন। ধর্ম শ্রবণ কারী বা শ্রোতামন্ডলীকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা ১. অবকুজ্ব প্রাক্ক ২. উৎসঙ্গপ্রাক্ক ৩. প্রীতিপ্রাক্ক মণ্ডল

অবকুজ্ব প্রাক্ক

স্বয়ং ভগবানও যদি দেশনা করেন, শ্রোতামন্ডলী তা ধারণ করতে পারবে না। তলাবিহীন কলসিতে যেমন জল পরিপূর্ণ করলেও তা ফাঁকা হয়ে যায় তেমনি এখানে ভগবান স্বয়ং ভাষণ করলেও তা শ্রোতার বোধগম্য হবে না

উৎসঙ্গ প্রাক্ক

শ্রোতামণ্ডলী বিভিন্ন ধর্মীয় সভায় ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে কিছু মনে রাখতে পারে।

প্রীতি প্রাক্ক

প্রীতি প্রাক্ক হলো সেই শ্রোতাণ্ডললী যারা ধর্মীয় দেশনা গুলো গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করে এবং তা অন্তরে ধারণ করে। প্রীতি প্রাক্ক ৬টি গুণলাভ করে। যথা : ১. অশ্রুত বিষয় শুনতে পাওয়া যায়; ২. মিথ্যা শ্রুত বিষয় সংশোধন করা যায়; ৩. অধর্ম বিষয়ে সন্দেহ দূর হয়; ৪. সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া যায়; ৫. চিত্তে প্রসন্ন ভাব আসে, মৈত্রী ভাব আসে এবং ৬. পূণ্য হয়। সঠিক পথে চলার রাস্তা পাওয়া যায়। সেই রাস্তা অনুসরণ করে চলে পরম সুগতি তথা নির্বাণ পর্যন্ত লাভ করা যায়।

ধর্ম দেশনা জনিত পূণ্যকর্ম

মানুষ লোভ-দ্বেষ-আসক্ত মনে সবকিছু প্রমাদ স্বরূপ দর্শন করছে। মানুষ অন্ধ হয়ে রয়েছে। এই অন্ধ অবস্থা পরিত্রাণ করে আলোর পথ অনুসরণ করতে হলে প্রয়োজন ধর্মদেশনার। চিত্তে যদি মৈত্রীভাব না থাকে, করুণা না থাকে তাহলে তাতে ধর্মদেশনা হয় না। দেশনা কারীকে এমনভাবে দেশনা করতে হবে যেন তা শ্রোতার কাছে আর্কষণীয় মনে হয়, শ্রোতার সে দেশনা শ্রবণ করে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়। দেশনা কারীকে তার নিজের শীলগুণে, ভাবের গাম্ভীর্যে, কণ্ঠের মধুরতার মাধ্যমে বিভিন্ন উপমা, উদাহরণ, যুক্তি, হেতু, প্রত্যয় যোগ করে শ্রোতাকে মুগ্ধ করতে হবে। দেশনার সময় চতুআর্য সত্যের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। চতুআর্য সত্যই মনের অন্ধকার দূর করতে পারে।

দেশনাকারীকে সত্য-মিথ্যা ভাষণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অধর্মকে ধর্মরূপে ধর্মকে অধর্মরূপে ব্যাখ্যা দিলে দেশক ও শ্রোতা উভয়েরই ক্ষতি হয়। সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়।ধর্ম দেশনায় দেশকের পাঁচটি অঙ্গ।[১২] যথা : ১. বিষয় নির্বাচন করাঃ চারটি ধারা ক) সূত্র পিটকে আদেশ বা উপদেশমূলক দেশনা করা খ) দেশক নিজেই বিষয় নির্ধারণ করা গ) শ্রোতাণ্ডলীর বিষয় নির্ধারণ করা ঘ) পূজ্য বিমুখ বা শ্রোতমাণ্ডলী প্রশ্ন করে আর দেশক সেই প্রশ্নের উত্তর দিযে দেশনা। ২. পর্যায়ক্রমে দেশনা করা ৩. পরহিতার্থে দেশনা ৪. নিরামিষ দেশনা এবং ৫. নিজেকে প্রাধান্য আশায় অন্যকে হেয় না করা।

একসময় বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করছিলেন। ধর্মদেশনা শেষ হলে ভিক্ষুসহ অসংখ্য দেব, মানুষ, ব্রহ্মা ধর্মচক্ষু লাভ করে অর্হৎ মার্গফলের বিভিন্ন স্তরে উপনীত হন। কিন্তু সেই ধর্মসঙ্গীর ত্রিশজন ভিক্ষুর রক্তবমি হয়। পরবর্তী সময়ে তারা মৃত্যুবরণ করেন ও নরকে পতিত হন। সে দেশনা শ্রবণ করে অসংখ্য প্রাণী নির্বাণ অভিমুখী হলো। সেই একই দেশনা শ্রবণ করে কেন তাদের এই করুন পরিণতি হলো এই কথা মহামতি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "আমার ধর্ম নির্বাণ প্রদায়ী ধর্ম। যারা এর ধর্মকে শ্রদ্ধার সাথে শ্রবণ করেছে তারা দুঃখ মুক্ত নির্বাণ দর্শন করেছে। আর ঐ ত্রিশ জন ভিক্ষু হিংসা ও অবিশ্বাস চেতনা নিয়ে শ্রবণ করে সেই ধর্মকে

বিকৃত রূপে ধারণ করেছে। তাই তাদের ঐ কর্মফলের কারণে রক্তবমি হয়েছে এবং অবীচি নরকাগামী হয়েছে। দেখা যায় যে, উপরি-উক্ত উদাহরণে ধর্মদেশনা, ধর্মশ্রবণ ও কর্মফলের চমৎকার রূপ বিধৃত হয়েছে।

দৃষ্টি ঋজু পূণ্যকর্ম

দৃষ্টি ঋজু কর্ম পূণ্য কর্ম হচ্ছে কর্ম স্বকীয়তা জ্ঞান। প্রত্যেক জীব তার নিজের কর্মের দৃশ্যমান প্রতিমূর্তি, এতাদৃশ জ্ঞানার্জন চেষ্টাই দৃষ্টি ঋজু কর্ম নামে পরিচিত। সহজভাবে বললে, সমস্ত পাপ কাজ বর্জন করে সত্য ও কুশলের পথ চলা। সত্যকে ধারণ করা ও প্রয়োগ করা। সকল পাপ কাজ তথা অকুশল কর্ম বর্জন পূর্বক সত্যকে আলিঙ্গন করাই দৃষ্টি ঋজু পূণ্যকর্ম। উপরি-উক্ত আলোচনায় আমরা দশ প্রকার কুশল কর্ম সম্পর্কে জানতে পারি। তাছাড়া আমরা এই আলোচনার মাধ্যমে জানতে পারি কোন কুশল কর্ম কিভাবে করতে হবে। তাই আমাদের উচিত তখন থেকেই সকল প্রজ্ঞার অকুশল কর্ম বর্জন করে কুশল কর্মের হাত ধরে নির্বাণমুখী হওয়া।

থেরগাথায় বর্ণিত কর্মবাদ ও এর প্রায়োগিক ব্যবহার

পালি 'থের' শব্দের অর্থ স্থবির, স্থিত, স্থিতধী, স্থিতিশীল ইত্যাদি। যিনি সংসার ত্যাগ পূর্বক ভিক্ষুত্ব বরণ করে কমপক্ষে দশ বছর নিরন্তর ব্রাহ্মচর্য পালনে স্থিতিশীল থাকেন তাকেই থের বলে।[১৩] বুদ্ধের সময়কালীন ২৬৪ জন স্থবির তাদের অনন্য কৃতি স্বরূপ আজ ও সকলের মাঝে সমাদৃত হয়ে আছেন। তাঁরা তাঁদের কর্মবলে এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন যে, যা আজও সকল বিশ্ববাসীর কাছে সমাদৃত। থেরগণ সকলে বুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন অর্হৎ। 'অর্হৎ' শব্দের অর্থ হচ্ছে জাগতিক সকল কিছু থেকে তৃষ্ণা ক্ষয়কারী ভিক্ষু। তারা প্রত্যেকেই পরমসুখ নির্বাণ লাভ করেছেন। এই মুক্তি লাভকারী ভিক্ষুরা তাদের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা অতি চমৎকার ভাবে গীতিরসে পরিপূর্ণ করে ধরে রেখেছেন। তাদের সেই গাথা গুলোর সমাহারই হলো থেরগাথা।

থেরগাথায় ২১টি অধ্যায়ে ২৬৪ জন স্থবিরের ১৩৬০টি গাথা রয়েছে। মূলত গাথাগুলোর উপর ভিত্তি করে অধ্যায়গুলো সাজানো হয়েছে। থেরদের ধর্মজীবনের কথা তাদের জীবনের ব্যর্থতা ও সেই ব্যর্থতা থেকে উত্তরণ ও আনন্দের কথা নিয়ে তৈরি হয়েছে থেরগাথা।[১৪] নিম্নে কয়েকজন স্থবিরের জীবনী তুলে ধরা হলো। তারা কিভাবে তাদের জীবনকে সমৃদ্ধময় করেছেন, কিভাবে মহামতির সংস্পর্শে পূণ্য জীবন লাভ করে নির্বাণ লাভ করেছেন, তাদের জীবন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাসমূহ সহ তাঁদের কর্ম সম্পর্কে উল্লেখ করা হলো।

থেরগাথায় ২৬৪ জন স্থবিরের জীবন কাহিনি বর্ণিত আছে তন্মধ্যে বেলস্থি স্থবির অন্যতম। ইনি পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় ভগবানের ধর্মশ্রবণ করে প্রব্রজিত হন। কিন্তু পূর্বের কৃত কর্মের পূণ্যের অভাবে সিদ্ধিলাভ করতে পারলেন না। মরণান্তে তিনি দেব নরকূলে অনেক কুশল কর্ম সম্পাদন করেন। এরপর বেশ্বভূ বুদ্ধকে তিনি ৩১

কল্প পূর্বে দর্শন করে প্রসন্ন মনে মাতৃলুঙ্গা ফল দান করে পুনঃ গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি শ্রাবস্তীর এক ব্রাহ্মণ কূলে জন্মগ্রহণ করেন। মহামতি বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে তিনি উরুবিল্ব কাশ্যপের কাছে প্রবজ্যা নিয়ে অগ্নি পরিচর্যা করতেন। মহামতি উরুবিল্ব কাশ্যপকে দমন করে "আদিত্য পরিয়ায়' ধর্মোপদেশ করার সময় তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। তিনি ছিলেন আয়ুষ্মান আনন্দের উপাধ্যায়। তিনি তার অতি কুশল কর্মের ফলে অহত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভ করেন।[১৫]

থেরদের মধ্যে পূন্নমাস স্থবির অন্যতম, যিনি নিজ কর্মগুণে থেরোর মর্যাদা পেয়েছেন। তিনি বিপস্সী ভগবানের সময় চক্রবাক (হংস জাতীয় পাখি) রূপে জন্ম গ্রহণ করে। তিনি তার ঠোঁট দিয়ে শালপুষ্প আহরণ করে বুদ্ধকে পূজা করেছিলেন। সেই পূণ্যকর্ম প্রভাবে তিনি দেব নরকূলে জন্ম গ্রহন করে অনেক পূণ্যকর্ম সম্পাদন করেন। ১৭ কল্পপূর্বে ৮ বার চক্রবর্তী রাজ হয়ে অনেক পূণ্যার্জন করেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তী নগরে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে, বয়সপ্রাপ্ত হলে বিবাহ করেন। বিবাহ পরবর্তী পুত্র সন্তানও হয় তার। কিন্তু গৃহবাসে তার ঘৃণা উৎপন্ন হয়। তিনি বুদ্ধের কাছে যান ও প্রব্রজ্যা উপসম্পদা লাভ করেন। তার স্ত্রী পুত্র তাকে ফিরিয়ে নেবার জন্য গেলেও অতীত পূণ্যকর্ম প্রভাবে তিনি আসক্তিহীন মনে তাদেরকে তার মনের অনাসক্তভাব প্রদর্শন করেন। তিনি তার অতীত কর্মগুণে নিজে চিত্তকে সন্তুষ্ট, সংযত করে তৃষ্ণাকে দূরীকৃত করে থেরগণের মধ্যে একজন হতে পেরেছেন।[১৬]

উচ্চবংশে গঙ্গাতীরীয় স্থবিরের জীবনী দেখলে আমরা দেখি যে, তিনি পদুমুত্তর ভগবানের সময় তার জন্ম হয়। বুদ্ধের শাসনে প্রসন্ন হয়ে তিনি ভিক্ষুসংঘকে পানীয় দান করেন। এই দান জনিত পূণ্যকর্মের ফলে তিনি মহামতি গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীতে গৃহপতির পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। গৃহবাসে মনোযোগী থাকলেও তিনি ব্যভিচারে রত হন। কিন্তু এতে মহাপাপ হয় জেনে তিনি ব্যথিত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে খুব খারাপ ভাবে জীবন যাপন করতে লাগলেন। গঙ্গাতীরে তাল পাতায় নির্মিত শীর্ণ একটি বাসায় বাস করতে লাগলেন এর জন্য তার নাম হয় গঙ্গাতীরী স্থবির। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কার ও সাথে কথা বলবেন না। এই ভাবে তিনি এক বছর মৌনভাবে রইলেন। দ্বিতীয় বছর তিনি ভিক্ষার্থে এক রমনী তাকে বোবা কিনা পরীক্ষা করার জন্য তার ভিক্ষা পাত্রে প্রয়োজনের অধিক দুধ দিতে থাকলো। স্থবির হাতের ইশারায় তাকে দিতে না বলেন, তবুও দিচ্ছে বলে তিনি "নিষ্প্রয়োজন ভগিনী" বলে একটি মাত্র বাক্য ব্যয় করেন। তার কঠোর সাধনার ঐ বছরেই তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তিনি তার কঠোর কর্মের দ্বারা তার পাপী জীবন থেকে অর্হৎ জীবনে পদার্পন করেন। কর্মবলেই তিনি যের মর্যাদা পান।[১৭]

গৌতম স্থবির পূর্ব বুদ্ধগনের আর্শীবাদ গ্রহণ করে বিপস্সী বুদ্ধের সময় উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেন। এক সময়ে তিনি ভগবানকে আমোদ ফল দান করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি রাজগৃহে ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ

করেন । সাত বছরে তার উপনয়ন শেষ হয়। রত্ন ভিক্ষার সময় তিনি এক হাজার রত্ন প্রাপ্ত হন। তার যখন ১৬-১৭ বছর বয়স তখন তিনি কুসঙ্গে পরে বেশ্যাসক্ত হন এবং তাকে এক হাজার রত্ন দিয়ে ফেলেন। তিনি গণিকালয়ে এক রাত থেকে খুব অনুতপ্ত হন। একই সাথে ব্রহ্মচর্য বিনাশ ও তার রত্ন খোয়ানতে তিনি খুব মনোকষ্টে ভুগতে থাকেন। বুদ্ধ দিব্য তার পূর্বের কর্মের কারণ ও বর্তমান মনোকষ্টের কারণ অবগত হয়ে তাকে দেখা দিলে তখনই তিনি বুদ্ধের কাছে প্রব্রজিত হয়ে অর্হত্বফল লাভ করেন। তিনি তার গাথায় উপলব্ধিমূলক ভাবে বলেছেন, যেসব সংযতেন্দ্রিয় মুণিগণ স্ত্রীলোকের কারণে বা তাদের প্রতি আসক্ত হন না তারা সুখে থাকেন। তিনি সর্বশেষে কামকে বধ করে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করেন ও নির্বাণ প্রাপ্ত হোন। তিনি তার কর্মবলে, মহামতির আশীর্বাদে তার জীবনের ব্যর্থতা উত্তরণ করে নির্বাণ লাভী হতে পেরেছেন। তার জীবনের স্বার্থকতা সকলের জন্য দিক নির্দেশক হয়ে ও থাকে যে, সৎ চিন্তার মাধ্যমে ও চেষ্টার মাধ্যমে যে কোন দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব।[১৮]

অঙ্গুলিমাল স্থবির পূর্ব বুদ্ধগণের আশীর্বাদ নিয়ে অনেক কুশল কর্ম সম্পাদনের পর গৌতম বুদ্ধের সময়কালীন কোশলরাজ প্রসেনজিতের পুরোহিত ভগ্গব ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তার জন্ম গ্রহনের পর বিভিন্ন অশুভ লক্ষণ প্রদর্শিত হয় ও তার লক্ষণ বিচার করে দেখা যায় তিনি চোর হবেন। শিক্ষাপ্রাপ্তির সময়কালে তিনি গুরুগৃহে শিক্ষা গ্রহণ করতে যান। গুরুপত্নী তাকে স্নেহ করায় তার অন্যান্য সহপাঠীরা গুরুর কান ভারী করে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তখন গুরু তাকে হত্যা করার চিন্তা করলেন। কিন্তু অঙ্গুলিমালের শরীরে সাত হাতির সমপরিমাণ শক্তি ছিল। তাই তাকে সরাসরি হত্যা করা সম্ভব না বলে কৌশলে তাকে হত্যা করার জন্য তাকে গুরু দক্ষিণা স্বরূপ মানুষের এক হাজার আঙ্গুল দিতে বলেন। কারণ এর ফলে মানুষ জন তাকে হত্যা করবে তার নিষ্ঠুরতার জন্য। কিন্তু তিনি তার শরীরের বলে যখন মানুষ হত্যা করে আঙ্গুল সংগ্রহ করত। তার নাম হয় অঙ্গুলিমাল।

তার হত্যার খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল ও অঙ্গুলিমাল যে বনে বাস করতেন, সেই রাস্তা দিয়ে কেউ পথ পাড়ি দিতেন না। রাজা তাকে ধরে আনার জন্য সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তার তখন মাত্র একটি আঙ্গুলের প্রয়োজন ছিল। তার মা তাকে ফিরিয়ে আনার জন্য বনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। ভগবান বুদ্ধ দেখলেন, যদি তিনি আজ অঙ্গুলিমালের সামনে উপস্থিত না হন তাহলে অঙ্গুলিমাল তার মাতাকে হত্যা করে এক হাজার আঙ্গুল পূর্ণ করবে। মহাঅন্যায় বন্ধ করার জন্য তিনি অঙ্গুলিমালের সামনে উপস্থিত হন ঠিক তখন, যখন তার মাতা তার সামনে ও অঙ্গুলিমায় তার মাতাকে হত্যা করার জন্য অগ্রসর হয়েছে। গৌতম বুদ্ধকে দেখে অঙ্গুলিমাল মাতা হত্যার চিন্তা বাদ দিয়ে বুদ্ধকে যখন হত্যার জন্য অগ্রসর হন তখন বুদ্ধ এক অপূর্ব ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। তিনি এমন ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন যে, তিনি খুব ধীরে পথ চলছেন, কিন্তু অঙ্গুলিমাল সমস্ত শক্তি

প্রয়োগ করেও তাঁর কাছে যেতে পারছে না। তার সমস্ত শরীর ছুটতে ছুটতে অবসন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তখন তিনি বুদ্ধকে দাঁড়ানোর জন্য অনুরোধ করলেন। তখন ভগবান হাঁটতে হাঁটতে বললেন, অঙ্গুলিমাল আমি স্থিত আছি, তুমি দাঁড়াও। "এই বাক্যের মর্মার্থ না বুঝতে পেরে তিনি বুদ্ধকে এটার উত্তর জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে ভগবান বলেন, আমি সমস্ত প্রাণীদের প্রতি দণ্ডদান নিবারণ করে স্থিত আর আছি আর তুমি প্রাণীদের প্রতি অসংযম আচরণ করছ। সেই কারণে আমি পথ চললেও স্থিত আর তুমি দাঁড়িয়ে থাকলেও অস্থিত আছ।"এটির মর্মার্থ বুঝতে পেরে তার জ্ঞান চক্ষু উন্মিলীত হলো। তিনি মহামতির সাহচর্যে আসতে চাইলেন। মহামতি তার ভুল ক্ষমা করে দিয়ে পাত্র চীবয় যোগে প্রব্রজ্যা উপসম্পদা লাভ করেন। পরে ভাবনা বলে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে বিমুক্তি সুখ লাভ করেন।

যখন অঙ্গুলিমাল স্থবির পিণ্ডার্থে প্রবেশ করতেন নগরে, তখন নগরের অধিবাসীগণ তাকে ঢিল, দন্ড ছুড়তেন। তিনি খালিপাত্রে বিহারে প্রবেশ করলে, বুদ্ধ তাকে উপদেশ দিতেন সহ্য করার জন্য। কারণ তার পূর্বকর্মের দরুণ তাকে হাজার বছর পর্যন্ত নরক ভোগ করতে হত, অথচ তিনি সেই কর্মফল এই জন্মেই ভোগ করছে। অঙ্গুলিমাল স্থবির সমস্ত প্রাণীর প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ করতেন। এভাবে বুদ্ধের শাসনে, সমস্ত ভবতৃষ্ণা সমাপ্ত করে তিনি নির্বাণ সুখ লাভ করেন। তার কর্মই তাকে নির্বাণ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে।[১৯]এভাবে সুকর্মের ফল কোন না কোন জন্মে প্রতিফলিত হবেই।

যে সকল থেরগণ তাঁদের কর্মের মাধ্যমে আরও অনেক মানুষকে স্বধর্মে প্রব্রজিত করেছেন তাদের মধ্যে অধিমুক্ত স্থবির অন্যতম। তার বয়স হলে তিনি তার মামার কাছেই প্রব্রজিত হোন। শ্রামণ অবস্থাতেই অর্হৎ হয়ে এক সময় উপসম্পদার অনুমতি গ্রহনের জন্য তার মাতার কাছে যাচ্ছিলেন, তখন যাত্রাপথে পাঁচশত চোরের সাথে দেখা হয়। চোরেরা দেব পূজার জন্য নরবলি দেবার জন্য মানুষ খুঁজছিলেন। পথে স্থবিরকে দেখে তাকে বলি দেবে। কিন্তু স্থবির কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। দলপতি তার নির্ভিক ভাব দেখে নির্ভিক ভাবের কারণ জানতে চাইলেন। অধিমুক্ত স্থবির বললেন, যার কোন তৃষ্ণা নেই, তার কোনো দুঃখ ভয় থাকে না। মরণ চিন্তা থাকে না। আমার ব্রহ্মচর্য আচরণ করা হয়েছে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ পালন করা হয়েছে। অর্হৎরা মরণ ভয়, মরণ শোক প্রাপ্ত হয় না। স্থবিরের এই কথাগুরো শুনে চোরেরা তাদের অস্ত্র পরিত্যাগ করল। তারা অধিমুক্ত স্থবিরের আচার্যের নাম জানতে চাইলে তিনি মহামতি বুদ্ধের কথা বলেন ও বুদ্ধ শাসনে তার এই অবস্থার কথা বলেন। চোরেরা এই কথা শুনে চুরিকর্ম থেকে দূরে সরে গেল এবং চোরগণ সুগত শাসনে প্রব্রজিত হয়ে প্রাণপণে বোধ্যঙ্গ ভাবনা করতে লাগল। সর্বহৃষ্ট তুষ্টচিত্ত ও ভাবিত ইন্দ্রিয় হয়ে অসঙ্খত নির্বাণপদ লাভ করেন। শ্রামন তাঁদের সেখানে রেখে মাতার কাছে গিয়ে তাঁর থেকে অনুমতি

নিয়ে সকলকে নিয়ে উপাধ্যায়ের কাছে গেলেন। সেখানে তাঁরা প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা লাভ করলেন। তারা সমাধি ধ্যানের মাধ্যমে খুব দ্রুতই অর্হত্ত্ব ফল লাভ করলেন।[২০]

এভাবে ২৬৪ জন স্থবির তাদের দ্বারা আজ থেরোর মর্যাদা পেয়েছে প্রত্যেকের ঘটনাই যদি আমরা পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে দেখব যে, দশবিধ কুশল কর্ম, সহ নানাবিধ কুশল কর্মের ফলশ্রুতিতে তারা আজ চিরস্মরণীয়। তারা প্রত্যেকে তাদের পূর্বজন্মের কুশল কর্মের ফলে মহামতির সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন ও আবার বুদ্ধ শাসনে কুশল কর্ম সম্পাদন করেই তার চির নির্বাণগামী হয়েছেন। আমাদের উচিত থেরগাথা অধ্যায়ন করে তাদের জীবনের কর্মকে অনুসরণ করা, সঠিক ও কুশল কর্ম সম্পাদন করা। তাহলেই একমাত্র এই ভব দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে নির্বাণ মুখী হওয়া সম্ভব।

থেরীগাথায় বর্ণিত কর্মবাদ ও এর প্রয়োগিক ব্যবহার

গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর বিমাতা প্রজাপতি গৌতমীর হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত হয় ভিক্ষুণী সংঘ। তাঁর পিতা রাজা শুদ্ধোধনের মৃত্যুর পর বিমাতা প্রজাপতি গৌতমী সংসার ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তৎকালীন সময়ে তাঁর সাথে আরো কপিলাবস্তুর পাঁচশত সম্ভ্রান্ত পরিবারের পত্নীও সংসার ত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করলে, তারা মাতা গৌতমীর সাথে বুদ্ধের কাছে যান এবং বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য আনন্দের সহায়তায় সংসার ত্যাগের মাধ্যমে সংযুক্ত হন এবং ভিক্ষুনী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের অনুসরণ পূর্বক অনেক নারী সন্তান শোক অপনোদনের জন্য, কেউ কেউ ধনী পরিবার ত্যাগ করে, কেউ সংসারের কঠোর পরিশ্রম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য, কেউ নর্তকী, গণিকা থেকেও পরিবর্তীতে ভিক্ষুনী সংঘে যোগদান করেন। কালক্রমে তাদের কর্মের মাধ্যমে বা পূর্ববর্তী জীবনের সুকর্মের মাধ্যমে কঠোর শ্রম স্বীকার করে অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হন। সাধনা কালে উন্নতি লাভের সময় তাদের মুখ নিঃসৃত গীতিগুলিই সংগৃহীত হয়ে থেরীগাথা নামে পরিচিতি পায়। থেরীগাথা হলো একটি বৌদ্ধ গ্রন্থ তৎকালীন আলোকিত নারীদের সংক্ষিপ্ত কবিতার সংকলন।[২১] থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্মে, থেরীগাথা হলো আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাকে চিত্রিত করার প্রাথমিকতম পাঠ।[২২] থেরীগাথায় ১৬টি অধ্যায়ে মোট ৭৩ জন থেরীর জীবনী ও গীতি তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে কয়েকজন বিশিষ্ট থেরীর জীবনী তুলে ধরা হলো। তাদের জীবনের সমৃদ্ধময় অংশ ও কিভাবে তারা তাদের কর্মের দ্বারা তাদের জীবনকে আলোকিত করেছেন তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ভিক্ষুণী অর্ধকাশী বুদ্ধ কাশ্যপের আবির্ভাব কালে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করে ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করে শীল পালনে তৎপর ছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বয়োবৃদ্ধ অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত এক ভিক্ষুণীকে বেশ্যা বলে অভিহিত করায় তিনি সেই জন্মে নরকবাস করেন। গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও পূর্ব জন্মের কুকর্মের কুফলের কারণে তাকে গণিকাবৃত্তির পথ অবলম্বন করতে হয়। তিনি ভিক্ষুণী সংঘের কথা শুনে তিনি ভগবান বুদ্ধের কাছে অভিষেক নেওয়ার কামনা করেন। কিন্তু তৎকালীণ বারানসীর

বারনারীগণ তাকে বাঁধা দেওয়ায় তিনি বার্তবহ প্রেরণ করে বুদ্ধের মন্ত্রনা জিজ্ঞাসা করেন। মহামতি তাকে বার্তাবহ দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার অনুমতি দান করেন। যেহেতু পূর্বজন্মে সেই ভিক্ষুণীকে বেশ্যা বলার পূর্বে তার কর্মগুলো সুকর্মই ছিল। অভিষিক্ত হওয়ার পর তিনি কঠোর অন্তদৃষ্টির অনুশীলন করে অনতিবিলম্বে অর্হত্ত্ব লাভ করেন। ধর্মের পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারিণী হলেন। তিনি তার ভুল শোধনের মাধ্যমে, সুফল কর্মের ফল ইহজীবনেই পেলেন।[২৩]

কৃশা গৌতমী পদুমুত্তর বুদ্ধের সময় হংসবতী নগরীতে সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন ভগবানের ধর্মোপদেশ দানকালে এক অমসৃন বস্ত্র পরিহিত ভিক্ষুণীকে সর্বোচ্চ স্থান দান করতে দেখলেন। তার মনেও সেই সর্বোচ্চ স্থান পাওয়ার সংকল্প করেন। গৌতমবুদ্ধের সময়কালীন তিনি শ্রাবস্তীতে এক দরিদ্র ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। তার নাম ছিল গৌতমী। তার দেহকৃশ বা রোগা হওয়ায় তার নাম হয়েছিল কৃশা গৌতমী। তার বিবাহের পর তার পুত্র সন্তানের জন্ম হলো। কিন্তু পুত্র একটু বড় হলেই তার মৃত্যু হলো। তিনি শোকে প্রায় উন্মাদিনী হয়ে প্রত্যেকের ঘরে সন্তানের জন্য ওষুধ চাইতে থাকলো। সবাই তাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলো।

অবশেষে একজনের পরামর্শে তিনি বুদ্ধের কাছে যান। তিনি বুদ্ধের কাছে ওষুধ চাইলেন। তখন তিনি কৃশা গৌতমীর পূর্বজন্মের কুশল কর্মের দর্শন করে ও তার উচ্চতর জীবনের যোগ্যতা উপলব্ধি করে তাকে বললেন, এমন কোনো ঘর থেকে একটি শর্ষে বীজ নিয়ে আসতে যে ঘরে এখন পর্যন্ত কোন মানুষের মৃত্যু হয় নি। তিনি এরপর প্রতি ঘরে গিয়ে কারো মৃত্যু হয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করে ও বীজ ভিক্ষা চায়। কিন্তু প্রত্যেক ঘরেই উত্তর মিলে যে, "এখানে কত মৃত্যু হয়েছে, তার হিসাব নেই।" তিনি বুঝতে পারলেন পৃথিবীর কেউই এই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাবেনা। তিনি এই অনিত্য দর্শন উপলব্ধি করে বুদ্ধের কাছে যান। বুদ্ধ তাকে সর্ষের বীজ পেয়েছে কিনা জিজ্ঞাসা করল। তিনি সর্ষের বীজ পাননি এবং প্রয়োজন নেই বলে তার কাছে দীক্ষা চাইলেন। মহামতি তাকে প্রত্যেক মানুষের মৃত্যুর স্বরূপ বুঝিয়ে দিলেন। কৃশা গৌতমী অভিষেক গ্রহণ করে দ্রুতই অন্তদৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হলেন। তিনি তার কর্মের দ্বারা ও ভিক্ষুনী জীবন কঠোর ভাবে পালন করে অমসৃন বস্ত্র পরিধানকারিণী ভিক্ষুণীদের মধ্যে সর্বোচ্চ আসন লাভ করেন। তার কর্মের মাধ্যমেই, যথাযথ নিয়ম পালনের মাধ্যমে ও পূর্বজীবনের সুকর্মের ফলেই তিনি শ্রেষ্ঠ অমসৃণ বস্ত্র পরিধানকারিণী সম্মান লাভ করেন। সুতরাং, বলা যায়, সুকর্মের চিন্তা বা সুকর্ম শুধু বর্তমান জীবনেই নয়, পরবর্তী জীবনেও তার সুফল প্রদান করতে পারে।[২৪]

বিমলা ভিক্ষুণী বহু জন্মগ্রহণ করে গৌতম বুদ্ধের সময় বৈশালী নগরে এক গণিকার মেয়ে হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তার বয়স প্রাপ্ত হলে, তিনি ও তার মায়ের মতই গণিকাবৃত্তি অবলম্বন করছিলেন। একদিন তিনি যখন তার ঘরের সামনে দাড়িয়ে ছিলেন, তখন মহামৌদ্গল্যায়ণ ভিক্ষার্থে বেড়িয়েছিলেন। বিমলা মৌদগল্যায়ণকে

দেখে তার প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন। তার বাসস্থানে গিয়ে তাকে তার দেহায়বরের সৌন্দর্য্য দেখিয়ে তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই কথাও প্রচলিত আছে যে, বিরুদ্ধ সম্প্রদায় কর্তৃক প্ররোচিত হয়ে তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেন। ভিক্ষু তার অসংযত আচরণ দেখে তাকে তার কর্মের জন্য তাকে ভর্ৎসনা করেন এবং পরে তাকে উপদেশ দেন। ভিক্ষুর উপদেশে বিমলা অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়ে শ্রদ্ধা সহকারে সংঘ বর্হিভূত শিষ্য শ্রেণিভূক্ত হন। পরবর্তীকালে তিনি সংঘে প্রবেশ করেন এবং তার কর্ম, শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে দ্রুত অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেন। এই ঘটনায় এটি প্রমাণিত হয় যে, "জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো"। তিনি তার কঠোর অনুশীলন ও কর্মের মাধ্যমেই উক্ত আসনে আসীন হয়েছেন। বুদ্ধ তার অতীত দেখেননি, তিনি দেখেছেন তার অভিষেক পরবর্তী কর্ম। তাই তিনি এই উচ্চ আসন লাভ করেছেন।[২৫]

ভিক্ষুণী সুমনা অতীত বুদ্ধগণের সময় অনেক কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে জন্ম জন্মান্তরে পূণ্য অর্জন করে গৌতম বুদ্ধের সময় কালীন শ্রাবন্তী নগরে কোশল রাজের বোন হয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। একদিন মহামতি যখন কোশল রাজা প্রসেনজিৎকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন তখন সুমনা তা শুনে ধর্মে বিশ্বাসবতী হয়ে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিলেন ও শীল গ্রহণ করলেন। সংসারের প্রতি অনাসক্তি জন্মালেও তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন না, কারণ পিতামহীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তার সেবা করার জন্য মনস্থ করেছিলেন। পিতামহীর মৃত্যুর পর তিনি কোশল রাজ সহ বিহারে সংঘকে বস্ত্র উপহার দিলেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে তিনি অভিষেকের প্রার্থনা করলেন বুদ্ধ তার জ্ঞানের পূর্ণতা উপলব্ধি করে তাকে সংঘভুক্ত করলেন। তিনি দ্রুতই অর্হত্ত্বফল লাভ করলেন। আমরা এই ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে দেখি যে, তিনি তার সম্পদের অপেক্ষা অর্হত্ত্ব প্রাপ্তিকে উত্তম মনে করেছেন। তারপর যথাযথ কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি জাগতিক মায়ায় বশীভূত থাকলে, সম্পদের মায়ায় থাকলে এই অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি কোনদিনই সম্ভব হত না। তিনি কোনদিনই নির্বাণ শান্তি লাভ করতে পারতেন না। তার অতীত ও বর্তমান জীবনের কুশল কর্মই তাকে এই শান্তি প্রদান করেছে।[২৬]

ভিক্ষুণী চন্দ্রা গৌতম বুদ্ধের সময় অজ্ঞাতনামা এক ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবেই পিতা মাতা মারা যায় ও আত্মীয়-স্বজন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ায় নিজের ভরণ পোষেণে অক্ষম হয়ে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতে লাগলেন। একদিন তিনি পটাচারার কাছে গেলেন। পটাচারা কিছুক্ষণ আগেই মাত্র তার খাবার খাওয়া শেষ করেছেন। কিন্তু চন্দ্রা ছিলেন তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্ত। অন্যান্য ভিক্ষুণীগণ দুর্দশাগ্রস্থ ক্ষুধার্ত চন্দ্রাকে দেখে তার প্রতি দয়া মনোভাব পোষণ করে তাদের অবশিষ্ট খাদ্য তাকে খাবার জন্য দিলেন। সেই খাদ্যেই তার ক্ষুধা মিটল। ভিক্ষুণীগণের অনুগ্রহে যখন নিরতা থেরী উপদেশ মূলক বক্তব্য প্রদান করছিলেন সেই নিরতা থেরীকে সম্মান প্রদর্শন করে তার এক পাশে বসলেন। তিনি মন দিয়ে উক্ত উপদেশ মূলক বাণী শ্রবণ করে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষুণী সংঘে যোগদান করেন। অধ্যাবসায়ের

সাথে থেরীর উপদেশ পালন করে দ্রুতই অন্তদৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তিনি তার কঠোর অধ্যবসায়ের ফলে অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হলেন। সমস্ত তৃষ্ণা ত্যাগ করে নির্বাণগামী হওয়ার পথ খুঁজে পেলেন। এই ঘটনায় দেখা যায় যে, তৎকালীণ ভিক্ষুণী সংঘ ধনী, গরীব নির্বিশেষে সকল প্রকার নারীর জন্য খোলা ছিল। এখানে এই ঘটনা দেখা যায় যে, সঠিকভাবে কুশল কর্ম সম্পাদন করলে যে কোন অবস্থা থেকে উচ্চাসনে অবস্থান করা সম্ভব।[২৭]
সমাজের সকল শ্রেণির নারীদের মিলনস্থল হয়েছিল তৎকালীন ভিক্ষুণীসংঘ। সংসারত্যাগী, দুঃখ-দুর্দশা পর্যবসিত সকল শ্রেণি পর্যায়ের থেরীগণ তাদের কুশল কর্মের ফলস্বরূপ মহামতি গৌতম বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে যে পরম শান্তি পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন, তাদের গাথাগুলো তারই বহিঃপ্রকাশ। সঠিক পথে কুশল কর্ম করে তার ফলস্বরূপ মহামতি গৌতম বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে যে পরম শান্তি পেয়ে আনন্দিত হয়েছিলেন, তাদের গাথাগুলো তারই বহিঃপ্রকাশ। সঠিক পথে কুশল কর্ম করে তার ফল স্বরূপ যে, উচ্চাসন তারা পেয়েছেন তাদের উপদেশ মূলক গাথাগুলির অর্থ আস্বাদন করে সকলের উচিত সেই পথ অনুসরণ করা।

প্রেতকাহিনিতে বর্ণিত কর্মবাদ ও এর প্রয়োগিক ব্যবহার

প্রেতবত্থু সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দক নিকায়ের সপ্তম গ্রন্থ। প্রেতবত্থু তথা এতে লিখিত ঘটনাগুলো হচ্ছে কর্মবাদ প্রচার করা। এখানে মোট ৪টি বর্গে ৫১টি প্রেত কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে। কর্মবাদ প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা প্রেতবত্থুর মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্মবাদের মূল কথা হচ্ছে মানুষ তার নিজের কৃতকর্মের দ্বারা পরিচালিত হয়। কর্মের ফল কেউ এড়াতে পারে না। যে যেমন কর্ম করবে তার ফল ও সে তেমনি পাবে। সুকর্মের ফল স্বরূপ যেমন সে উচ্চস্থানে আসীন হবে, তেমনি দুষ্কর্মের ফলস্বরূপ সে তার শাস্তি বর্তমান জীবন অথবা পরজন্মে পাবেই। এমন কোন স্থান নির্মিত হয়নি যেখানে গিয়ে সে তার পাপ কর্মের শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। আমাদের জন্ম, মৃত্যু, সৌভাগ্য, দুর্ভাগ্য, সুখ, দুঃখ সবকিছুই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এই কর্মের মাধ্যমে। মানুষ যেমন কুশল কর্মের মাধ্যমে এক সময় নির্বাণ প্রসাদ লাভ করে, তেমনি দুষ্কর্মের ফল স্বরূপ তার জন্ম হয় চারি অপায়ে।

চারি অপায়ের মধ্যে মারাত্মক একটি দুঃখ ভোগের স্থান হচ্ছে প্রেতলোক। বিভিন্ন ধরনের প্রেতলোক এর মধ্যে রয়েছে। যেমন-ঋতুজীবী প্রেত, ক্ষুৎপিপাসিক প্রেত, নিজ্ঝামতৃষ্ণিক প্রেত, কালকঞ্চিক অসুর প্রেত, পাংশুপিশাচ প্রেত, মিথ্যাশপথকারী প্রেত, বৈমানিক প্রেত, মাংসপেশী প্রেত, অস্থিপঞ্জর প্রেত, মাংসপিন্ডাকৃতি প্রেত, অসিলোম প্রেত, শক্তিলোম প্রেত, শরলোম প্রেত, সূচীলোম প্রেত, চর্মহীন প্রেত, কুড়ার প্রেত, বিষ্ঠাকুন্ড প্রেত, চর্মবিহীনা প্রেত, বিরূপ দুর্গন্ধ যুক্ত প্রেত, প্রজ্জ্বলিত প্রেত, শিরাবিহীন প্রেত, নিজ সন্তান ভক্ষণকারী প্রেত ইত্যাদি।[২৮]

যারা তাদের জীবনধারণন কৃপণতা করে, লোভী জীবন যাপনে অভ্যস্ত, অপরের প্রতি হিংসা করে, নিজে কুশল কর্ম করে না এবং অপরকে ও নিরুৎসাহিত করে, বুদ্ধ ভিক্ষুদের দানীয় বস্তু আত্মসাৎ করে, কোন ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করতে উৎসাহী হলে তাকে বাধা প্রদান করে, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা পালনে যার অনুৎসাহী, পরশ্রীকাতর তারাই মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়।

প্রেতলোকে শত সহস্র বছর পর্যন্ত কিংবা এক বুদ্ধান্তর কল্পকাল পর্যন্ত একবিন্দু জলের অভাবে প্রেতরা দুঃখ ভোগ করে। ক্ষুধা পিপাসায় জর্জরিত হয়ে রক্ত মাংস শুকিয়ে যায়। তাদের দেহ কঙ্কালময় হয়ে উঠে যা দেখলে যে কেউ আতকে উঠে। শরীরে ফাটল ধরে। দেহের অভ্যন্তরের শিরা-উপশিরা বাইরে বের হয়ে আসে। এদের দেহ থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ আসে। পূর্বজন্মের পাপ কর্মের জন্য তারা প্রতিনিয়ত অনুতাপে পুড়তে থাকে। কোন প্রকার জল ও খাদ্যদ্রব্য নেই সেখানে। তারা জল ও খাবারের জন্য আর্তচিৎকার করতে থাকে। এরূপ নানা রকম দুঃখ দুর্শশায় তাদের জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। যা বলে বর্ণনা করা সম্ভব হবে না।[২৯]

প্রেতলোক থেকে মুক্তির জন্য করণীয় কর্ম সম্পর্কে ও মহামতি গৌতমবুদ্ধ তিরোকুন্ড সূত্রে উল্লেখ করেছেন। মহামতি বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পর ঋষিপতনমৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করে বর্ষাবাসের পর রাজগৃহে যান। তখন সমস্ত পরিষদসহ মহারাজ বিম্বিসারকে দীক্ষিত করেন। দীক্ষিত হওয়ার পর মহারাজ ভিক্ষু সংঘকে মহাদান প্রদান করেন। সেই রাত্রিতে বিম্বিসার বিভিন্ন রকম বিচিত্র শব্দ শুনতে পান, যে শব্দের অস্তিত্ব এই জগতে নেই। বিম্বিসার এই শব্দে ভীত হোন ও রাত্রিতে ঘুমাতে পারেন না। তিনি তার পরদিন সকালেই বুদ্ধের কাছে গিয়ে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বুদ্ধ তাকে জানান, তার পূর্ব আত্মীয়গণ সংঘের সম্পত্তি ভোগ করার মত অকুশল কর্ম করে মৃত্যুর পরবর্তী দীর্ঘদিন যাবৎ প্রেত যোনীতে অবস্থান করেছেন। তারা মনে করেছিল এই বার আপনি সংঘকে দান করে যে পূণ্যরাশি অর্জন করেছে তা থেকে তাদেরকে পূণ্যরাশি দান করবেন। কিন্তু আপনি তা করেন নি বিধায় তারা সেই শব্দের মাধ্যমে আপনাকে ভয় দেখিয়েছেন।[৩০]

পরিত্রাণের অংশ হিসিবে আপনার সঞ্চিত পূণ্য রাশি থেকে তাদেরকে দান করুন। কারণ, প্রেত যোনীতে উৎপন্ন আত্মীয়গণ প্রাচীরের ধারে, ঘরের কোণে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। আশে পাশে অনেক খাদ্যদ্রব্য পানীয় থাকলেও তাদের কেউ স্মরণ করে না। এজন্য কৃতজ্ঞ মানুষদের যথাসময়ে মৃত ব্যক্তিগণের অনুকম্পার কথা স্মরণ করে তাদের উদ্দেশ্যে ভালো খাদ্য পোশাক, পানীয় প্রদান করা উচিত। তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পূণ্যকর্ম তাদের বিভিন্ন উপকার করে। মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে অযথা কান্না, শোক, হা-হুতাশ তাদের কোন উপকারে আসে না। মৃত আত্মীয়দের উপকার করার জন্য সংঘকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, সেখানে দানের মাধ্যমে পূণ্য সঞ্চয় করে তার পূণ্যাংশ দান করা ব্যতীত বিভিন্ন কোনো পথ নেই।

অতঃপর মহারাজ বিম্বিসার ভিক্ষু সংঘকে পুনরায় মহাদান প্রদান করে "আমার সঞ্চিত পূণ্যরাশি আমার জ্ঞাতিগণ প্রাপ্ত হোক" বলে আত্মীয়দেরকে পূণ্য রাশি দান করলেন। তখন বিম্বসারের আত্মীয়গণ সেই প্রেতযোনীতে খাদ্য, পানীয়, পোশাক ও দিব্যদেহ লাভ করল। এই দানকে অনুমোদন করতে গিয়ে মহামতি "তিরোকুন্ড সূত্র" দেশনা করেছিলেন।[৩১]

বিমাবত্থুতে বর্ণিত কর্মবাদ ও এর প্রায়োগিক ব্যবহার

বিমানবত্থু খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত ষষ্ঠ গ্রন্থ। কর্মবাদ তথা কুশল কর্মের ফলাফল সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে পুরুষ ও স্ত্রী বিমান আলাদা ভাবে ৭টি বর্গে বিভক্ত হয়েছে। স্ত্রী বিমান চার প্রকার যথাঃ ১. পীঠ বর্গ ২. চিত্তলতা বর্গ ৩. পারিজাত বর্গ ৪. মঞ্জিষ্ঠাবর্গ। মোট ৫০ টি কাহিনি এই চারটি বর্গে রয়েছে। পুরুষ বিমান ১. মহাবর্গ ২. পায়াসি বর্গ ৩. গুনিক্ষিপ্ত বর্গ । এই তিন বর্গে মোট ৩৫টি কাহিনি রয়েছে।

কুশল ও অকুশল ভেদে কর্ম দুই প্রকার। অকুশল কর্মের ফল স্বরূপ যেমন দুঃখ প্রাপ্তি সুনিশ্চিত। বর্তমান জন্ম, পরজন্ম, যে কোনো জন্মে বা উভয় জন্মেই তার দুষ্কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। অকুশল কর্মের ফলাফল স্বরূপ আপাত দৃষ্টিতে লাভবান মনে হলেও তার ফলাফল অতি ভয়ংকর। তেমনি কুশল কর্মের ফল, যা সে বর্তমান জীবন লাভ করেনি, মৃত্যুর পরবর্তীতে তা কিভাবে তাকে ফলদান করলো। এটি বিমান বত্থুর মূল আলোচিত বিষয়। এই ঘটনাগুলো তুলে ধরার কাজটি করানো হয়েছে অধিকাংশ সময় ঋদ্ধিশক্তিতে শ্রেষ্ঠত্বপ্রাপ্ত বুদ্ধশিষ্য মহামোঙ্গলায়ন এবং স্বয়ং বুদ্ধের মাধ্যমে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বুদ্ধ কোনো সময় একাকী গৃধকুট পর্বত থেকে নামার সময় দেখলেন দিব্যবিমানে করে এক দেবপুত্র যাচ্ছে। দেবপুত্র মহামতিকে দেখে তাকে প্রণাম করার জন্য তার কাছে আসলে, বুদ্ধ তাকে এই দিব্য স্বর্গীয় অবস্থা প্রাপ্তির কারণ জানতে চাইলো। দেবপুত্র যা বললেন, সে বর্ণনাই বুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জনগণের উপকারের জন্য বর্ণনা করলেন জনসমাজে। এমনকি সেই দেবপুত্রকে উপস্থিত করিয়ে তারই মুখে এই বৃত্তান্ত ব্যক্ত করালেন। এই রকম আরও অনেক কাহিনি উপস্থাপিত হয়ে মৌদগলায়নের মাধ্যমে।[৩২]

গ্রন্থটিতে বৌদ্ধ কর্মবাদ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি কাহিনির বর্ণনাতে রয়েছে যথেষ্ট সাবলীলতা ও কর্মবাদ সম্পর্কে চিন্তা করতে বাধ্য করা। খুব সহজ সরল ভাষায় ও উপমায় রচিত এই গল্পগুলো পাঠের মাধ্যমে কর্মবাদের একেবারে গভীরে প্রবেশ করা সম্ভব। কর্মের অচিন্তনীয় রহস্য উদঘাটনের ব্যাখ্যা রয়েছে এই বিমান বত্থু গ্রন্থে।

এই বিমানবত্থু গ্রন্থে যে সমস্ত ব্যক্তি বর্তমান জীবনে সৎকর্ম করে মৃত্যুর পর স্বর্গে উৎপন্ন হয়ে অসাধারণ সুন্দর দেববিমান যা দিব্য প্রাসাদ লাভ করেছেন তার বর্ণনা আছে। সুফল ও সৎকর্মের মাধ্যমে মানুষ কিভাবে সুখ

ভোগ করে তার চমৎকার বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়েছে বিমানবত্থু গ্রন্থে। মানুষ সৎকর্ম ব্যতীত বর্তমান ও পরজন্ম কোনটিতেই সুখী হতে পারে না। সৎকর্মের সম্পাদনকৃত ব্যক্তির সুনাম মানুষ দেবতা সকলের মাঝে বিরাজ করে। কীর্তিমান ব্যক্তি যেমন বর্তমান জন্মে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হন, তেমনি মৃত্যুর পর তার স্থান হয় স্বর্গে। যেখানে সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছেদ, গন্ধ, রস, খাদ্যাহার, ভোগবিলাসে, মহাসুখে থাকে।[৩৩]

প্রথম পীঠ বিমান বর্ণনায় আমরা দেখি যে, ভগবানবুদ্ধ শ্রাবস্তীতে কোশলরাজ প্রসেনজিতের মহাদান অনুষ্ঠানের সময় বলেছিলেন, যদি কোন ব্যক্তি খুশি মনে একমুঠো পরিমাণ চালের গুড়ো, ছেড়া কাপড়ের টুকরা, ঘাস ও পাতার তৈরি তোষক, পঁচা হরিতকিও যদি দান করে তাহলে সেই ব্যক্তির দান হবে মহাফলদায়ক, অতিশোভাময় ও সুমহান। এই ভাবে এক শ্রদ্ধাবতী কন্যা এক স্থবিরকে দেখে তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি সহকারে সামর্থ্য অনুযায়ী আসনদান ও ভোজন দান করেন। এর ফলশ্রুতিতে জীবনাবসানে তিনি তারতিংস স্বর্গে স্বর্ণ বিমানে উৎপন্ন হন।[৩৪]

ভাতের মাড় দায়িকা বিমান কাহিনিতে আমরা দেখতে পাই, গৌতম বুদ্ধ যখন রাজগৃহের বেনুবণ কলন্দক নিবাপে বাস করছিলেন তখন কোনো এক পরিবারে সংক্রামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সেই বাড়ির অনাথিনী হয়ে অন্যের বাড়ির পিছনে বারান্দায় থাকত। সেই বাড়ির লোকজন তার প্রতি দয়া দেখিয়ে সাগু, ভাত, ভাতের মাড় ইত্যাদি তাকে খেতে দিত। তিনি তা খেয়েই কোন রকমে জীবন ধারণ করছিলেন। সেই সময় মহাকশ্যপ স্থবির সাত দিনের নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান শেষ করে সেই মহিলার দুঃখ দুর্দশা নিরোধের জন্য তার কাছে ভিক্ষার জন্য গেলেন। শুধু মাত্র ভাতের মাড় থাকার কারণে প্রথমে তিনি তা স্থবিরকে দিতে অস্বীকার করেন। আবার এক পা পিছনে গিয়ে তিনি আবার সেই মহিলার কাছে ভিক্ষা চাইলেন। অতঃপর মহিলাটি বুঝতে পারল যে, স্থবির তাকে পরিত্রাণের নিমিত্তে এসেছে। তিনি তার ভাতের মাড় অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে স্থবিরকে দান করলেন। স্থবির সেই দান গ্রহণ করে তার সামনেই সম্পূর্ণ ভাতের মাড় পান করলেন। সেই দিনই রাত্রির প্রথম ভাগে তার মৃত্যু হলো ও তার স্থান হলো স্বর্গে। তার এই সামান্য দান কর্মের ফলস্বরূপ তিনি এই স্থানে যেতে পেরেছেন।[৩৫]

আমরা প্রতিটি ঘটনার কর্মবাদের সুফল দিকগুলো দেখতে পাচ্ছি। কুশল কর্মের সুফল গুলো হচ্ছে কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমেই। এক সময় ভগবান শ্রাবস্তীর জাতবন বিহারে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় এক উপাসক অচিরাবতী নদীতে স্নান শেষে ভগবান বুদ্ধকে শ্রাবস্তীতে ভিক্ষা করতে যেতে দেখে তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে কেউ নিমন্ত্রন করেছেন কিনা? ভগবান নিরব থাকলে সেই উপাসক বুঝতে পারেন যে আজ তিনি কোনো নিমন্ত্রন পাননি। তিমি মহামতিকে তার বাসায় নিমন্ত্রন জানালেন। মহামতি মৌন সম্মতি জ্ঞাপন করলে উপাসক মহামতিকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তাকে উপযুক্ত আসনে বসিয়ে খাদ্য দ্রব্য

ভোজন করালেন। ভোজন শেষ হলে মহামতি দানের ফল বর্ণনা করে সেখান থেকে বিদায় নিলেন। তার এই যথাদানের জন্য মৃত্যুর পর তার স্থান হলো তাবতিংস স্বর্গে। তিনি মৃত্যুর পরবর্তীতে তার কর্মের যথোপযুক্ত ফল পেলেন।[৩৬]

উপরের ঘটনাসহ বিমানবত্থুতে সবগুলো ঘটনাই তাদের পূণ্যকর্মের ফলাফল যা ঋদ্ধিশ্রেষ্ঠ আয়ুষ্মান মহামৌদ্গলায়ন ও স্বয়ং মহামতি বুদ্ধ জগতের সকলের উন্নতি কল্পে সেই দেব-দেবীকে নিঁখুতভাবে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে তাদের মুখ থেকে কৌশলে বের করে এনেছেন তাদের কৃত পূণ্য কর্মের তথ্য। এই তথ্যের মাধ্যমে সমাজ তথা সর্বস্তরের মানুষ জানতে পেরেছে কীভাবে কোন পূণ্য কর্মের মাধ্যমে স্বর্গ লাভ করে মহাসুখ ভোগ করা যায়। বিমানবত্থু গ্রন্থে খুব সুনিপুনভাবে কর্মবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তাই আমাদের সকলের উচিত কুশল কর্ম পরিহার করে কুশল কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করা।

ধর্মপদে বর্ণিত কর্মবাদের ধারণা

গৌতম বুদ্ধ তাঁর বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে মহাপরিনির্বাণের পূর্ব পর্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণি পেশার মানুষের উন্নতি সাধনের জন্য যে অমৃতময়বাণী বলেছিলেন তারই সংক্ষিপ্ত সংগ্রহ হচ্ছে 'ধর্মপদ'। ধর্মপদ কবিতাকারে লিখিত গৌতম বুদ্ধের বাণীর একটি সংকলন গ্রন্থ। তিনি বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন উপদেশাবলী দিয়েছেন। মহামতি এমন ভাবে মানুষের মাঝে উপদেশ গুলো দিয়েছিলেন যাতে সংসার জীবন সহজাগতিক সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব। এই উপদেশ গুলি কবিতাকারে স্থান, পেয়েছে ধর্মপদে। ধর্মপদ হচ্ছে পবিত্র ত্রিপিটকের খুদ্দক নিকায়ের অর্ন্তগত একটি অংশ। এটি সর্বাধিক পঠিত ও পরিচিত ধর্মগ্রন্থ।[৩৭]

বুদ্ধের বাণীকে তাঁর জটিল গঠন ভঙ্গিমা, তত্ত্ব কথা, কাব্যিক ভঙ্গি ও আকারগত বিশালতাকে পরিহার করে সংক্ষিপ্ত ও স্বচ্ছ কাব্য ভাষায় প্রকাশ করে ধর্মপদ বুদ্ধের বাণীকে সকলের কাছে পৌছে দিয়েছে। ভারত বর্ষের প্রাচীন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মাঝে বুদ্ধের মূল বাণীকে সহজলভ্য করে তোলার জন্য খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এই গ্রন্থ সংকলিত হয়েছে। ধর্মপদে মোট ২৬টি বর্গে ৪২৩টি গাথা রয়েছে। এই ২৬টি বর্গের প্রায় সব বর্গই কর্মবাদ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। কুশল ও অকুশল কর্ম ও এর ফলাফল কিরূপ কর্ম করতে হবে তা প্রায সকলই উঠে এসেছে ধর্মপদে। ধর্মপদে কর্ণিত কর্মের উদাহরণগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো :

যমক বর্গে কর্মবাদ নিয়ে চমৎকার আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কর্মবাদের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে নানা উপমায় কর্মবাদের আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে মন ধর্ম সমূহের অগ্রণী। কেউ যদি দোষমুক্ত মনে কোন কথা বলে বা কাজ করে তাহলে বলদের অনুসরণকারী চাকার মতো দুঃখ তাকে অনুসরণ করে। আবার কেউ যদি খুশি বা ভালো মনে কোন কথা বলে বা কাজ করে তবে ছায়ার মত সুখ তাকে অনুসরণ করে।[৩৮]

যারা সার বস্তুকে অসার ও অন্যায়কে সার বলে জানেন সেই মিথ্যা কল্পনা বিলাসীর সার বস্তু লাভ করতে পারে না। আর যারা সারকে সার ও অসার বস্তুকে অসার জানেন তারা প্রকৃত সার বস্তু লাভ করতে সক্ষম হয়।[৩৯] অপ্রমাদ বর্গেও কর্মবাদ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। অপ্রমাণ বর্গের শুরুতেই বলা হয়েছে, অপ্রমাদ হলা অমৃত লাভের পথ এবং প্রমাদ হলো মৃত্যুর পথ। প্রমত্ত ব্যক্তিরা যেমন জীবিত থেকেও মৃতের মত তেমনি অপ্রমত্ত ব্যক্তিরা অমর।[৪০]এখানে আর ও বলা হয়েছে যিনি পবিত্রকর্মা, উদ্যমশীল, স্মৃতিমান ও বিশেষ বিবেচনা সহকারে কাজ করে থাকে এবং যিনি সংযত ও ধর্মত জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন, সেই অপ্রমত্ত ব্যক্তির সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।[৪১] অর্থাৎ, কর্মের কথা সব জায়গায় প্রচলিত।

চিত্ত বর্গে চিত্তকে দিয়ে কর্মবাদ তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে দূরগামী একচর, অশরীর, গুহাশ্রয় চিত্তকে যারা সংযত করেন, তারা মারের বন্ধন থেকে মুক্ত হন।[৪২] আবার যিনি চিত্তকে আসক্তিহীন ও সর্বকর্মে অবিচলিত ভাবে তৈরি করেছেন। তিনি পাপ পূণ্যের বন্ধন পরিহার করেছেন। সেই জাগ্রত ব্যক্তির আর পতনের ভয় থাকে না।[৪৩]

পুষ্প বর্গেও কর্ম সম্পর্কে ও এর ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ৪৬ নং গাথায় বলা হয়েছে। যিনি এই শরীরকে অনিত্য ও মিথ্যা বলে উপলব্ধি করেন, তিনি পঞ্চকামে আসক্তি ছেদন করে, মৃত্যুর অধিকারের বাইরে গমন করে।[৪৪] পুষ্পবর্গে অপরের কাজ সম্পর্কে লক্ষ্য রাখতে না বলেছেন। অপর ব্যক্তি কি করলো না করলো তার ভুল ত্রুটি লক্ষ্য না করতে বলা হয়েছে। নিজের করা কর্মের প্রতি নজর রাখতে বলা হয়েছে। নিজের ত্রুটি বিচ্যুতি থাকলে তা লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে।[৪৫] ফুল দিয়ে যেমন মালা গাঁথা যায় তেমনি যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ জীবন মানবজীবন লাভ করেছে তারও অনেক রকমের পূণ্য কর্ম করা উচিত।[৪৬] এভাবে নানা উপদেশ মূলক কর্ম সম্পর্কিত বাক্যে সমৃদ্ধ পুষ্পবর্গ।

মূর্খ বর্গে খুব চমৎকার ভাবে কর্ম সম্পর্কে উপদেশ বিধৃত হয়েছে ৬৭ নং শ্লোকে বলা আছে, যে কর্ম করে পরে সেই কর্ম নিয়ে মনে কষ্ট হয়, অনুতাপ করতে হয়, হাহাকার, কান্না করতে হয় সেই কর্ম না করাই ভালো। খুবই চমৎকার উপমায় বুদ্ধ এই কথার মাধ্যমে কোন কর্ম করা উচিত, কোন কর্ম করা উচিত নয় তা বুঝিয়ে দিয়েছেন।[৪৭] পন্ডিত বর্গে কর্ম ও কর্মফল সম্পর্কে দেখানো হয়েছে যে, যারা সুপ্রচারিত ধর্মের অনুসারী বুদ্ধ শাসনের অনুসারী বুদ্ধের ব্যাখ্যা ও ধর্ম অনুসরণ করে, তারাই কেবল সুদুস্তর মৃত্যুর অধিকার উত্তীর্ণ হয়ে পরপারে গমন করে।[৪৮]

পাপ বর্গের অন্যতম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কর্ম ও কর্মফল। এই বর্গে কর্ম ও কর্মফল নিয়ে খুব ভালোভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, যদি কেউ ভুলে পাপ কর্ম সম্পাদন করে তাহলে তাকে আর সেই

কর্ম বার বার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ পাপ সঞ্চিত হতে থাকলে তা তার জন্য অমঙ্গল বয়ে আনবে। আবার পরবর্তী গাথাতেই বিধৃত হযেছে কেউ যদি কুশল কর্ম করে তাহলে সে যেন সেই রূপ কুশল কর্ম বারবার সম্পাদন করে, কারণ কুশল কর্মের ফল ও সঞ্চয় সুখকর। পাপ কর্ম যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপক্ক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত পাপীর কাছে সেই পাপকে মঙ্গল জনক মনে হয়। মনে হয় এই পাপকর্ম করে আমি অনেক কিছু লাভ করেছি, আত্মতৃপ্তিতে ভোগে। কিন্তু পাপ যখন একবার পরিপক্ক হয়ে যায় তখন এটি খুব নিষ্ঠুর ভাবে পাপীর সামনে আসে। তখন আর তার কিছু করার থাকে না।[৪৯] তাছাড়া পাপ বর্গের ১২৬,১২৭,১২৮ নং গাথার উদাহরণ। আমরা অকুশল কর্মের উদাহরণ হিসেবে বৌদ্ধ দর্শনের অনেক আলোচনায় পাই। এখানে বলা হয়েছে, ব্যক্তির নিজের কর্মের ফলস্বরূপ মৃত্যুর পর কেউ মাতৃগর্ভে, পাপীরা নরকে, ধার্মিক ও কুশল কর্ম সম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বর্গ লাভ করে এবং ক্ষীণাসবগণ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। অকুশল কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি তার পাপ কর্ম লুকায়নের জন্য আকাশ, সমুদ্রের মাঝে বা পর্বতের কোণে যেখানেই পলায়ণ করুক বা অবস্থান করুক, সে তার পাপ কর্মের ফলাফল অবশ্যই পাবে।[৫০]

দণ্ড বর্গেও কর্মফল সম্পর্কে বলা হয়েছে যদি কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার করে, যে ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য নয় ও নিরপরাধ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে দণ্ড বা শাস্তি দেয় সেই ব্যক্তি বর্তমান জীবনে দশবিধ কুশলের ফল পায় না। তারা তাদের কর্মফল স্বরূপ তীব্র যন্ত্রনা, সম্পদক্ষয়, শরীরে নানা রকম কঠিন ব্যাধি বা রোগ ও মানসিক ভাবে অসুস্থ হয়ে যায়। যদি তিনি রাজা হন তাহলে তার সুনাম লোপ পায়।তার নামে অপবাদ হয়, আত্মীয়দের সাথে খারাপ সম্পর্ক, সম্পত্তি নাশ হয় এবং মৃত্যুর পর তার স্থান হয় মন্দবুদ্ধি নরকে। এভাবে সুন্দর উপমার সাহায্যে অকুশল কর্মের ব্যাখ্যা দেখানো হয়েছে।[৫১]

মার্গবর্গে কর্মবাদের অংশ হিসেবে কোন কর্ম করলে আমাদের নির্বাণ নিশ্চিত হবে, সকল প্রকার মার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে তার পথ দেখিয়েছেন। এখানে বলা হয়েছে মার্গ বা পথের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ, সত্যের মধ্যে চতুরার্যসত্য, ধর্মের মধ্যে বিরাগ এবং দ্বিপদ গণের মধ্যে চক্ষুষ্মানই শ্রেষ্ঠ। দর্শন বিশুদ্ধি করতে হলে অষ্টঙ্গিক মার্গ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। মহামতি এই মার্গকেই অবলম্বন ও অনুসরণ করতে বলেছেন। এই পথ অবলম্বন করলেই মারবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।[৫২]

এভাবে ধর্মপদের প্রতি বর্গেই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন উপমায়, কাব্যিক ভঙ্গিতে, বিভিন্ন উদাহরণের সাথে ব্যাখ্যার মাধ্যমে কর্মবাদকে আলোচনা করা হয়েছে। কুশল ও অকুশল কর্মের ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কুশল ও অকুশল কর্মের ফলাফল নিয়ে আলোচনা হয়েছে, মানুষকে সচেতন করা হয়েছে। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, কর্মবাদরে প্রায়োগিক দিক আলোচনায় ধর্মপদের গুরুত্ব অপরিসীম।

মিলিন্দ প্রশ্নে বর্ণিত কর্মবাদ ও এর প্রায়োগিক ব্যবহার

ত্রিপিটক বহির্ভূত সাহিত্যের মধ্যে যে কয়েকটি সাহিত্য জনমনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে, ধর্ম ও কর্মের জ্ঞানের দ্বারা জনপ্রিয় হয়েছে তন্মধ্যে মিলিন্দপ্রশ্ন অন্যতম। রাজা মিলিন্দ ও আয়ুষ্মান নাগসেনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও উত্তরের মাধ্যমে বৌদ্ধ দর্শনতত্ত্বের ও ব্যাখ্যা উপমায় পরিপূর্ণ ত্রিপিটক বর্হিভূত মৌলিক গ্রন্থ। অতি সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত গ্রন্থটি ভাব দর্শন সকল শ্রেণির পাঠকের কাছে সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থটিতে বৌদ্ধ কর্মবাদ সহ বৌদ্ধ দর্শনের আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অতি সরস, সর্বজনবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলে ধরা হয়েছে। বিভিন্ন তত্ত্ব উপদেশ, বিভিন্ন রকমের দৃষ্টান্ত, আখ্যায়িকা, উপমা প্রভৃতির সাহায্যে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যার তাৎপর্য যে কেউ খুব সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারবে। Prof T.W Rhys Davids এর মতে, "এটা একমাত্র ত্রিপিটক বহির্ভূত গ্রন্থ যা থেরবাদী বৌদ্ধদের কাছে অসীম সমাদর লাভ করেছে।" এ সম্পর্কে I.B Horner এর নিচের বিশেষ ভাবে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেন : "The Basis the approach and the Appeal of the Milindo Panho are on an intellictual and not a mdeitahonal plane." [৫৩]

'*মিলিন্দ প্রশ্ন*' গ্রন্থে বিভিন্ন যুক্তি ও উপমার সাহায্যে চমৎকার ভাবে কর্মবাদ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। কর্মের বিভিন্ন হেতু বৈষম্য রাজা মিলিন্দ ভান্তে নাগসেনকে জিজ্ঞাসা করেন, কেন এই জগতে কেই স্বল্পায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ স্বাস্থ্যবান, কেউ রুগ্ন, কেই সুন্দর, কেউ কুৎসিৎ, কেউ অন্ধ, কেউ বধির ও বিকৃতাঙ্গযুক্ত, কেউ সুদর্শন অঙ্গের অধিকারী, কেউ মূর্খ, কেউ পণ্ডিত ইত্যাদি বৈষম্য?

উত্তরে নাগসেন মহারাজকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কী কারণে সকল গাছ সমান নয়, কিছু ফল হয় টক, কিছু লবণাক্ত, কিছু তেতো, কিছু কষায়, আবার কিছু মধুর রসযুক্ত?"

উত্তরে মহারাজ বললেন, মনে হয় বিভিন্ন বীজ বিভিন্ন রকম তাই।

তখন স্থবির বললেন, এভাবেই বিভিন্ন প্রকার কর্মের কারণেই কেউ অল্পায়ু, কেউ দীর্ঘায়ু, কেউ বিভিন্ন রোগগ্রস্থ, আবার কেউ নীরোগ, কেউ দেখতে খারাপ, কেউ নীচ বংশজাত আবার কেউ উচ্চ বংশজাত, কেউ নির্বোধ, আবার কেউ অশেষ প্রজ্ঞার অধিকারী।

স্থবির আরও বললেন, মহামতি বলেছেন, সকল জীব নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে, সকল জীব নিজ নিজ কর্মের উত্তরাধিকারী, নিজের কর্মানুসারেই বিভিন্ন যোনীতে উৎপন্ন হয়। নিজের কর্মই নিজের বন্ধু, নিজের কর্মই নিজের আশ্রয়। কর্মই প্রাণীগণকে হীন কিংবা উত্তম রূপে বিভাগ করে। যে যেমন কর্ম করবে, সে সেরূপ ফলই পাবে। এভাবে চমৎকার উপমার মাধ্যমে কর্মবাদকে ভন্তে নাগসেন রাজা মিলিন্দের কাছে উপস্থাপন করলেন। রাজা মিলিন্দের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। এভাবেই সকল শ্রেণির মানুষ মিলিন্দ প্রশ্ন পাঠের মাধ্যমে খুব সহজেই কর্মবাদ সহ তাদের মনের নানান জিজ্ঞাসা সম্পর্কে জানতে পারবে।[৫৪]

ক্ষুদ্র কর্ম বিভঙ্গ সূত্র ও মহাকর্ম বিভঙ্গ সূত্রে বর্ণিত কর্মবাদ ও এর প্রায়োগিক দিক

সূত্র ত্রিপিটকের মাধ্যমে নিকায়ের তৃতীয় খন্ডের দুইটি সূত্র হচ্ছে ক্ষুদ্র কর্ম বিভঙ্গ ও মহাকর্ম বিভক্ত সূত্র। এই দুইটি সূত্রেই বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও উদাহরণের মাধ্যমে কর্মবাদ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। 'ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ' গ্রন্থে মহামতি বুদ্ধ ও শুভ মানবকের মধ্যে প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে কর্মবাদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শুভ মানবক বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বৈষম্যের কারণ সম্পর্কে জানত চান আর মহামতি বুদ্ধ বিভিন্ন উপমা ও উদাহরণের সাহায্যে ইহকালে কী করলে পর জন্মে কোথায় ঈশ্বর কোথায় কী তা ব্যাখ্যা করেছেন। এই ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ পাঠের মাধ্যমে জনমনে সচেতনতা তৈরী হয় এবং মানুষ তার কর্ম কিভাবে করলে পরজন্মে স্বর্গলাভ করবে ও কী কাজ করলে পরজন্মে নরকবাস সহ চারি আপায়ে জন্মগ্রহণ করবে বা পরজন্মে মানুষ হয়ে জন্মলাভ করলে তা কি দুর্গতি হবে তা জানতে পারবে।

মহাকর্ম বিভঙ্গে পরিব্রাজক পোতলিপুত্র ও আয়ুষ্মান সমৃদ্ধির কথোপকথন থেকে সৃষ্ট বিভ্রান্তি থেকে যে প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছিল তার উত্তর জানতে আয়ুষ্মান সমৃদ্ধি আয়ুষ্মান আনন্দের কাছে যান। আয়ুষ্মান আনন্দকে উদ্দেশ্য করে মহামতির উপদেশই হলো মহাকর্ম বিভঙ্গের আলোচ্য বিষয়। এখানে বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে সহজ সরলভাবে কোন কাজের ফলশ্রুতিতে কী হয় তা আলোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ কর্মবাদে ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ ও মহাকর্ম বিভঙ্গের আলোচনার গুরুত্ব সকল শ্রেনির মানুষের কাছে অপরিসীম।[৫৫]

উপাসক জনালঙ্কারে বিধৃত কর্মবাদ ও এর প্রায়োগিক দিক

গৃহীদের কর্তব্য সম্পর্কে যে সকল গ্রন্থ সিংহলে রচিত হয়েছে তাদের মধ্যে উপাসক জনালঙ্কার অন্যতম। শীল বিশুদ্ধি, ধুতাঙ্গব্রত প্রতিপালন, ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ, পঞ্চবাণিজ্য পরিত্যাগ, দৈনন্দিন পূণ্যানুষ্ঠান, অকুশল কর্ম ত্যাগ, লৌকিক কুশল কর্ম সম্পাদন ও লোকত্তর ধর্মের প্রতিষ্ঠা সহ গৃহীদের কর্তব্য গুলো এই গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়। এই গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে দশবিধ কুশল কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা কর্মবাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক। এটি পূর্বে আলোচনা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্তরায় কর কর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে অসৎ সঙ্গ পরিত্যাগের কথা বলা হয়েছে। দুর্জনের সহবাস পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছে। যদি নিজের সমান বা নিজের চেয়ে গুণবান কেউ না মিলে তাহলে একাই থাকতে বলা হয়েছে। তার পরও মূর্খের সঙ্গে থাকতে নিষেধ করা হয়েছে। পাঁচটি অন্তরায়কর কর্মের ব্যাখ্যা করা হয়েছে এগুলো হল ১. মাতৃহত্যা ২. পিতৃহত্যা ৩. অর্হৎ হত্যা ৪. বুদ্ধের দেহ হেত রক্তপাত ও ৫) সংঘ বিভেদ করা। এই পাঁচ প্রকার ক্ষতিকর কর্ম যারা বর্তমান জীবনে করেন তারা সেই কর্মের ফল স্বরূপ কখনোই মার্গফল লাভ করতে পারে না। এই দুষ্কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি মৃত্যুর পরই অবিচি নরকে উৎপন্ন হয়। এই কারণে এই পাঁচ প্রকার কর্ম পরিহার করা উচিত।[৫৬]

সপ্তম অধ্যায়ে লৌকিক সম্পত্তি নিদ্দেস সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে কিভাবে একজন শ্রদ্ধাবান গৃহস্থ তাদের নিজেদের পূণ্যকর্ম দ্বারা স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। একজন কুশল কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি তার কুশল কর্মের ফলস্বরূপ শুধু বর্তমান জীবনেই সুখ ভোগ করে তা নয়, তিনি মৃত্যুর পরও অনেক দিব্য সুখের অধিকারী হন। পূণ্যবান ব্যক্তিগণ মৃত্যুর পর তাদের নিজেদের পূণ্যের পরিমাণ অনুসারে চতুর্মহারাজিক, তাবতিংষ, যাম, তুষিত, নির্মাণ রতি এবং পর নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হয়। তাঁরা সেখানে দীর্ঘকাল দিব্যসুখ ভোগ করে। আবার উপাসক উপাসিকাবৃন্দ ধ্যান সাধনার পাশাপাশি রূপারূপ ধ্যানও লাভ করে থাকেন। এই ধ্যানফলকামী ব্যক্তিগণ ব্রহ্মলোকে জন্মগ্রহণ করে মহাবিভূতির অধিকারী হন। তাদের সুনাম সমস্ত বিশ্বব্রহ্মান্ডে ছড়িয়ে পড়ে। আর যারা দুষ্কর্ম করে তারা মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হন।[৫৭]

এছাড়াও আজীব নিদ্দেস, লোকুত্তর সম্পত্তি নিদ্দেস ও কর্মবাদের প্রচ্ছন্ন ধারনা রয়েছে। উপাসক জনালঙ্কার একটি চমৎকার শিক্ষণীয় গ্রন্থ। এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে গৃহীগণ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় কর্তব্য ও কর্ম সম্পর্কে জানতে পারবে। কোন কর্ম করা উচিত, কোন কর্ম করলে স্বর্গ লাভ করা সম্ভব আর কোন কর্ম পরিহার করা উচিত, কোন কর্ম করলে নরকবাস হবে তা আমরা এই গ্রন্থ পাঠের মাধ্যমে জানতে পারি। তাই সকল গৃহীদের এই গ্রন্থটি সংগ্রহ করে পাঠ করা উচিত।

কর্মবাদ সম্পর্কিত আলোচনা ত্রিপিটক ও ত্রিপিটক বহির্ভূত সাহিত্যের অন্যতম উপজীব্য বিষয়। বৌদ্ধ সাহিত্যের স্থানে স্থানে রয়েছে কর্মবাদের আলোচনা। উপরোক্ত আলোচনা ছাড়াও বৌদ্ধ সাহিত্যের আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন চরিযা পিটক, বুদ্ধ বংশ, খুদ্দক নিকায়, মজ্ঝিম নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, দীর্ঘনিকায়, জাতক সাহিত্য, অর্থকথা সাহিত্যসহ বিভিন্ন স্থানে খুবই গুরুত্বের সাথে কর্মবাদ আলোচিত হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনের কর্মবাদ সম্পর্কিত আলোচনা বৌদ্ধ সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে, মানুষ জানতে পেরেছে কীভাবে কোনোকর্ম সম্পাদন করলে তার ফলাফল কেমন হবে। বৌদ্ধ কর্মবাদের আলোচনার মাধ্যমে স্বর্গ, নরক সহ আর ও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানুষের সামনে উঠে এসেছে। তাই আমাদের উচিত কর্মবাদকে অন্তরে ধারণ করে কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে সুন্দর জীবনযাপনের মাধ্যমে আরো বিকশিত করা ।

তথ্য নির্দেশিকা

১. আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন* (কলিকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১০), পৃ. ১০৭

২. দশক নিপাত, অঙ্গুত্তরে জানুস্সোনি সুত্তং, তিরোকুড্ড সুত্তং, সিগাল ওবাদ সুত্তং, প্রেতবত্থু ১/৪

৩. *বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা*, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্য পুস্তক বোর্ড,২০১৮, পৃ. ১৯-২৩

৪. *বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা*, ইউনিট-৬, এসএসসি প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৮৮-৮৯

৫. *Introducion to the patimokkha Rules* by Thanissaro Bhikkhu, 1994. Acess to insight org, PP: 1-3

৬. শ্রীবেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত,*মধ্যমনিকায়*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা: ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ, যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ৭৪-৭৭

৭. ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চক নিপাত (বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ৩২০-৩২১

৮. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বিদর্শন ধ্যান* (ঢাকা: অন্যধারা, ২০১৩), পৃ. ৪২-৪৯

৯. Drewes, David (2010), "*Early Indian Mahayana Buddhism I: Recent Scholarship*" Religion Compass 14 (2): PP: 55-65

১০. *বৌদ্ধ দর্শনে সত্যদর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭-১২৮

১১. শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক অনুদিত, শীলানিশংস জাতক, *খুদ্দক নিকায়ে জাতক* (দ্বিনিপাত) (কলিকাতা: ১৩৮৫, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ৭৫৫-৭৫৮

১২. *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯

১৩. *থেরবাদ*, সুমনকান্তি বড়ুয়া, *বাংলাপিডিয়া* (ঢাকা: ২০১৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাাইটি)

১৪. Norman, Kenneth Roy (1983), *Pali Literature*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz. pp. 72-75. ISBN 3-447-02285-X

১৫. পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা*, দ্বিতীয় বর্গ, (বাংলাদেশ : ১৯৩৫, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি ২০১৭, পৃ. ৬২

১৬. পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা* (বাংলাদেশ :ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ৫৫

১৭. পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা*, ১৯৩৫, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, পৃ. ১৩৭-১৩৮

১৮. পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা (বাংলাদেশ:* ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ১৪০-১৪১

১৯. পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা* (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ৩০৫-৩১১

২০. পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা* (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ২৮৫-২৮৬

২১. Hallisey, Charles (2015), *Therigatha: Poems of the First Buddist Women*, Cambridge MA Harvard University Press. pp. X. ISBN 9780674427730

২২. Thanissaro Bhikkhu (Geoffrey DeGraff (2015) *Poems of Elders* P.3

২৩. পবিত্র ত্রিপিটক, ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনূদিত, *খুদ্দকনিকায়ে থেরীগাথা* (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি-২০১৭), পৃ. ৪০৯-৪১০

২৪. পবিত্র ত্রিপিটক, ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনূদিত, খুদ্দক নিকায়ে থেরী গাথা (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি-২০১৭), পৃ. ৪৬৪-৪৬৬

২৫. পবিত্র ত্রিপিটক, ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরীগাথা (বাংলাদেশ :* ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি-২০১৭), পৃ. ৪২৭-৪২৮

২৬. খুদ্দক নিকায়ে থেরীগাথা, প্রাগুক্ত,, পৃ. ৪০৪-৪০৫

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৪-৪৪৫

২৮. স্থবির ধর্ম রত্ন ভিক্ষু, শ্রীমৎ রাহুল ভিক্ষু অনূদিত, প্রেতকাহিনি অর্থকথা (ঢাকা: কল্পতরু: ২০১৬), পৃ. ১৯ (প্রকাশকের কথা)

২৯. প্রেতকাহিনি অর্থকথা, পৃ. ১২-১৫ (ভূমিকা)

৩০. প্রেতকাহিনি অর্থকথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৮৩

৩১. শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির অনূদিত, খুদ্দক নিকায়ে প্রেতকাহিনি (বাংলাদেশ :ত্রিপিটক পাবলিশিং, সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ৮৬৫-৮৭০

৩২. শ্রীমৎ রাহুল ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত, বিমান কাহিনি অর্থকথা, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো বিমান কাহিনি অটঠকথা প্রসঙ্গ, (ঢাকা : কল্পতরু, ২০১৭), পৃ. ১৪-১৫

৩৩.শ্রীমৎ রাহুল ভিক্ষু, *বিমান কাহিনি অর্থকথা*, কল্পতরু, ২০১৭, পৃ. ১৭-২০ (অবতরণিকা)

৩৪. পবিত্র প্রিপিটক, শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির, *খুদ্দক নিকায়ে বিমান বত্থু* (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ৬৯৩-৬৯৫

৩৫. *বিমান কাহিনি অর্থকথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪৫

৩৬. *খুদ্দক নিকায়ে বিমানবত্থু*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০০-৮০১

৩৭. See, for instance, Buswell (2003): "rank[s] among the best known Buddhist texts" (p. 11); and, "one of the most popular texts with Buddhist monks and laypersons" (p. 627). Harvey (2007), p. 322, writes: "Its popularity is reflected in the many times it has been translated into Western languages"; Brough (2001), p. xvii, writes: "The collection of Pali ethical verses entitled "Dhammapada" is one of the most widely known of early Buddhist texts."

৩৮. পবিত্র ত্রিপিটক, শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে ধম্মপদ* (বাংলাদেশ : পাবলিশিং সোসাইটি ২০১৭), পৃ. ১১১

৩৯. *খুদ্দক নিকায়ে ধম্মপদ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮-১১৯

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

৪৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫১

৫৩. Milinda's Question. Vol-1. Translator's Introduction. P.XXI (Sacred Books of Buddhists. Vol-33. London 1963

৫৪. পবিত্র ত্রিপিটক, *খুদ্দক নিকায়ে মিলিন্দপ্রশ্ন*, শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক অনূদিত (বাংলাদেশ ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ১২৫-১২৬

৫৫. পবিত্র ত্রিপিটক, ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত, ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্র ও মহাকর্ম বিভঙ্গ সূত্র, *সূত্রপিটকে মধ্যম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড কলিকাতঃ (ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৩) পৃ. ৯৬৫-৯৭৩

৫৬. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড* (ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ২২৫-২২৬

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৬

তৃতীয় অধ্যায়

কর্মের শ্রেণি বিভাজন

সাধারণত মানুষের কর্মের মধ্যেই তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা জানি,মানুষই সৎকর্ম করে আবার মানুষই অসৎকর্ম করে। মানুষের মাঝেই সৎ-অসৎ শ্রেণি বিদ্যমান। বুদ্ধ চার শ্রেণির মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন। যেখানে সৎ-অসৎ বিষয়ে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। সুতরাং, প্রকৃত মানুষ হতে হলে তার মধ্যে অবশ্যই মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। মানবিক মূল্যবোধ ব্যতীত প্রকৃত মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। মানুষের পরিচয় নির্ভর করে তার কর্মের উপর জন্মের উপর নয়। বুদ্ধ সেই আদিকালে এই দর্শন উপলব্ধি করেছিলেন এবং সর্বস্তরের মানুষের কাছে প্রচার করেছিলেন। এই কর্মবাদ দর্শনই আজকের আধুনিক জীবনে ভেদ-বৈষম্যহীন সুশীল সমাজ গঠনে অত্যন্ত উপযোগী দর্শন।[১]

কর্মের অনুষ্ঠান শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠানে সমাপ্ত হয় না। কোনো না কোনো কর্মের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া অবশ্যই হবে। এটি নিশ্চিত যে, কর্ম তার ফল দান করবেই। কোন মাঠ বা ক্ষেতে বীজ বপন করলে তার যেমন ফল হয় তেমনি কোন কর্ম সম্পাদন হলে তার ফল অবশ্যম্ভাবী। এই কথা অবশ্যই বলতে হবে যে, কুশল কর্মের ফল হবে সুখকর এবং অকুশল কর্মের ফল দুঃখজনক। জীব তার সম্পাদিত সুকর্মের ফলে জন্ম জন্মান্তরে সুগতি লাভ করে এবং দুষ্কর্মের ফলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয়। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় কর্ম প্রতিটি জীবের ভেতরের শক্তিরূপে জীবের জীবনচক্রকে চালিত করছে।[২]

গৌতম বুদ্ধ কর্মের বিধানকে স্বীকার করে ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করেননি। বরঞ্চ তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেছেন যে, মানুষ তার ইচ্ছার স্বাধীনতার দ্বারা তার কর্মের গতি ফিরিয়ে কর্মফলে রূপান্তর সৃষ্টি করতে পারে। বুদ্ধ মতে, কর্ম নিয়ম যান্ত্রিক নিয়ম নয়। কর্মের নিয়ম স্বীকার করে যে মানুষ ইচ্ছা করলে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এ তিনটির মধ্যে তার পূর্ব কর্মের পরিবর্তন করে বর্তমান অবস্থার রূপান্তর ঘটাতে পারে। এখানে বলা হয়েছে, বর্তমানে মানুষ কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের সুন্দর জীবন গড়তে পারে। সুখময় জীবন অতিবাহিত করতে পারে। এমন কি অমৃতময় নির্বাণও লাভ করতে পারে। এভাবে নিজের কৃতকর্মের নিয়ন্ত্রক অন্য কোনো দেবতা বা ঈশ্বর না হয়ে মানুষ নিজে হওয়ায় বরং মানুষের ইচ্ছায় স্বাধীনতাকে আরও বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।[৩]

লোভ, দ্বেষ, মোহহীন কর্ম সম্পাদন করতে হবে। এই ধরনের কর্মে কোনো প্রকার পাপের স্পর্শ থাকে না। কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বর্তমান, ভবিষ্যত দুই জীবনই সুরক্ষিত রাখা যায়। অপর পক্ষে কর্মের মধ্যে, যদি লোভ থাকে, দ্বেষ ও মোহ থাকে তাহলে তার ফলাফল সুখকর হয় না। এরকম অকুশল কর্ম সম্পাদনের

মাধ্যমে সমাজে মানুষ অপমানিত ও অপদস্থ হয়। মান-সম্মানের প্রভূত ক্ষতি সাধন হয়। তার নিন্দা প্রচারিত হয় এবং ভবিষ্যতেও নরকবাস নিশ্চিত হয়।

প্রতীত্যসমুৎপাদ বা দ্বাদশ কার্যকারণ বিধিতে দ্বিমূল ত্রি-কালের ত্রি-সন্ধির কর্ম সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। কর্ম তত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনায় সে বিষয়ের আরও গভীরে প্রবেশ করে জীবগণ কর্ম ভবে বা পার্থিব জীবনে কি কি কর্ম সম্পাদন, কোনো কোনো কর্মের কারণে কর্ম ফল স্বরূপ পুনঃজন্ম লাভ করতে হয়, কোথায় জন্ম ধারণ করে, কোন নিয়মে জন্ম ধারণ করে, আর কোনো কোনো কর্মফলের কারণে জন্মে, দ্বিতীয় জন্মে কোনো কোনো কর্মফল অর্হত্ত্ব ও নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত অনেক জন্ম জন্মান্তর ধরে চলতে থাকে এবং যে কোনো ভাবে ফল প্রদান করেই এক প্রতিসন্ধি ক্ষণের পরবর্তী ক্ষণ হতে সেই ভবের চ্যুতিক্ষণ পর্যন্ত প্রবর্তন কাল বা বর্তমান জীবনের কর্মময় অধ্যায়। চ্যুতিক্ষণের পরবর্তী এবং উৎপত্তিগত ভাবে পুনঃজন্ম লাভের আগের মূহুর্ত পর্যন্ত প্রতিসন্ধি কাল।

বৌদ্ধধর্মের সৌত্রান্তিক দেশনা অনুযায়ী জীবগণ প্রবর্তন কাল বা কর্মভবে মোট ১১ প্রকার কর্ম সম্পাদন করে। এই এগার প্রকার কর্মই জীবগণকে জগৎ সংসারে কর্মের বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখে একত্রিশ লোক ভূমির মধ্যে ত্রিকাল ত্রিসন্ধি, দুই মূল প্রতীত্যসমুৎপাদ বা কার্যকারণ বিধির মাধ্যমে জন্মচক্র ও ভবচক্রে বার বার ঘুরাচ্ছে।[৪] সৌত্রান্তিক দেশনা অনুযায়ী কর্মকে এগার ভাগে ভাগ করা হলেও ফল প্রাপ্তির কাল হিসেবে কর্মকে আরও একটি শ্রেণি যোগ করা যায়। যে কর্মের ফল প্রদানের শক্তি বর্তমানে বা অহোসি কর্মকে ফল প্রদানের কালে যুক্ত করলে মোট ১২টি কর্মের শ্রেণিভেদ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

বিভিন্ন বার প্রকার কর্মের শ্রেণিভেদ

কৃত্য ভেদে কর্ম চার প্রকার

- জনক কর্ম (Reproductive Karma)
- উপস্তম্ভক কর্ম (Supportive Karma)
- উৎপীড়ক/উপপীড়ক কর্ম (Obstructive or Counter Active Karma)
- উপঘাতক কর্ম (Destructive Karma)

প্রতিসন্ধি ক্ষণে কর্ম চার প্রকার

- গুরু কর্ম (Weighty or Serious Karma)
- আসন্ন বা মরণাসন্ন কর্ম (Death Proximate Karma)
- আচরিত কর্ম (Habitual Karma)
- কৃতত্ব বা উপচিত কর্ম (Cumulative Karma)

ফল প্রাপ্তির কাল হিসাবে কর্ম চার প্রকার

- দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্মঃ যে ফল ইহকালে অনুভব করা যায়
- উপপাদ্য বেদনীয় কর্মঃ ঠিক পরবর্তী জীবনে যে ফল অনুভব করা যায়
- অপর পর্যায় বেদনীয় কর্মঃ পরবর্তী দ্বিতীয় জন্ম থেকে নির্বাণ লাভের আগে যে কোন জন্মে ফল অনুভব করা যায়।
- অহোসি/ভূতপূর্ব কর্মঃ যে কর্মের ফল প্রদানের শক্তি এক সময় ছিল কিন্তু বর্তমানে নেই।

কর্মের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটি ধারণা নিচে প্রদান করা হলো:

জনক কর্ম

যে কর্ম ভবিষ্যত নিরূপণ করে বা প্রভাবিত করে তাকেই জনক কর্ম বলা হয়। জনক কর্ম অতীত কর্মের ফল। এ কর্ম পুনর্জন্ম ঘটায়। জীবিতকালে এ কর্ম কুশল ও অকুশল চেতনামূলক। প্রত্যেক জন্মই পূর্বে সম্পাদিত কুশল বা অকুশল কর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয় যা মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে বা মৃত্যুর সময় আধিপত্য বিস্তার করে। এভাবে যে কর্ম ভবিষ্যত জন্মকে প্রভাবিত করে তাকে জনক কর্ম বলে। কোনো ব্যক্তির মৃত্যু মানে একটি ঘটনার সাময়িক বিরতি মাত্র। বর্তমান রূপ বা দেহের ধ্বংস সাধন হলে অন্য একটি রূপ বা দেহ সেই স্থানটি দখল করে নেয়। নতুন যে রূপটি স্থান দখল করলো সেটি আগের রূপটির মত নয় আবার সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপও নয়। মৃত্যুর সময় চিত্তে যে কর্মশক্তির ফলদায় কম্পন সৃষ্টি হয় তাই জীবন প্রবাহকে ঠিকঠাক রাখে এবং পরবর্তী জন্মের সৃষ্টি করে। একেই কোনো এক জন্মের সর্বশেষ চিত্ত যাকে সাধারণত জনক কর্ম বলা হয়। এই কর্মই কুশল-অকুশল ভেদে পরবর্তী জীবনে ব্যক্তিত্বের অবস্থায় রূপান্তরিত হয়।

জনক কর্মের বৈশিষ্ট্য হলো এটি শুধু প্রতিসন্ধি প্রদান করে থাকে। প্রতিসন্ধি প্রদান করার পর জীবন অতিবাহিত কালে অন্য কর্মের দ্বারা চালিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, কোনো মাতা সন্তান জন্ম দিল, কিন্তু সন্তানটি বড় হতে থাকল ধাত্রীর হাতে। এখানে মাতার সন্তান প্রসব হলো জনক কর্ম।

'অর্থকথা' অনুসারে জনক কর্ম হলো যা গর্ভধারণের সময়ে চিত্তস্কন্ধ ও রূপস্কন্ধ উৎপত্তি করে। প্রথমেই যে চিত্তের উৎপত্তি হয় তাকে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞান বলা হয় যা জনক কর্ম দ্বারা প্রভাবিত। মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি বিজ্ঞানের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে কায়দশক ভাবদশক এবং বাস্তুদশক উৎপন্ন কায়দশক উৎপত্তির উপকরণ হলো ৪টি ধাতু।

- যা বিস্তৃতি ঘটায় বা পৃথিবী ধাতু
- আপধাতু বা যা সংসক্তি ঘটায়
- তেজধাতু বা যা উষ্ণ উৎপাদন করে এবং

- বায়ু ধাতু বা যা গতির বা বেগের সৃষ্টি করে।

উপরি-উক্ত চারটি ধাতুর উপাদানরূপ হলো :

১. বর্ণ, গন্ধ, রস এবং ওজ। জীবতেন্দ্রিয় এবং কায় মোট ১০টি।

২. ভাবদশক উৎপত্তির উপকরণও কায়দশকের প্রথম ৯টি উপকরণ এবং স্ত্রী বা পুরুষ ভাব।

৩. বাস্তুদশকের উৎপত্তির উপকরণও কায়দশকের প্রথম ৯টি উপকরণ এবং চিত্তস্থান বা বাস্তু।

উপরি-উক্ত উদাহরণ থেকে এটি বোঝা যায় যে, আমরা জন্মধারণের পর দেখতে পাই যে, শিশু ছেলে নাকি মেয়ে (পুরুষভাব নাকি স্ত্রী ভাব)। এই জন্ম নেওয়াটা হলো কর্ম প্রভাবিত। হঠাৎ করে পুরুষের বীর্য এবং স্ত্রীর ডিম্বকোষের সংযুক্তিতে এটি নির্ধারিত হয় না। এগুলো তার কৃত কুশল ও অকুশল কর্মেরই ফল। এটি ব্যতীত সুখ এবং দুঃখ যা জীবন প্রবর্তনকালে অনুভূত হয় তা জনক কর্মের অবশ্যম্ভাবী ফল।[৫]

উপস্তম্ভক কর্ম

অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয়বস্তুর সহায়তায় যে পূর্বকর্মের চেতনা জনক কর্মকে কুশল বা অকুশলের দিকে নিয়ে যায়। যে কর্ম জনক কর্মকে ফল প্রদানে সাহায্য করে তাকে উপস্তম্ভক কর্ম বলে। জনক কর্মের প্রভাবে মানুষের জন্ম হয়, আর বেঁচে থাকে উপস্তম্ভক কর্মের প্রভাবে। উদাহরণস্বরূপ, কোন শিক্ষার্থী তার বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে অনুকূল পরিবেশ বা ভালো বন্ধু তাকে ভালো শিক্ষার্থী হতে, ভালো মানুষ হতে, উন্নতির দিকে যেতে সাহায্য করে এবং সকল অন্যায়, অকল্যাণ ও বিপথগামী হতে বাধা প্রদান করে। এই অনুকূল পরিবেশ বা ভালো বন্ধু তার উপস্তম্ভক। অন্যদিকে প্রতিকূল পরিবেশ বা অসৎ বন্ধু তাকে অবনতির দিকে নিয়ে যায়। এগুলিও তার উপস্তম্ভক কর্ম। গর্ভধারণের সময় থেকে মৃত্যু পর্যন্ত উপস্তম্ভক কর্ম জনক কর্মকে প্রতিপোষণ করে। কুশল উপস্তম্ভক কর্ম দ্বারা সুখ, ধনপ্রাপ্তি, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি লাভ করে। অপরপক্ষে অকুশল উপস্তম্ভক কর্ম দ্বারা ব্যক্তি দুঃখ, কষ্ট, বেদনা ভোগ করে।

উৎপীড়ক কর্ম

সাধারণত বাধা প্রদানকারী কর্মকেই উৎপীড়ক কর্ম বলে। অতীতের শক্তিশালী কর্মের দ্বারা এটি পূর্বে উল্লিখিত উপস্তম্ভক বা উপকারী কর্মের সাথে বিরোধ ঘটায়, বাধা প্রদান করে এবং দুর্বল করে দেয়। এই কর্ম সবসময় জনক কর্মকে দূর্বল করে দেয় এবং এর ফল প্রদানে ব্যতিক্রম ঘটায় বা বাধা প্রদান করে বলা যায়। পূর্ব কর্মলব্ধ চেতনা যখন রূপ, শব্দ, রসাদি বিষয়বস্তুর সাথে মিলন ঘটিয়ে নতুন কর্ম গঠন করতে গিয়ে উপস্তম্ভক কর্মের সাথে বিরোধিতা করে জনক কর্মের বিপাকে বাধা প্রদান করে, দূর্বল করে, বিপাকে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে সবসময় এই ভাবে উপদ্রব্য বা নিগ্রহ চালিয়ে যেতে থাকে তাকে উৎপীড়ক কর্ম বলে।

যেমন প্রচণ্ড রোদে কেউ তার শষ্য শুকাতে দিল কিন্তু বৃষ্টি এলে বাধা প্রদান করল, কোন ছাত্র পড়তে বসল কিন্তু কোন বন্ধু এসে তার পড়াশোনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করল। আবার কারো ভালো মেধা থাকা স্বত্ত্বেও আর্থিক সমস্যার কারণে তার পড়াশোনা অনিশ্চিত। উপরি-উক্তক্ত তিনটি উদাহরণে শষ্য শুকানো, ছাত্রের পড়তে বসা, ছাত্রের মেধা হল উপস্তম্ভক কর্ম। আর বৃষ্টি, বন্ধুর দ্বারা পড়াশোনা বিঘ্ন, মেধাবী ছাত্রের আর্থিক দৈন্যতা হলো উৎপীড়ক কর্মের শক্তি। উপস্তম্ভক কর্ম যদি কুশল হয় তাহলে উৎপীড়ক কর্মটি হবে অকুশল আর উপস্তম্ভক কর্মটি অকুশল হলে উৎপীড়ক কর্মটি কুশল হবে।

এইভাবে কোনো ব্যক্তি কুশল জনক কর্মের প্রভাবে জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও উৎপীড়ক কর্ম প্রভাবে তাকে দুঃখ, কষ্ট বেদনা ভোগ করতে হয়। উৎপীড়ক কর্ম এখানে কুশল জনক কর্মের সুখময় ফললাভে বাধা প্রদান করে। অপরপক্ষে, একটি কুকুর অকুশল জনক কর্মের প্রভাবে পশুযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ভালো খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদি লাভ করে সুখ ভোগ করে। উৎপীড়ক কর্ম এখানে জনক কর্মকে ফল প্রদানে বাধা দান করে।

কুশল পক্ষে উৎপীড়ক কর্ম

রাজগৃহ নগরের এক গ্রামে বাতকালক নামে এক জল্লাদ ছিলো, যার কাজ ছিল বিভিন্ন অপরাধীদের হত্যা করা, তিনি ছিলেন রাজ কর্মচারী। রাজার আদেশেই তিনি অপরাধীদের শাস্তি দিতেন। তিনি পঞ্চাশ বছর এই কাজ করেছেন। এই পঞ্চাশ বছরে তিনি অগণিত মানুষকে হত্যা করেছেন। বয়স বৃদ্ধির ফলে তার শক্তি কমে আসায় রাজা তাকে চাকরী থেকে অবসর প্রদান করেন। বাতকালক যতদিন চাকরীতে ছিলেন, তিনি কোনদিন ভালো পোশাক পরিধান করতে পারেন নি। কোনো রকম সাজ-সজ্জাও তিনি করেনটি চাকুরীকালীন সময়ে। অবসর গ্রহণের পর তিনি তার বাসায় ফিরে চিন্তা করলেন, যেহেতু ভয়ংকর অসুন্দর পোশাক পরে, অপরিপাটি হয়ে কুকর্ম করেছেন, তাই আজ তিনি সুন্দর পোশাক পরবেন ও সুখাদ্য গ্রহণ করবেন। এই চিন্তা করে তিনি তার স্ত্রীকে সুস্বাদু পায়েস ও বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য তৈরী করতে বলে নতুন পোশাক নিয়ে স্নানের জন্য পুকুরে গেলেন। স্নান শেষে নতুন পোশাক পড়ে, সুগন্ধী দিয়ে খুশি মনে বাড়িতে ফিরছিলেন। এমন সময় তিনি সারিপুত্র মহাস্থবিরকে দেখতে পেলেন। তিনি মনে মনে আনন্দিত হলেন এই ভেবে যে দীর্ঘদিন এই কুকর্ম থেকে রক্ষা পেয়ে আজকেই এই মহাপুরুষের দর্শন পেলেন। তিনি তার প্রস্তুতকৃত খাদ্য থেকে কিছু খাদ্য এই মহাপুরুষের ভিক্ষা পাত্রে দিলে তার মহাপূণ্য হবে এই ভেবে, এই মহান ভিক্ষুকে তার নিজের বাসায় নিয়ে গেলেন ও তাকে পায়েস ও সুস্বাদু খাদ্য দ্রবাদি দান করলেন। মহাস্থবির দানের অনুমোদনে কিছুক্ষণ ধর্মোপদেশ প্রদান করে বিহারে ফিরে যাওয়ার সময় বাতকালক তার সঙ্গে সঙ্গে কিছুদূর গেলেন। সে আবার তার বাড়িতে ফিরে আসার পথের মাঝে এক গাভীর প্রচন্ড আক্রমনে প্রাণ ত্যাগ করল। বাতকালক উক্ত কুশল কর্মের প্রভাবে তাবতিংস স্বর্গে উপনীত হলো।

ভিক্ষুগণ বুদ্ধের কাছে উপস্থিত হয়ে এত পাপ কর্ম করার পরে বাতকালক কোথায় উৎপন্ন হয়েছে তা জানতে চাইল। বুদ্ধ উত্তর দিলেন, ভিক্ষগণ সে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে ধর্মাত্ম কল্যাণমিত্র ধর্ম সেনাপতি সারিপুত্রকে দান দেওয়া ও ধর্মশ্রবণ করার ফলে, সে এখন তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছে। বাতকালকের এই কুশল কর্ম সারা জীবনের অকুশল কর্মের কলঙ্কে বাধা দিয়ে স্বর্গের অধিকারী করে দিল। এই কর্ম বিপক্ষ বা প্রতিকূল হওয়াতে উৎপীড়ক কর্ম নামে অভিহিত।[৬]

অকুশল পক্ষে উৎপীড়ক কর্ম

দুর্বল কুশল কর্মের প্রভাবে মানুষ হয়ে জন্ম লাভ করলে ও অপূণ্যবান সত্ত্বার প্রতিসন্ধি কাল থেকেই পারিবারিক নানা দুঃখ কষ্ট শুরু হয়। যেমন : কোনো কোনো সন্তান মায়ের গর্ভে প্রতিসন্ধি হবারর সাথেই পিতা মাতার সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে যায়, সম্পত্তির ক্ষতি হয়, দুগ্ধবতী গাভীর দুধ কমে যায়, চাকর চাকরানী অবাধ্য হয়। যতটুকু আশা করা হয়েছিল ততটুকু ফসল উৎপন্ন হয় না। সম্পত্তি নষ্ট হওয়া শুরু করে, জীবিকা নির্বাহ পর্যন্ত কষ্ট হয়ে যায়। প্রসব হওয়ার পর মা নানা রকম রোগে কষ্ট পায় সন্তান নিজেও মায়ের বুকের দুধ পায় না এবং বিভিন্ন রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এরকমই হলো উৎপীড়ক কর্মের ফলে। উৎপীড়ক কর্ম এভাবেই তার রূপ প্রকাশ করে।[৭]

উপঘাতক কর্ম

এই ধরনের কর্মের কাজ হলো বাঁধা প্রদান করা এবং নিজের আধিপত্য বিস্তার করা। উৎপীড়ক কর্মের মতো উপঘাতক কর্মও বিপরীত জাতীয় কর্মকে বাধা প্রদান করে, দুর্বল করে, এমনকি জনক কর্মকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে নিজে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। তাই এই কর্মকে উপঘাতক কর্ম বলা হয়। উৎপীড়ক কর্ম শুধু জনক কর্মকে বাধা প্রদান করে ও দুর্বল করে। কিন্তু উপঘাতক কর্মের কাজ হলো বিরুদ্ধ কর্মকে ধ্বংস করা। যেমন কোনো শ্রমিক জটিল রোগে আক্তান্ত হওয়ায় তার কাজ করার ক্ষমতা চিরদিনের মতো নষ্ট হলো এবং ক্রমান্বয়ে তার রোগবৃদ্ধি পেয়ে তার মৃত্যু ঘটল। এই রোগ তার কর্মক্ষমতা নষ্ট করলো এবং স্বীয় জীবনের পক্ষে উপঘাতক। উপঘাতক কর্ম কুশল ফলও প্রদান করতে পারে। অঙ্গুলিমাল প্রথম জীবনে বহু মানুষকে হত্যা করেও শেষে মহামতি গৌতম বুদ্ধের নির্দেশনায় ভিক্ষু জীবন লাভে অর্হত্বফল লাভ করে জীবমুক্ত হয়েছিলেন। সুতরাং উপঘাতক কর্ম ও কুশল। কুশল ভেদে দু'প্রকার হতে পারে। জীবের জীবন বিভিন্ন প্রকার বাধা বিপত্তিতে পরিপূর্ণ। তাই জীবের উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জনক কর্মফলের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবের উৎপত্তি হয়। জন্মের পরবর্তীতে এই প্রাণীগণ কোন কোন কর্মের মাধ্যমে উপকার পায়, কোন কোন কর্মের মাধ্যমে বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হয় ।

বিশ্বের সকল জীব তার অতীত কর্ম ফলের অনুসারী হয়ে বর্তমান জন্মে পুনঃজন্ম প্রাপ্ত হয়েছে। কুশল ও অকুশল কর্মের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন প্রাণী বিভিন্ন দেহ ধারণ করেছে। জনক কর্মই এই উত্তরাধিকার প্রদান করে। পৃথিবীতে পুনঃজন্মের পর জনক কর্ম তথা প্রতিসন্ধি লাভী প্রাণী যাতে তার পূর্ব জন্মের কুশল ও অকুশল কর্মফল প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যাপারে উপস্তম্ভক কর্ম সব সময় জনক কর্মকে সাহায্য বা উপকার করে থাকে। তাই এই কর্মের নাম হয়েছে উপস্তম্ভক বা উপকারক কর্ম । এই উপস্তম্ভক কর্ম যাতে জনক কর্মকে সাহায্য করতে না পারে, সেই চেষ্টা করে উৎপীড়ক কর্ম। উৎপীড়ক কর্ম সরাসরি উপস্তম্ভক কর্মের প্রতিদন্দ্বী হিসেবে জনক কর্মকে সবসময় বাধা প্রদান করার চেষ্টা করে। দুর্বল করে দেয়। উপঘাতক কর্ম আরও ভয়ানক। উপঘাতক কর্ম শুধু বাধাই প্রদান করে না। এটি জনক কর্মকে সরাসরি প্রাণে হত্যা করে ও নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। গাড়ি দুঘটনা, মৃত্যু,গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু, পানিতে ডুবে মৃত্যু হচ্ছে উপঘাতক কর্মের কাজ। উপস্তাম্ভক ও উৎপীড়ক কর্মের মধ্যে যে প্রতিদন্দ্বিতা সৃষ্টি হলো, সংঘাত সৃষ্টি হলো তা হলো কুশল জাতীয় উপস্তম্ভক কর্মকে অকুশল জাতীয় উৎপীড়ক কর্ম দ্বারা সব সময় বাধা প্রদান করা যাতে জনক কর্ম বা পুনঃজন্ম প্রাপ্ত প্রাণী বা জীব তার পূর্ব জন্মের কুশল ও অকুশল কর্মফল উপস্তম্ভক কর্মের সাহায্য প্রাপ্ত হয় না।

উদাহরণ

জনক কর্ম উচ্চ শিক্ষা লাভের সময় উপস্তম্ভক কর্ম তার সাহায্যকারী, উপকারী বন্ধু হিসেবে সহায়তা দান করতে থাকে, ঠিক সেই সময় উৎপীড়ক কর্ম এসে জনক কর্মের বিপথগামী বন্ধু হিসেবে তাকে ভ্রান্ত পথে নিয়ে গিয়ে উৎপীড়নের ফলে তার অধঃপতন ঘটায়। আবার জনক কর্ম যুদ্ধে জড়িত, উপস্তম্ভক কর্ম এসে তাকে বিপক্ষ দলের অনেক সৈন্যকে হত্যা করতে সহায়তা করছিল। সেই সময় কুশল উৎপীড়ক এসে উপস্তম্ভক অকুশল কর্মকে বাধা দিয়ে জনক কর্মকে যুদ্ধে পরাজিত করল। এই ভাবে সমগ্র পৃথিবীর জীবকুল পার্থিব জীবনে কুশল ও অকুশল কর্মে বাধার সম্মখীন হন। এর মূলে রয়েছে উপস্তম্ভক ও উৎপীড়ক এই দুই বিরুদ্ধবাদী কর্ম শক্তির দ্বন্দ্ব সংঘাত। উপস্তম্ভক, উৎপীড়ক ও উপঘাতক কর্মই আমাদের জীবনের সক্রিয় অংশ। এই সক্রিয় অংশ অতীতের সংস্কারের প্রভাবে যেমন শক্তিশালী, দূর্বল বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় তেমনি কর্মভবের প্রভাবেও দুর্বল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তাই সর্বক্ষেত্রে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে কর্মভবের প্রভাবে ও দুর্বল ও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাই সর্বক্ষেত্রে এই উপদেশ দেওয়া হয়েছে কর্মভবে জীবকে তার অতীত জীবনের কুশল কর্মের মত সব সময় কুশল কর্ম সম্পাদন করে শক্তিশালী করবে, কুশল কর্মের বৃদ্ধি সাধন করবে। এটি কর্ম যোগে নামে পরিচিতি। কুশল কর্মের বৃদ্ধি, অকুশল কর্মের বিরতিই হলো ধর্ম জীবনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে।[৮]

গুরুকর্ম

গুরুতর বা শক্তিশালী বলেই এই কর্মকে গুরুকর্ম বলা হয়। গুরু কর্ম কুশল ও অকুশল ভেদে হয়ে থাকে। এই কর্ম নতুন জন্মে সর্ব প্রথম ফল প্রদান করে। গুরু কর্ম ইহজন্ম ও পরজন্ম উভয় জন্মেই ফল প্রদান করে থাকে। ইহজন্মে ফল প্রদান যদি না করতে পারে তাহলে পরবর্তী জন্মে তার ফল অবশ্যই পেতে হয়। কুশল ও অকুশল ভেদে গুরুকর্মের উদাহরণ নিম্নরূপ :

ক. কুশল গুরুকর্ম

১ম ধ্যান, ২য় ধ্যান, ৩য় ধ্যান, ৪র্থ ধ্যান, আকাশনন্তয়েতন, বিজ্ঞানানন্তায়তন, আকিঞ্চনায়তন এবং নৈবসংজ্ঞা না, সংজ্ঞায়তন এই অষ্ট সমাপত্তি ধ্যান চিত্তকে কুশল গুরুকর্ম বলে। যথাবিধি সাধারণ চিত্ত যখন ধ্যান বা সাধনার প্রভাবে চার রূপ ব্রহ্ম ও চার অরূপ ব্রহ্ম লোকের কোনো চিত্তে উন্নত হয় তখন এটি ধ্যান চিত্তে কুশল গুরুকর্মে পরিণত হয়। এই আট প্রকার ধ্যানের মধ্যে যে কোন একটি ধ্যান ও যদি কোনো ব্যক্তি লাভ করতে পারে তাহলে মৃত্যুর পর শক্তি অনুযায়ী ব্রহ্মলোক অথবা দেবলোকে পুনঃজন্ম প্রাপ্ত হয়। এই কুশল গুরুকর্ম দ্বারা মানুষের সুগতি নিশ্চিত হয়।

খ. অকুশল গুরুকর্ম

গুরুত্ব অনুসারে অকুশল গুরু কর্ম ৫ প্রকার। মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, অর্হৎ হত্যা, সংঘভেদ, দ্বেষ চিত্তে বুদ্ধের প্রতি দৈহিক আঘাত এই অকুশল কর্মকে অকুশল গুরুকর্ম বলা হয়। নিয়ত মিথ্যা দৃষ্টিকে ও অকুশল গুরকর্ম রূপে ধরা যায়। এ কর্মকে অনন্তরীয়ক বলে কারণ এই সকল কর্মের ফল পরজন্মে অবশ্যই ভোগ করতেই হবে। মৃত্যুর সাথে সাথে তার নরকবাস নিশ্চিত হবে। এ জন্মে তার শত চেষ্টা করলেও ধ্যান চিত্ত উৎপাদন কিংবা নরক গমন প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। কুশল গুরু কর্ম কোনো কারণে নর্ষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ও অকুশল গুরু কর্মকে কোন ক্রমেই খণ্ডন করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি কুশল গুরুকর্ম করে বা ধ্যান উৎপন্ন করেও যে কোনো একটি অকুশল গুরুকর্ম সম্পাদন করে তাহলে ধ্যানের উৎপত্তি কারণে তার যে পুণ্য সঞ্চয় হয়েছিল তা নিকৃষ্ট কর্মের কারণে নষ্ট হয়ে যাবে। ধ্যান লাভ করা সত্ত্বেও পরবর্তী জন্ম অকুশল কর্মের দ্বারা নির্ণয় করা হবে। দেবদত্ত বুদ্ধকে আঘাত ও সংঘভেদ জনিত অকুশল গুরু কর্ম সম্পাদন করায়, ইহ জন্মেই তিনি তার ধ্যানলব্ধ ঋদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং মৃত্যুর সাথে সাথে অবীচি নরকে নারকীয় প্রাণীরূপে পুনঃজন্ম প্রাপ্ত হয়েছিল। এই কর্মের কারণে অন্য কুশলাকুশল কর্ম চ্যুতিক্ষণে বিপাক দানে অসমর্থ।

আসন্ন/মরণাসন্ন কর্ম

আসন্ন কর্ম হলো মানুষের মৃত্যু ঠিক পূর্ব মুহূর্তের কুশল ও অকুশল কর্ম চেতনা। কোনো বহু পাপী ব্যক্তিও যদি ঠিক মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে স্বর্গ বা কুশল কর্মের কথা চিন্তা করেন তাহলে সেই কর্ম চেতনায় তার স্বর্গে পুনঃজন্ম

হয়। অপরপক্ষে বহু কুশল কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বক্ষণে অকুশল কর্মের কথা স্মরণ করেন তাহলে সেই কর্মচেতনা তাকে নরকে পুনঃজন্ম দান করেন। পরবর্তী জীবনকে সুখময়রূপে নির্দিষ্ট করার জন্য বৌদ্ধ দেশসমূহে এখনও কোন মরণাপন্ন ব্যক্তিকে তার পূর্বের কুশল কর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এবং মৃত্যু শয্যায় তার মাধ্যমে কুশল কর্ম সম্পাদন করা হয়।

মধুঅঙ্গন গ্রামে একজন মৎস্য ব্যাধ বাস করত। সে পঞ্চাশ বছর শুধু এ কর্মেই জীবনযাপন করতেছিল। এক সময় তার উপর মৃত্যুর ঘনকৃষ্ণছায়া পতিত হল। সেই সময় গিরিবিহার বাসী তিষ্য স্থবির চিন্তা করলেন, এই ব্যাধের এখনই মৃত্যুর পর মহানরকে পতিত হবে আমিই এর একমাত্র আশ্রয় এই চিন্তা করে তিনি তখনই বিহার ত্যাগ করে ব্যাধের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। ব্যাধের স্ত্রী ব্যাধকে বললেন ওগো, দেখ, আর্য্য স্থবির আমাদের গৃহ প্রাঙ্গনে এসেছেন। সে বলল, আমি দীর্ঘ জীবন কেবল পাপই করেছি। কোন দিন বিহারে যাই নাই, শীল গ্রহণ করি নাই, দান-ধর্ম, করি নাই। স্থবির আমার কোন গুণে এখানে আসবে না? স্থবির বাড়িতে প্রবেশ করে বললেন, উপাসক, এখন শ্রদ্ধা উৎপন্ন করে পঞ্চশীল গ্রহণ করতে পারবে? সে স্থবিরকে দেখেই প্রসন্ন ও শ্রদ্ধান্বিত হলো, কিছুক্ষণের জন্য কৃত দুষ্কৃতি তিনি ভুলে গেলেন। তার মনে শুভবুদ্ধির উদয় হল। সে স্বীকৃত হলে, স্থবির শীল প্রদান করতে গিয়ে বললেন-"পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিয়ামি।" সে স্থবিরের কথা মতো বললো, পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং" কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার জিহ্বা ভূমিতলে পতিত হয়ে যে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হলো। কিন্তু কি সৌভাগ্য যার নরকের বিভীষিকায় উত্তপ্ত হওয়ার কথা, সে তৎক্ষণাৎ চতুর্থহারাজিক দেবলোকে দেবপুত্ররূপে ঔপপাতিক জন্ম পরিগ্রহ করে দিব্য পঞ্চকামগুণে পরিতোষিত হতে লাগলো। স্থবির চিন্তা করলেন, বেশ হয়েছে উপাসক দেবত্ব লাভ করল। যদি পঞ্চশীল পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে পারত তা হলে উপরি উপরি স্বর্গেই দিব্য পঞ্চকামে পরিতৃপ্তি লাভ করত। চিত্ত প্রসাদকর আসন্ন কর্ম এমনই সুখকর।[৯] তার মানে এই নয় যে, তিনি তার পূর্বজন্মে, অকুশল কর্ম হতে অব্যাহতি পাবেন।

অপরপক্ষে কোনো ধার্মিক ব্যক্তিরও দুঃখবহ মৃত্যু হতে পারে যদি তার মৃত্যুক্ষণে অপ্রত্যাশিত ভাবে তার কোন পূর্বকৃত অকুশল কর্মের কথা স্মরণ হয় বা মৃত্যুক্ষণে কোনো অকুশল বিষয় চিত্তে উদিত হয়। কোশলরাজ প্রসেনজিতের প্রধান স্ত্রী রানী মল্লিকা দেবী ধর্ম জীবন যাপন করতেন। কিন্তু তার মৃত্যুর ঠিক আগে তিনি কোন সময়ে যে একটি মিথ্যা কথা বলেন তা মনে আসে অপ্রত্যাশিত ভাবে। এর কারণে মৃত্যুর পর এক সপ্তাহ তাকে অপায় দুর্গতি ভোগ করতে হয়। নরক ভোগ করতে হয়। তবে উক্ত ঘটনাগুলি হচ্ছে ব্যতিক্রম মূলক দৃষ্টান্ত। এরূপ বিবর্তনমূলক জন্মান্তর গ্রহণের ঘটনায় ধার্মিক শিশু অধার্মিক এবং অধার্মিক শিশু ধার্মিক পিতা মাতার নিকট জন্মগ্রহণ করতে পারে। কর্ম নিয়ম অনুসারে জীবনের অন্তিম চিত্তবীথি (মৃত্যুবীথি) ব্যক্তির সাধারণ চরিত্রানুযায়ীই প্রবাহিত হয়।[১০]

আচরিত কর্ম

যে জাতীয় কর্ম কোনো ব্যক্তি সারাজীবন ব্যাপী সম্পাদন করে থাকে, সে কর্ম কুশল হোক বা অকুশল হোক যে কর্ম তার স্বভাবে পরিণত হয় তাকে আচরিত কর্ম বলে। এই জাতীয় কর্মের প্রতি ব্যক্তির অনুরাগ থাকে এবং অভ্যাসবশত এই কর্ম ব্যক্তি বারবার সম্পাদন করে ও স্মরণ করে। এই কর্ম ব্যক্তির দ্বিতীয় চরিত্র হয়ে দাড়ায়। সাধারণত অবসর সময়ে কোনো ব্যক্তি তার অভ্যাসগত চিন্তায় নিয়োজিত থাকে ও সেই কর্মই করে থাকে। একই ভাবে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও সেই রূপ আচরিত কর্মের কথা ব্যক্তি স্মরণ করে। গুরু বা আসন্ন কর্মের অভাবে এই আচরিত কর্মই অব্যবহিত পরজন্মে ফল প্রদান করে। এজন্যই মহামতি গৌতম বুদ্ধ সকল জীবের প্রতি সর্বদা কুশল কর্ম বার বার সম্পাদন করতে বলেছেন। কুশল কর্মকে জীবনে অভ্যাস ও স্বভাবে পরিণত করতে উপদেশ দিয়েছেন। যদি ভুলে ও কখনো অকুশল কর্ম সম্পাদিত হয় তা আর পুনরায় করতে বা অভ্যাসে পরিণত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি সকলকে দৈনন্দিন জীবনে, সকারে ও সন্ধ্যায়, প্রদীপ পূজা, ত্রিরত্নের বন্দনা স্বভাবে পরিণত করতে উপদেশ দিয়েছেন। এই কর্মের ফলাফল সর্বদাই মানুষকে সুপথে পরিচালিত করে। এই আচরিত কর্মই সকলকে সুগতি ভূমিতে পুনঃজন্ম দান করবে।

জন্য বুদ্ধ সকল মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় উপদেশ দিয়ে বলেন :

পুঞ্ঞঞ্চে পুরিসো কয়িরা কয়িরাথেনং পুনপ্পুনং,
তমহি ছন্দং করিয়াথ,সুখো পুঞ্ঞস্স উচ্চয়ো।
পাপঞ্চে পুরিসো কয়িরা ন তং কয়িরা পুনপ্পুনং
ন তমহি ছন্দং করিয়াথ দুক্কো পাপস্স উচ্চযো।

অর্থাৎ, যদি কেহ পূণ্যকর্ম করে, তবে যেন তা পুনঃপুন করে, যেন তাতে তার রুচি জন্মায়, কারণ পূণ্যসঞ্চয় সুখকর (ইহলোক পরলোকে পুণ্যসুখ প্রদান করবে) অকুশল কর্ম কদাচ সম্পাদিত হলেও তা পুনঃপুন সম্পাদন করো না। যে অকুশল কর্ম একবার কোনো ও কারণবশত অগত্যা অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে, তৎপ্রতি স্মৃতি উৎপাদনও করো না।[১১]

দুঃখ, দুর্দশা অকুশল কর্মের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অকুশল চিত্ত উৎপন্ন হলে পাপ বৃদ্ধি পায়। যত পাপ কাজের চিন্তা মনে আসবে, ততই মনে পাপ ভাব বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে যিনি যত বেশি কুশল কর্ম করবেন, তিনি তত বেশি লাভবান ও সুখী হবেন। নিত্য দান অনুষ্ঠান, চরিত্রোকর্ষ, সাধনমূলক নীতির অনুশীলন, পৌনঃপৌনিক উপাসনা ইত্যাদি কর্ম কুশল জাতীয় আচরিত কর্মের অন্তর্গত। অপরপক্ষে বড়শিকো মৎস্য শিকার, ব্যাধের পশুবধ, জেলের মাছধরা, নেশাখোরের মাদকদ্রব্য সেবন, দুশ্চরিত্রের ব্যাভিচার ইত্যাদি অকুশল জাতীয় আচরিত কর্ম।[১২]

উপচিত বা কর্তৃত্ব কর্ম

যে সকল কুশলাকুশল কর্ম বর্তমান কিংবা অতীত জন্ম পরম্পরায় ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্রভাবে সম্পাদিত হয়েছে চিত্তগর্ভে বৃহৎকারে জমা হয় তাকেই উপচিত বা কৃতত্ব কর্ম বলা হয়। জীবগণ ইহজীবন ও অতীত জন্মে অনেক রকম কর্ম করে যেগুলো বৃহৎ কর্মশক্তিদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত ঠিক পরবর্তী জন্মে ফলপ্রদান করতে পারে না। কিন্তু এগুলো ক্ষুদ্র হলেও সংখ্যায় বেশি হওয়ার কারণে গুরুকর্ম, আসন্ন কর্ম ও আচরিত কর্মের অভাবে মৃত্যু পথযাত্রী ব্যক্তির নিকট উপচিত কর্ম উপস্থিত হয়ে প্রতিসন্ধিকৃত্য সম্পাদন করে। প্রত্যেক প্রাণীরই বহু প্রাক্তন কর্ম সঞ্চিত থাকে, যার প্রভাবে জন্মান্তর বিবর্তন ঘটে।

গুরুকর্ম, আসন্ন কর্ম ও আচরিত কর্মের বিপাক পরবর্তী জীবনে ফল প্রদান করে। যদি এগুলো ফলদান না করতে পারে, তাহলে উক্ত কর্ম অহোসি কর্মে রূপান্তরিত হয়। এই জন্য এই ফলদানকারী কর্মগুলোকে উপপাদ্য বেদনীয় বা পরবর্তী জীবনে ফল দানকারী বলা হয়। কিন্তু উপচিত কর্মের বিপাক একই সাথে উপপদ্য বেদনীয় ও অপর পর্যায় বেদনীয়। অপর পর্যায় বেদনীয় কর্মের বিপাক যেমন পরবর্তী দ্বিতীয় জন্ম হতে নির্বাণ লাভ পূর্ব পর্যন্ত যে কোন জন্মে ফল প্রদান করতে পারে, তেমনি উপচিত কর্মের বিপাক ও নির্বাণ লাভের পূর্ববর্তী পর্যন্ত যে কোনো জন্ম ফল প্রদান করতে পারে।

বিপাক বা ফলপ্রাপ্তি হিসেবে কর্মের শ্রেণিবিভাগ

দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম

যে কর্মফল বর্তমান জীবনের ভোগ করতে হয় বা যে কৃতকর্ম ইহজীবনেই ফল প্রদান করে তাকে দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্ম বলে। এই ধরনের কর্ম কুশল বা অকুশল যাই হোক, যদি সেগুলো অতি উৎকৃষ্ট বা অতি নিকৃষ্ট হয় তবে এজন্মে ফল অবশ্যই ভোগ করতে হয়। তবে এই কর্মগুলো যদি বিরুদ্ধ কর্মশক্তি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে ইহজীবনে কোনও কারণে ফল দিতে না পারে, তাহলে এই কর্মগুলো নিষ্ফলা হয়ে যায়। অর্থাৎ, এই কর্মগুলো তখন আর ফল প্রদান করতে পারে না।

দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কুশল কর্মের ফল

অতীতে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বড় হয়ে ঋষি প্রবজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি পাঁচশত শিষ্য নিয়ে হিমালয়ের পাদদেশে বাস করতেন। একবার হিমালয়ে ভয়ানক অনাবৃষ্টি হলো। জলাশয়গুলো শুকিয়ে গেল। পানীয় জলের অভাবে পশু-পাখিরা কষ্ট পেতে লাগল। এদের পিপাসা যন্ত্রণা দেখে এক তপস্বীর হৃদয় করুণায় বিগলিত হলো। তিনি একটি গাছ কেটে দ্রোণী তৈরি করলেন। তারপর সেই দ্রোণী জলপূর্ণ করে পশু-পাখিদের পান করতে দিলেন। পরবর্তী এত প্রাণী জল পান করতে এল যে, তপস্বী তাদের জল যোগাতে গিয়ে নিজের কর্তব্যের কথা ভুলেই গেলেন। তিনি নিজের

আহারে জন্য ফল-মূলাদি সংগ্রহ করার সময় পেলেন না। তিনি অনাহারে থেকেও পশু-পাখিদের জন্য জল যোগাতে লাগলেন। তা দেখে পশু-পাখিরা ভাবতে লাগল এই তপস্বী আমাদের জল যোগাবার জন্য নিজের খাবার সংগ্রহের অবসর পাচ্ছেন না। অনাহারে কষ্ট পাচ্ছেন। অতএব, আমরাই তার ব্যবস্থা করব। আমার প্রতিদিন যখন জলপান করতে আসবো, তখন প্রত্যেকেই আমরা তার জন্যে সাধ্যমত ফল নিয়ে আসব। পরদিন থেকে প্রত্যেক পশু-পাখিই নিজের সাধ্যমত ফল আনতে লাগলো। ফলে প্রতিদিন এত ফল আসতে লাগল যে, সেই একজন তপস্বী ত দূরের কথা, আশ্রমের সব শিষ্যরা ও তা খেয়ে শেষ করতে পারত না। তাদের অন্য ফলমূল সংগ্রহ করতে হত না। এই ঘটনা দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, সৎকার্যের কি অদ্ভুত ফল। আমার শিষ্যরা আশ্রমে বসেই প্রচার আহার পাচ্ছে। একজনের পুণ্যকর্মের ফল এতগুলো মানুষ ঘরে বসে আহার পাচ্ছে। তাই বুদ্ধ সকলকে সৎকার্য অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন। এটিই দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কুশল কর্মের একটি চমৎকার উদাহরণ।[১৩]

দৃষ্টধর্ম বেদনীয় অকুশল কর্মের ফল

অতীতে বারণসীতে বোধিসত্ত্ব ধনশালী এক ব্রাহ্মণ কূলে জন্মগ্রহণ করে কুণ্ডল কুমার নাম ধারণ করেন। বর প্রাপ্তির পর তিনি সর্ববিদ্যায় পারদর্শীতা লাভ করেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সংসারী না হয়ে তিনি প্রবজ্যা গ্রহণ করে বন্যফল মূলে জীবনধারণ করতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসী রাজ্যের উদ্যানে প্রবেশ করে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন কলাবু রাজা সুরাপানে মত্ত হয়ে নর্তকীদের নিয়ে সেই উদ্যানে প্রবেশ করলেন। সেখানে তিনি তার প্রিয় নর্তকীর কোলে শয়ন করে, অন্যান্য নর্তকীদের নৃত্যগীত দ্বারা মনোরঞ্জিত হতে থাকলেন। ক্রমেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। তখন নর্তকীরা ভাবলো আমরা যার জন্য গীত-বাদ্য করছি, তিনি তো ঘুমিয়ে গেছেন এখন গীত-বাদ্যের প্রয়োজন কি? তখন তারা বাদ্য যন্ত্রাদি রেখে ফল-পুষ্পাদি পাওয়ার লোভে উদ্যানে প্রবেশ করলেন। বোধিসত্ত্ব সেই সময় শালবৃক্ষের নিচে বসে প্রবজ্যা সুখ অনুভব করছিলেন। রমনীরা ঘুরতে ঘুরতে তাকে দেখতে পেয়ে তার কাছে ধর্মদেশনা শুনতে লাগলেন। এদিকে রাজার ঘুম ভাঙ্গলে তিনি নর্তকীদের কথা জানতে চাইলেন। তখন প্রিয় নর্তকী বললেন : বাকী নর্তকীরা এক তপস্বীর কাছে ধর্মদেশনা শুনছেন এতে রাজা রাগান্বিত হয়ে খড়্গ হাতে তপস্বীর কাছে গেল। কলাবু রাজ বোধিসত্ত্বকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি কোন মতাবলম্বী? বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ! আমি ক্ষান্তিবাদী। মহারাজ ক্ষান্তি সম্পর্কে জানতে চাইলেন? উত্তরে বোধিসত্ত্ব বললেন, লোকে গালি দিলে, প্রহার করলে কিংবা ক্ষতি করলেও মনের যে অক্রোধ ভাব, তাকে ক্ষান্তিবাদি বলে।

বোধিসত্ত্বের ক্ষান্তি পরীক্ষার জন্য রাজা জল্লাদকে ডেবে কন্টক কশা দিয়ে আঘাত করতে বললেন। আঘাত করার পর বোধিসত্ত্বের শরীর দিয়ে রক্তস্রোত ছুটে মাটি লাল হয়ে গেল। তখন রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন,

তিনি কোন মতবাদী। উত্তরে তিনি আবার ক্ষান্তিবাদি বললেন, রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে জল্লাদকে হাত, পা, নাক, কান কেটে ফেরতে বললেন। বোধিসত্ত্বের রক্তে চারপাশে রক্তের স্রোত বইতে লাগলো। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন বোধিসত্ত্ব কোন মতাবলম্বী? একই উত্তর পাওয়ার পর রাজা বোধিসত্ত্বের বক্ষস্থলে পদাঘাত করে প্রস্থান করলেন। এদিকে রাজা উদ্যান থেকে বেরিয়ে বোধিসত্ত্বের দৃষ্টি পথের বাইরে যেতেই তার সামনে মাটি সহসা বিদীর্ণ হয়ে এক বিরাট গহ্বর দেখা দিল। সেই গহ্বরের ভেতর থেকে এক জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসে রাজার দেহটাকে ঘিরে ফেলল। তার কাছে কেউ যেতে পারল না। রাজা সেই অবস্থায় মাটির গর্ভে তলিয়ে গেলেন এবং অবীচি নামক মহানরকে নিক্ষিপ্ত হলেন। তার কর্মফলের শাস্তি তিনি বর্তমান জীবনেই ভোগ করলেন।[১৪]

উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম

জীবের যে সকল কর্ম বর্তমান জীবনে সম্পাদিত হয়ে ঠিক তার পরের জন্মেই ফল প্রদান করে তাকে উপপাদ্য বেদনীয় কর্ম বলে। দৃষ্টধর্ম বেদনীয় কর্মের মত এই কর্মও যদি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বিরুদ্ধ কর্ম শক্তি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে ফল না করতে পারে তবে তার পরবর্তী জন্মে আর ফল প্রদান করতে পারে না বা নিষ্ফলা হয়ে যায়। এই জাতীয় কর্ম যদি কেউ একাধিক বার করে তবে শুধুমাত্র একটিই ফল প্রদান করবে এবং বাকী গুলো ব্যর্থ হবে। যদি কোন ব্যক্তি বহু খারাপ কাজ করে তাহলে তার যে কোন একটির ফল স্বরুপ সে নরক প্রান্ত হবে এবং বাকীগুলো নিষ্ফলা হয়ে যাবে। যদি কোনো ব্যক্তি ১০০জনকে হত্যা করে তবে তার একবারই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। ১০০ জনকে হত্যা করার জন্য তাকে ১০ বার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায় না।

উপপাদ্য বেদনীয় কুশল কর্মের ফল

প্রাচীনকালে বারানসী রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে তিনি সম্পত্তি ও ধন অর্জনে মনোনিবেশ করেন। ধর্মে তার তেমন মন ছিলনা। একদা তিনি পাণ্ডুরোগে আক্রান্ত হোন। বৈদ্যরা তাকে সুস্থ করতে পারলেন না। তার স্ত্রী ও পুত্ররা তখন হতাশ হয়ে পড়ল। বোধিসত্ত্ব তখন ভাবলেন, আমি এই রোগ থেকে মুক্তি লাভ করলে প্রবজ্যা গ্রহণ করব। এরপর তিনি কোন উপকারক দ্রব্য পেয়ে তার প্রভাবে সুস্থতা লাভ করলেন। তারপর তিনি হিমালয় প্রদেশে গিয়ে ঋষি প্রবজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি ধ্যানে মগ্ন হয়ে অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করলেন। তিনি ধ্যান সুখে মত্ত হয়ে ভাবলেন, হায়! এতদিন আমি এই ধ্যানের পরম সুখ হতে বঞ্চিত ছিলাম। তিনি ক্রমেই ধ্যান সাধনায় দেহের অশুচি ভাব উপলব্ধি করলেন। প্রবজ্যার সুখ উপলব্ধি করলেন। সর্বদা ব্রহ্মচিন্তা করতে লাগলেন। ইহজীবনে এই পূণ্যকর্ম সম্পাদনের কারণে ঠিক পরবর্তী জন্মে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হলেন।[১৫]

উপপাদ্য বেদনীয় অকুশল কর্মের ফল

অজাতশত্রু মগধ রাজ্যের হর্ষঙ্ক রাজবংশের রাজা ছিলেন। তার শাসনামলে হর্ষঙ্ক রাজ বংশের শাসন সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। অজাতশত্রু মগধরাজ বিম্বিসার ও কোশল রাজকন্যা কোশল দেবী পুত্র ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ বৌদ্ধ ভিক্ষু দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিম্বিসারকে হত্যার চেষ্টা করেন। বুদ্ধের মতাদর্শী বিম্বিসার এই ঘটনায় পুত্রকে ক্ষমা করে দেন। কিন্তু পুনরায় দেবদত্তের প্ররোচনায় অজাতশত্রু বিম্বিসার ও তার উপদেষ্টা মণ্ডলীকে বন্দি করে নিজেকে মগধের শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, বন্দী অবস্থায় পিতা বিম্বিসারে হাত-পা কেটে তাতে নুন ও অম্ল মাখিয়ে কষ্ট দেন। এটির পর তাকে কয়লার আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করেন। এই শোকে অজাতশত্রুর মাতা কোশল দেবীও মৃত্যুবরণ করেন।

পিতা-মাতার মৃত্যুর পর অনুশোচনায় দগ্ধ অজাতশত্রু শান্তি লাভের আশায় বিভিন্ন ধর্ম উপদেষ্টা ও দার্শনিকের কাছে যান। কিন্তু তাদের উপদেশ শান্তি লাভে তিনি ব্যর্থ হোন। অবশেষে, রাজবৈদ্য জীবকের উপদেশে অজাতশত্রু গৌতম বুদ্ধের শরণাপন্ন হোন এবং বুদ্ধ তাকে ধর্মের পথে নিয়ে আসে। পরবর্তীতে তার দ্বারা বৌদ্ধ ধর্মের প্রভূত উন্নতি সাধন হলেও পিতা হত্যার কারণে মৃত্যুর পরেই নরকে পতিত হয়েছিল।

অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম

যে সমস্ত কর্ম বর্তমান জীবন ও ঠিক পরবর্তী জন্মে ফলদান না করে, তৃতীয় জন্ম থেকে পূর্ণমুক্তি বা নির্বাণ লাভের পূর্ব পর্যন্ত যখনই সময় পায় তখনই ফল প্রদান করে তাকে অপর পর্যায় বেদনীয় কর্ম বলে। এই কর্মগুলো অমোঘ। এই কর্মগুলো পরিপক্কতা লাভ করতে কিছুটা সময় নিলেও যাবতীয় কর্ম থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তৃতীয় জন্ম থেকে যখনই উপযুক্ত সময় পাবে তখনই তারা ফল প্রয়োগ করবে। এমন কোন উৎপীড়ক বা অপঘাতক কর্ম নেই যারা অপর পর্যায় বেদনীয় কর্মকে বাধা প্রদান করতে পারে। এটি অত্যন্ত শক্তিশালী কর্ম। অপর পর্যায় বেদনীয় কর্মের ফল থেকে কারো রক্ষা নেই। তাই 'ধর্মপদ' গ্রন্থের 'পাপ বর্গে' বলা হয়েছে এভাবে :

ন অন্তলিকেখ ন সমুদ্দমজ্ঝে
ন পব্বতানং বিবরং পবিস্‌স।
ন বিজ্জতী সো জগতিপ্পদেসো,
যত্থটিঠতো মুচেয্য পাপকম্মা।।[১৬]

অর্থাৎ, অন্তরীক্ষে, সমুদ্র মধ্যে কিংবা পর্বতবিবরে যেখানেই প্রবেশ করা না কেন, জগতের এমন কোন স্থান নেই যেখানে থেকে পাপ কর্মের ফল ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, অতীত কোনো এক জন্মে অগ্রশাবক মৌদ্গল্লায়ন তার স্ত্রীর প্ররোচনায় বৃদ্ধ অন্ধমাতা পিতাকে নিয়ে বনের মধ্যে নিয়ে গিয়ে অনেক অন্যায়, অত্যাচার ও দুঃখ দুর্দশা দিয়েছিলেন। কথিত আছে, তিনি তাদেরকে হত্যা করেন। এই মহাপাপের ফল তিনি বহুজন্ম পর্যন্ত ভোগ করেন। বুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মহাঋদ্ধি শক্তিমান অগ্রশ্রাবক। তিনি তার ঋদ্ধির প্রভাবে মানুষদের স্বর্গ নরক দেখাতেন, তাই তৎকালীন সময়ে অনেক মানুষ বুদ্ধমত গ্রহণ করে। এর ফলে অন্য ধর্মপ্রচার কারীরা পর্যাপ্ত লাভ সৎকার পেত না। তারা ভাবল যদি মৌদ্গল্লায়নকে হত্যা করা যায়, তাহলে বুদ্ধের প্রভাব কমে যাবে। তাই তারা কিছু ঘাতককে নিযুক্ত করল মৌদ্গল্লায়নকে হত্যার জন্য। ঘাতকরা পরপর দুইদিন মৌদগল্লায়ণকে হত্যা করতে আসলেও তিনি ঋদ্ধি প্রভাবে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু তৃতীয়বারে তিনি বুঝতে পারলেন তার পূর্বজন্মের পাপ কর্মের ফল ভোগ অবশিষ্ট রয়েছে। সেদিন তিনি পালালেন না। ঘাতকরা এসে তাকে হত্যা কর। তার দীর্ঘদিনের পাপকর্মের ফলভোগ সম্পূর্ণ হলো।[১৭]

অতীতের কোন এক জন্মে পচ্চেক বুদ্ধকে নিন্দার ফলে তথাগত বুদ্ধও এক পরিব্রাজকের সুন্দরী স্ত্রী কর্তৃক মিথ্যা অপবাদের স্বীকার হন। আবার অন্য এক অতীত জন্মে বুদ্ধ নিজের স্ত্রীর প্ররোচনায় ছোট বৈমাত্রেয় ভাইকে গভীর বনে পাথর চাপা দিয়ে নির্মম ভাবে হত্যা করেন। এই মহাপাপের ফলে তিনি বহুবার নরক যন্ত্রনা ভোগ করেন। সর্বশেষ জন্মে তিনি স্বয়ং বুদ্ধ হয়েও দেবদত্তের আঘাতে তার পা থেকে রক্ত বের হয়। তার পায়ে পূজ জন্মায় ও তিনি যন্ত্রনা ভোগ করতে থাকেন এবং অবশেষে জীবকের অস্ত্রোপাচারে সুস্থ হন।[১৮] একদিন এক স্ত্রী লোকের অসাবধানতা বশত তার বাড়িতে আগুন লাগলে তিনি একটি জ্বলন্ত কাঠ উপরে দিকে ছুড়ে মারেন। সেই মুহূর্তে এক কাক আকাশে উড়ে যাচ্ছিল। দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই জ্বলন্ত কাঠটি উড়ন্ত কাকের শরীরে লাগে ও কাকটি সাথে সাথে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। বুদ্ধ সর্বজ্ঞ দৃষ্টিতে কাকটির এই শোচনীয় মৃত্যুর কারণ বলতে গিয়ে তার অতীত জীবন দেখেন। অতীত কারে বারানসীতে এক কৃষক ছিল। সেই কৃষকের অনেকগুলো পশু ছিল। তার পশুগুলোর মধ্যে একটি গরু ছিল অলস। কৃষক অনেক চেষ্টার মাধ্যমেও সেই গরুকে দিয়ে কিছু করাতে পারত না। কাজ করার সময় গরুটি শুয়ে থাকত। মাঝে মাঝে তাকে বারির মাধ্যমে উঠাতে পারলেও উঠার সাথে সাথেই আবার শুয়ে থাকত। একদিন কৃষক প্রচণ্ড রাগান্বিত হয়ে সেই গরুর উপর খড়-তৃণ দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। ফলে অগ্নিদগ্ধ হয়ে গরুটি সাথে সাথে মারা যায়। এই মহাদুষ্কর্মের ফল শ্রুতিতে জন্ম জন্মান্তর দুর্বিপাক ভোগ করে। পরিশেষে কাক জন্মে তার বিপাক ভোগ ক্ষয়ে সমাপ্তি ঘটে। এই কাক ছিল সেই দুষ্কর্মা কৃষক।[১৯] এ সকল কর্ম আপন বলবত্তায় ভবিষ্যতে যখন সুযোগ পায়, তখনই ফলদান করে। যতদিন পর্যন্ত এটি ফল প্রদান করতে না পারে ততদিন পর্যন্ত এটি নিষ্ফল হওয়ার সুযোগ নেই।

অহোসি কর্ম

অতীতে সমাদৃত ফলদানে অসমর্থ কর্মকেই অহোসি কর্ম বলে। অসংখ্য কৃতকর্মের মাঝে যে সকল কর্ম তাদের দুর্বলতার কারণে ফল প্রদান করতে পারে না অথবা বিরুদ্ধ কর্ম শক্তির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ফল প্রদানে অক্ষম হয়ে যায় তাকেই অহোসি কর্ম বলা হয়। পূর্বোক্ত দৃষ্টধর্ম বেদনীয় ও উপপাদ্য কর্ম যখন উৎপীড়ক কর্ম বা উপঘাতক কর্ম দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়ে নিষ্ফলা হয়ে যায় এভাবে অপর পর্যায় বেদনীয় ও কয়েকটি গুরু কর্ম বাদে অপর সকল কর্মই অহোসি হতে পারে। শুধু অপর পর্যায় বেদনীয় ও গুরুকর্ম অহোসি কর্ম নয়। এগুলো যে কোন ভাবে তাদের ফল প্রদান করবেই। এই ১২ প্রকার কর্মের শ্রেণিবিভাগ ছাড়াও বিপাক বা ফল প্রদানের স্থান অনুসারে কর্ম আরও ৪ প্রকার যথা :১. অকুশল কর্ম ২. কামাবচর ফলদ কুশল কর্ম ৩. রূপাবচর ফলদ কুশল কর্ম ৪. অরূপাবচর ফলদ কুশল কর্ম। নিম্নে কর্মগুলো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

অকুশল কর্ম :

যে সকল পাপকর্ম প্রাণীগণকে তাদের মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে চার প্রকার কাম দুর্গতি ভূমিতে উৎপন্ন করে তাকেই অকুশল কর্ম বলে। অকুশল কর্ম তিন ভাগে মোট ১০ প্রকার। যথা :কায়িক অকুশল (প্রাণীহত্যা, চুরি ও ব্যভিচার), বাচনিক অকুশল (মিথ্যা কথা, কটু কথা, ভেদ ও বৃথা বাক্য বলা) মানসিক অকুশল (লোভ, হিংসা ও মিথ্যাদৃষ্টি)

কামাবচর ফলদ কুশল কর্ম

যে সকল সুকর্মের প্রভাবে জীবগন মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে ছয় প্রকার কাম সগতি ভূমিতে উৎপন্ন হয় তাকে কামাবচর ফলদ কুশল কর্ম বলে। ছয় প্রকার কাম সগতি ভূমি বা ছয় স্বর্গগুলো হলো ১. চতুর্মহারাজিক ২. তাবতিংস ৩. যাম ৪) তুষিত ৫. নির্মাণরতি ৬. পরনির্মিত বশবর্তী স্বর্গলোক ও মনুষ্যলোক।

এই কুশল কর্মগুলো দশ প্রকার যা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এই দশ প্রকার কুশল কর্মগুলো হলো : ১. দান ২. শীল ৩. ভাবনা ৪. অপচায়ণ ৫. মাতা পিতার সেবা ও পরিচর্যা করা ৬. পূণ্যদান ৭. পূণ্যানুমোদন ৮. ধর্মশ্রবণ ৯. ধর্মোপদেশ দান ১০. দৃষ্টিঋজু কর্ম।

রূপাবচর ফলদ কুশল কর্ম

মৃত্যুর পরবর্তীতে যে সকল কর্ম সত্ত্বগণকে রূপ লোকের ১৬টি ভূমিতে জন্মধারনের ফল প্রদান করে তাকে রূপারচর ফলদ কুশল কর্ম বলে। সমাধি ভাবনার মাধ্যমে এই কর্ম করা হয়। ১৬টি রূপ লোক হচ্ছে :১. ব্রহ্ম পরিষদ ২. ব্রহ্ম পুরোহিত ৩. মহাব্রহ্মা ৪) পরিত্তাভ ৫. অপ্রমাণাভ ৬. আভস্বর ৭. পরিত্তশুভ ৮. অপ্রমাণ শুভ ৯. শুভাকীর্ণ ১০. বৃহৎফল ১১ অসংজ্ঞসত্ত্ব ১২. অবৃহা ১৩. অতপ্ত ১৪. সুদর্শ ১৫. সদর্শী ১৬. অকনিষ্ঠ।

অরূপাবচর ফলদ কুশল কর্ম

যে সকল সৎকর্ম বা কুশল কর্ম অরূপ লোকের ৪টি ভূমিতে প্রাণীগণকে জন্মগ্রহণ করতে সক্ষম, সেগুলোই অরূপাবচর ফলদ কুশল কর্ম নামে পরিচিত। অরূপলোকের ৪টি ভূমি হচ্ছে ১. আকাশ অন্ত আয়তন ২. বিজ্ঞান অনন্ত আয়তন ৩. আকিঞ্চন আয়তন ৪. নৈব সংজ্ঞা না সংজ্ঞা আয়তন। এ কর্মগুলো ও অরূপ সমাধি ভাবনা কর্ম।[২০]

কর্মবাদ বৌদ্ধ দর্শনের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বৌদ্ধ দর্শনের প্রায় সবক্ষেত্রে কর্মবাদের আলোচনা ও কর্মবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণী জগতের ভেদাভেদের কারণ ও হচ্ছে কর্ম। প্রাণীজগতের প্রত্যেক প্রাণীরই সুখ-দুঃখ ভোগ হয় এই কর্মেরই কারণে। কুশল ও অকুশল ভেদে এই প্রাণীজগৎ চলমান রয়েছে।

উপরি-উক্ত কর্মের শ্রেণিবিভাজনে আমরা কুশল কর্মের ফলাফল ও অকুশল কর্মের ও ফলাফল দেখতে পাই। কর্ম কীভাবে ফল প্রদান করে তাও জানতে পারি। আবার সেই কর্মই কীভাবে নিষ্ফল হয়ে যায় তা দেখতে পাই। কুশল কর্মে সবারই উদ্দীপন, জাগরণ হওয়া উচিত। অকুশল কর্ম পরিহার করা উচিত। কুশল কর্মই মানুষকে সবাইকে মহীয়ান করে তোলে।

তথ্য নির্দেশিকা

১. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা :বাংলা একাডেমি, ২০০০), পৃ. ১২

২. ড. প্রিয় নাথ বড়ুয়া, *কার্যকারণনীতি* (চট্টগ্রাম : ২০০৭), পৃ. ১৭১

৩. জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ. ৫০

৪. শান্তি ভূষণ চাকমা, *বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন* (রাঙ্গামাটি:২০০০), পৃ. ৮২

৫. ড.সুকোমল চৌধুরী, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* (কলিকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৯৭), পৃ. ১৩৬-১৩৭

৬. *কর্ম্মতত্ত্ব*, শ্রী জ্যোতিপাল মহাথের (কুমিল্লা: ১৯৭৯), পৃ. ২৫-২৭

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

৮. *বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫

৯. আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন* (কলিকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী), ২০১০, পৃ. ১১৫

১০. *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০

১১. শ্রী চারচন্দ্র বসু, *ধম্মপদ (*কলকাতা: ১৯০৪), পৃ. ৭৫-৭৬

১২. *কর্ম্মতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, ৩৯

১৩. পবিত্র ত্রিপিটক, শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে জাতক*, প্রথম খণ্ড (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭) পৃ. ৪৬১-৪৬৩

১৪. পবিত্র ত্রিপিটক, শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে জাতক*, তৃতীয় খণ্ড (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি ২০১৭), পৃ. ৭১-৭৫

১৫. *জাতক সমগ্র*, সুধাংশু রঞ্জন ঘোষ (কলকাতা :কামিনী প্রকাশালয়, ২০১৪), পৃ. ২৩১

১৬. পবিত্র ত্রিপিটক, শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, খুদ্দক নিকায়ে ধর্মপদ (বাংলাদেশ : ১৯৫৪, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭), পৃ. ১৩০

১৭. *বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১৮. ড.জগন্নাথ বড়ুয়া, *গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন ও ধর্মদর্শন* (ঢাকা : নররাগ প্রকাশনী, ২০১৪), পৃ. ২৪১

১৯. *কর্ম্মতত্ত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

২০. *গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন ও ধর্মদর্শন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪-২৪৫

চতুর্থ অধ্যায়

জাতক সাহিত্যে বর্ণিত কর্মবাদ তত্ত্বঃ একটি পর্যালোচনা

'জাতক' শব্দের অর্থ জন্মগ্রহণকারী। জাতক হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের ভাষিত অতীত জন্মের কথা ও কাহিনি। মহামতি বুদ্ধত্ব লাভের পর জাতিস্মরতা লাভ করে অতীত জন্ম কথা মনে করতে পারতেন। পরবর্তীতে তিনি এই সব ঘটনা শুনিয়ে তাদের ধর্মোপদেশ দান করতেন। কর্ম সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। কুশল কর্মের উপযোগীতা ব্যাখ্যা করতেন। সকলের চরিত্রের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করতেন ও সকলকে কুশল কর্মে উৎসাহ প্রদান করতেন।

জাতক

ত্রিপিটকের অন্তর্গত সুত্রপিটকের খুদ্দক নিকায়ের অন্যতম গ্রন্থ হলো জাতক। বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে, শুধুমাত্র এক জন্মের কর্মফলে কেউ সম্যক বুদ্ধ হতে পারেন না। বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব অর্থাৎ, বুদ্ধাঙ্কুর রূপে কোটিকল্পকাল ধরে পশু পাখি, মানুষ, দেবতা প্রভৃতি নানা জাতীয় অসংখ্য যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই সকল জন্মে দান, মৈত্রী, অহিংসা প্রভৃতির অনুষ্ঠান দ্বারা ক্রমান্বয়ে অমিত প্রজ্ঞা ও বিভূতি লাভ করে সম্যক বুদ্ধ হোন। তিনি তার পূর্ব জীবনের ঘটনা বলে মানুষের চারিত্রিক উন্নতি সাধনের মাধ্যমে তাদের নির্বাণের পথে নিয়ে যেতেন। পৃথিবী ধর্ম সাহিত্যে যতো গল্পামৃত আছে, তাদের মধ্যে জাতকের অবস্থান অন্যতম। জাতকের গল্পগুলো কর্মবাদ, মানবিক নীতি কথার মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়েছে ও মানুষের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি করা হয়েছে। গল্পগুলোর চমৎকারিত্বে, চরিত্র চিত্রণের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনবোধের গভীরতায় অসাধারণ হয়ে উঠেছে জাতকের গল্পগুলো। আড়াই হাজার বছর পূর্বের গল্পগুলো আজ ও নৈতিক ও মানবিক আবেদনে দেশ-কালের সীমানা অতিক্রম করে আজ এক অমিত প্রভাব তাৎপর্যে ভাস্বর হয়ে রয়েছে।[১]

খ্রিষ্টিয় পঞ্চম শতকে বুদ্ধঘোষ যে "জাতকত্থবন্ননা" নামক যে গ্রন্থ রচনা করেন তাতে ৫৪৭টি জাতক অন্তর্ভূক্ত ছিল। এবং তের শতক বছর পর আঠার শতকে অধ্যাপক ফৌজবল লন্ডন পাবলিশিং বুক সোসাইটির উদ্যোগে ইংরেজি অনুবাদ সহ ছয় খণ্ডে যে জাতক গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন তাতেও জাতক সংখ্যা ছিল ৫৪৭টি। কিন্তু ত্রিপিটকের সুত্তপিটকে উল্লেখ আছে মহামতি ৫৫০ জন্ম পরিগ্রহ করেন। সেই মতে জাতকের সংখ্যা হওয়া উচিত ৫৫০ টি।

জাতকের গল্পগুলো অনেক কাল পর্যন্ত গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শ্রুতি থেকে স্মৃতিতে সংরক্ষিত ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায়, তৃতীয় মহাসঙ্গীতির সময় গ্রন্থকারে লিপিবদ্ধ হয় জাতক। পালি ভাষাতে তখন লিখিত হলেও গ্রন্থের জনপ্রিয়তার কারণে বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়। বাংলা ভাষায় জাতক অনুবাদ করেন শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ। তার অক্লান্ত পরিশ্রমে ছয়ে খন্ডে বিভক্ত জাতকটি ষোল বছরে অনূদিত ও সম্পাদিত হয়।[২]

জাতকের বিভাগ

প্রত্যেক জাতকের তিনটি প্রধান ভাগ থাকে। এগুলো প্রত্যুৎপন্নবস্তু, অতীত বস্তু ও সমাধান। বর্তমান ঘটনাকে বলা হয়, "প্রত্যুৎপন্ন বস্তু"। বুদ্ধ গল্পটি কোথায়, কাকে উদ্দেশ বা উপলক্ষ করে বলেছেন এবং তৎকালীন স্থান, কাল, পাত্র সম্পর্কে যে ঘটনার সমাবেশ তাকেই প্রত্যুৎপন্ন বস্তু বলে। প্রত্যুৎপন্ন বস্তুকে জাতকের সূচনা বা ভূমিকা বলা হয়। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাকে উপলক্ষ্য করে মহামতি মূল জাতকটির অবতারণা করেন। এই মূল জাতকটিই অতীত জীবনের কাহিনি শিষ্যদের কাছে বলেন। অতীত জীবনের সাথে বর্তমান জীবনের সম্পর্ক স্থাপন অর্থ্যাৎ অতীত জীবনে যিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন তিনিই বর্তমানের বুদ্ধ। অতীত জীবনের সাথে বর্তমান জীবনের সম্পর্ক স্থাপনই হলো সমাধান।[৩]

জাতকের শিক্ষনীয় কাহিনি

জাতকের কাহিনিগুলো অত্যন্ত শিক্ষনীয় এবং সমসাময়িক যুগ ও সমাজের পটভূমিকায় রচিত হওয়ায় সেই কাহিনিগুলো সেই যুগ ও সমাজের অনন্যসাধারণ প্রতিচ্ছবি। বুদ্ধ প্রতিটি কাহিনিতেই কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন। প্রতিটি কাহিনিই কোন না কোন পরিস্থিতি বিবেচনায় উচ্চারিত হয়েছে। মহামতি বুদ্ধ "মহাধম্মপাল জাতক"শুনিয়ে তার পিতাকে স্বধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন। স্পন্দন জাতক দদ্দভ জাতক, লটুকিভ জাতক, বৃক্ষধর্ম জাতক ও সম্মোদমন জাতক এই পাঁচটি জাতক শুনিয়ে শাক্য ও কোলিয়দের দীর্ঘদিনের বিরোধ মিটিয়েছিলেন। যশোধরাকে "চন্দ্রকিন্নর জাতক" শুনিয়ে পতিব্রত ধর্ম যে পূর্বজন্ম সংস্কার তা বুঝিয়ে ছিলেন।[৪]

জাতকের কাহিনিগুলোতে আমরা বুদ্ধের বিভিন্ন জন্মের বিভিন্ন রূপ দেখতে পাই। তিনি কখনো মানুষ আবার কখনো পশু ও পাখিরূপে ও জন্ম নেন। আমরা জাতকের গল্পে পাই যে, তিনি যে জন্মে যে রূপেই জন্মগ্রহণ করেছেন না কেন, তার কর্মের দ্বারা সেই জন্মেই কারো না কারো উপকারের কারণ হয়েছেন। তিনি সেই জন্মে মানুষকে সুকর্ম ও দুষ্কর্মের শিক্ষা দিয়েছেন। কোন কর্মের কি ফলাফল তা দেখিয়েছেন। তিনি কয়েকটি বিশেষ চরিত্রে কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠী, ভদ্রবর্ণীয়, ব্রাহ্মণ, অগস্ত্য, অপুত্রক, আয়ো, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্ম, বুদ্ধবোধি, অধিসহ্য, গঙ্গাপাল, চন্দ্রসূর্য, দশরথ, কপি, কাক, হংস, হস্তি, ক্ষান্তি, কুম্ভ, কুশ, মহাবোধি, মহাকপি, কিন্নর, মহিষ, মৈত্রীবল, শতপত্র, শক্র, শারত, রুরু, শশ, পদ্মবতী, মধ্যদেবীয়, মৎস্যমৃগ, সূত্রসোম, শ্যাম, সুভাষ, সূতসোম, সুপারগ, বানর, উল্লেখযোগ্য। এ কাহিনিগুলো পাঠে যেমন সৌহার্দ্য, মানবতা, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধ তৈরি হয়, তেমনি একজন আদর্শ ও নৈতিক সম্পন্ন মানুষ হওয়ার জন্য যে সব গুণাবলী প্রয়োজন তার সমস্ত উপকরণ এই জাতকে রয়েছে।

জাতকের কাহিনিগুলোতে বিভিন্ন উপদেশ নির্দেশনা ও আদেশমূলক ভাবে কর্মবাদের আলোচনা করা হয়েছে। জাতকে দশবিধ কুশল কর্ম ও দশবিধ অকুশল কর্মের মাধ্যমে এই আদেশ, নির্দেশ ও উপদেশগুলো বর্ণিত হয়েছে। জাতক গুলি বিস্তারিতভাবে দেখলে দেখা যায়, বৌদ্ধ সংঘের বিভিন্ন সমস্যা ও সংঘবদ্ধ সন্ন্যাস জীবনের বিশেষ দিকগুলো নিয়ে বুদ্ধ জাতক কাহিনি গুলোকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। এই গল্পগুলো পাঠে মন প্রসন্ন ও প্রফুল্লিত হয়। দান, শীল, অহিংসা, মৈত্রী সহ বিভিন্ন নীতি ও উপদেশ মহামতি বুদ্ধ গল্পের ছলে এমন ভাবে মানুষকে বলেছেন যাতে মানুষ একই সাথে ধর্ম ও কর্ম উভয়ের শিক্ষাই পায়। মানুষের মধ্যে দানশীলতা, অহিংসা, মৈত্রী পরায়ণতা ও প্রজ্ঞার ছাপ ফুটে উঠে। মানুষের মধ্যে এমন বোধ জাগ্রত হয় যাতে মানুষ ধর্মের পাশাপাশি কর্মের শিক্ষাও পায়। কুশল ও অকুশল কর্মের মধ্যে পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে ও কুশল কর্মের অনুশীলন করতে পারে, চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং মানুষ নির্বাণের পথে অগ্রসর হতে পারে।

জাতকের অনেক কাহিনি এখন কালের প্রবাহে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। অনেকের মতে জাতকের গল্পগুলো পঞ্চতন্ত্রের বা ঈশপের গল্পের মত। অনেকগুলো আবার হিন্দু পৌরাণিক গল্পের পরিবর্তিত বৌদ্ধরূপ।[৫] নৈতিক শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় হলো জাতক। এতে কাহিনিগুলো থেকে প্রাপ্ত বিষয়সমূহ অবলম্বন করে আদর্শজীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার জন্য জাতক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলে মনে করা হয়। নীতি ও উপদেশের মৌলিক আধার হিসেবে জাতকের সুখ্যাতি সমগ্র বিশেষ বিরাজমান। জাতকের হিতোপদেশমূলক কাহিনিগুলো যেমন ভালো কাজে উৎসাহ যোগায়, উদার চিত্তে দান দিতে শিক্ষা দেয়। তেমনি প্রাণীহত্যা, মিথ্যা বলা, চুরি না করা, ব্যভিচার করা, মাদক দ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। কায়, বাক্য ও মনে সংহত করে। সমাজে থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করতে সাহায্য করে, ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে ও পরমতসহিষ্ণু এবং পর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখায়। সুতরাং, বলা যায় নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের ভূমিকা অপরিসীম।[৬]

জাতকের উপদেশ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। জাতকের কাহিনিগুলো সকলের জন্য সমানভাবে বিধৃত। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোষ্ঠী নির্বিশেষে সকলেই জাতকের অমৃতময় উপদেশাবলী গ্রহণ করতে পারে। এটির হৃদয়গ্রাহী রচনাকেই আস্বাদন করে বাংলা সাহিত্যসহ বিশ্বের অনেক সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। তাই ধর্মের নৈতিকতা ও কর্ম উভয়ের স্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের জাতকের অনুসরণ করা অবশ্যই কর্তব্য।

জাতক সাহিত্যে বর্ণিত কর্মবাদ

জাতক সাহিত্যের আলোচনায় সব সময় দেখা যায়, বুদ্ধ বোধিসত্ত্ব রূপে অতীত জন্মবৃত্তান্ত ও ঘটনাবলি ভাষণের মাধ্যমে কীভাবে মানুষের মাঝে সৎ গুণাবলী অর্জন করা যায় এবং আদর্শ জীভন গঠন করা যায় তার শিক্ষা দিতেন। মহামতি বুদ্ধ কুশল কর্মের সুফল ও অকুশল কর্মের কুফল বোঝানোর জন্য জাতকের কাহিনিগুলো বলতেন। কিভাবে তিনি কুশল কর্ম সম্পাদন করে, অকুশল কর্মের ভয়াবহ রূপ ত্যাগ করে সিদ্ধার্থ গৌতম হয়েছেন। জাতক সাহিত্যে বর্ণিত কর্মবাদ সম্পর্কে এখানে সংক্ষিপ্তাকাওে আলোচনা করা হবে। দশবিধ কুশলের মধ্যে দান-এর ভূমিকা অতুলনীয়। বুদ্ধ তাঁর পূর্ববর্তী অসংখ্য জন্মে অনেক দান ক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। তার এই দান ক্রিয়া সম্পাদনের মাধ্যমে তিনি পরবর্তী জীবনে যথযথ সুফল ভোগ করেছেন। জাতকের অনেকগুলা গল্পে গৌতম বুদ্ধের দানের মহিমার কথা উল্লেখ আছে। তাদের মধ্যে অকীর্তি জাতক, কুরু ধর্মজাতক, শঙ্খ জাতক, নিশি জাতক, খণ্ডহাল জাতক, শিবি জাতক, মহাসুদর্শন জাতক, শশ জাতক, বেসন্তর জাতক উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে শিবি জাতকে দানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপন করেছেন বুদ্ধ। নিম্নে শিবি জাতকে বর্ণিত দানের মহিমা ফুটিয়ে তোলা হলো।

প্রাচীনকালে শিবি রাজ্যের অরিষ্টপুর নগরে মহারাজ শিবি রাজত্ব করতেন। বোধিসত্ত্ব তাঁর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নাম রাখা হয় শিবি কুমার। তক্ষশিলায় বিধিশাস্ত্র শিক্ষা লাভের অসাধারণ কালক্রমে শিবিরাজ্যের মৃত্যুর পর, শিবিকুমার রাজ্যের রাজা হয়ে যথা ধর্মপালন করতে লাগলেন। তিনি দশ প্রকার রাজধর্ম পালন করতেন এবং অত্যন্ত প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। তিনি অত্যাধিক দান শীলও ছিলেন। রাজধানীর চার দ্বারে, মধ্যে এবং প্রাসাদদ্বারে ছয়টি দানশালা নির্মাণ করে প্রতিদিন ছয়লক্ষ মুদ্রা দান করতেন। কিন্তু এত মহাদানে ও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাই তিনি তার দেহের অংশ দান করতে চাইলেন। তিনি তাঁর হৃৎপিন্ড, শরীরের মাংস, রক্ত এমনকি চোখ দান করতেও ইচ্ছুক ছিলেন।

শিবিকুমার একদিন দানশালা পর্যবেক্ষণ করতে বের হলেন। দেবরাজ শক্র তাঁর মনের কথা জানতে পেরে এবং শিবিকুমার সত্যিই তাঁর চোখ দান করবেন কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য অন্ধ জরাগ্রস্থ ব্রাহ্মণের রূপ ধরে রাজার সামনে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ শক্র রাজার কাছে একটি চোখ প্রার্থনা করলেন। কিন্তু দানবৎসল রাজা তাঁর দুইটি চোখই ব্রাহ্মণকে দান করতে চাইলেন। সমস্ত রাজধানীতে ছড়িয়ে পড়ল রাজা দুইটি চক্ষুদান করতে চলেছেন। রাজার প্রিয়পাত্র, রাজধানীবাসী, প্রাসাদবাসী সবাই একত্রিত হলো। সকলের অনুরোধে সেনাপতি রাজাকে চোখ দিতে বারবার নিষেধ করেন। চোখের বদলে রাজভান্ডারের ধন-দৌলত মণিমুক্তা সব দান করতে বললেন। কিন্তু, চোখ দিতে নিষেধ করেন। কিন্তু তিনি সংকল্পে অটল ছিলেন এবং দুইটি চোখ তুলে নেওযার জন্য রাজবৈদ্য সীবককে আদেশ করলেন। সীবক রাজার কঠোর আদেশ পালন

করতে বাধ্য হলেন। তিনি রাজার চোখ তুলে রাজার হাতে দিলেন। রাজা তার চোখ ব্রাহ্মণবেশী শক্রর হাতে তুলে দিয়ে বললেন: "এই চোখ অপেক্ষা আমার কাছে সর্বজ্ঞতার চোখ হাজার গুণে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ।"দেবরাজ শক্র তার চোখ দুটি নিয়ে দেবালোকে চলে গেলেন।

চোখদানের পর রাজা ভাবলেন, যেহেতু তিনি অন্ধ তাই তার আর রাজ্যের প্রয়োজন নেই। তিনি তার আমাত্যদের কাছে রাজ্যের ভার দিয়ে একজন মাত্র চাকর নিয়ে উদ্যানে গিয়ে বাস করতে লাগলেন এবং প্রবজ্যা গ্রহণ করার জন্য মনস্থির করলেন। পালঙ্কে বসিয়ে অন্ধ রাজাকে উদ্যানের পাশে পুকুর পাড়ে নেওয়া হল। রাজা পালঙ্কে বসে একদিন নিজের দানের কথা ভাবতে থাকলেন। এমন সময় দেবরাজ শক্রর আসন উত্তপ্ত হলো। তখণ শক্র তার মনের কথা বুঝতে পেরে তিনি দুইটি চোখই রাজাকে দান করার সংকল্প করলেন। তিনি উদ্যানের পুকুর ঘাটে উপস্থিত হয়ে রাজাকে বর দিতে চাইলন। শিবিরাজ দুই চোখ হারিয়ে অন্ধ হয়ে বাঁচতে চাইলেন না। তাই তিনি মৃত্যু বর চাইলেন। তখন দেবরাজ শক্র রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি কেবল মৃত্যু কামনা করেই মরতে চাও, নাকি অন্ধ বলে মরতে চাও?" রাজা প্রতুত্ত্যরে বললেন, "আমি অন্ধ বলেই মরতে চাই।"

তখন দেবরাজ তাকে সত্যক্রিয়া করতে বললেন। সত্যক্রিয়ার ফলে দুইটি চোখই পাবে বলে আশ্বাস দিলেন দেবরাজ। মানুষ পরলোকে সুখ প্রাপ্তির আশায় দান করে, আবার বর্তমান জীবনে ও ফল লাভের আশায় দান কার্য করে। যাচক একটি চোখ প্রার্থনা করলেও আপনি দুইটি চোখ দিয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং দানের ফলশ্রুতিতেই আবার চোখ পাবে।রাজা সত্যক্রিয়া করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম চোখটি ফিরে পেল এবং ব্রাহ্মণকে একটির পরিবর্তে দুইটি চোখ দান করেছিলেন, এ সত্যক্রিয়ার প্রভাবে দ্বিতীয় চোখটিও ফিরে পেল। দেবরাজ শক্রর আর্শিবাদে তার এই দুই চোখ দিয়ে একশ যোজন দূরে কি আছে তা দেখতে পারবেন। কোন পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল কিছুই বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না তার দৃষ্টি পথে। রাজার চোখ প্রাপ্তির কথা শুনে দলে দলে আত্মীয় স্বজন, প্রজারা উপহার নিয়ে আসতে লাগল এবং রাজাও তাদের দান, শীল, ভাবনাসহ দশবিধ কুশল কর্ম সম্পদন করার উপদেশ দিলেন।[৭]

উপরি-উক্ত জাতকে আমরা দশবিধ কুশলের প্রথম কর্ম দান কর্মের মাহাত্ম্য দেখতে পাই। দান কর্মের ফলে শিবিকুমারের খ্যাতি ইহলোক পরলোক দুই লোকেই তার যশ বিদ্যমান ছিল। দান কর্মের ফলে তিনি যেমন তার আত্মীয় স্বজন, আমাত্যদের কাছে সমাদৃত হয়েছেন, তেমনি তিনি সমাদৃত হয়েছেন দেবলোকে তথা দেবরাজ শক্রর কাছে। চোখ হলো শরীরের এমন একটি মূল্যবান অঙ্গ, যার দর্শনে সমগ্র দেহ সামনের দিকে ধাবিত হয়। যার চোখ নেই, তার জীবন নরকের সমান। এই রকম একটি মূল্যবান অঙ্গ দান করতে রাজা দ্বিধা করেননি। রাজ্য ত্যাগ করেছেন, দুই চোখ দান করেছেন। তাঁর এহেন দান কর্মের ফলে পরবর্তী বহুজন্ম পর

তিনি বুদ্ধ হয়েছেন। মৃত্যুর পর এবং যে দুইটি চোখ ফেরত পেয়েছিলেন তা দ্বারা তিনি একশ যোজন দূর পর্যন্ত দেখতে পারতেন। দান একটি অত্যন্ত মহৎ মানবিক কর্ম। তাই আমাদের উচিত নিঃস্বার্থ ভাবে দান করা। জাতক মতে, ইহকাল ও পরকালে সমৃদ্ধি পেতে হলে আমাদের ও উচিত নিঃস্বার্থ দান করা।

দশবিধ কুশল কর্মের মধ্যে শীলজনিত পূণ্যকর্ম অন্যতম। 'শীল' অর্থ চরিত্র, সদাচার। মহামতি বুদ্ধ চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্য যে সব নিয়মের কথা বলেছেন তাই শীল নামে পরিচিত। কলুষতা মুক্ত ও নির্বাণ অভিমুখী জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে হলে শীলপালন আবশ্যক। মণি মুক্তাদি ভূষণ ব্যতীত রাজাকে যেমন শোভনীয় দেখায় না তেমনি শীল ভূষণ ব্যতীত সৎপুরুষগণের ও শোভা বর্ধন করে না।[৮]

বুদ্ধ শীলপালনের মহিমা সম্পর্কে যেসব জাতকে বলেছেন তাদের মধ্যে মাতৃপোষক জাতক, চম্পেয় জাতক, চূলবোধি জাতক, মহিষ রাজ জাতক, রুরুমৃগরাজ জাতক, মাতঙ্গ জাতক, শীল মীমাংসা জাতক, ধর্ম জাতক, জয়দ্দিস জাতক, শঙ্খপাল জাতক অন্যতম। নিম্নে শীল মীমাংসা জাতকের মাধ্যমে শীলের মাহাত্ম্য তুলে ধরা হলো।

বারণসী রাজ ব্রাহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজপুরোহিত ছিলেন। তিনি দশবিধ কুশল কর্ম সম্পাদনে সব সময় সচেষ্ট থাকতেন। তিনি দান দিতেন এবং নিয়মানুযায়ী পঞ্চশীল পালন করতেন। রাজা তার সম্পাদিত কর্মগুলো পর্যবেক্ষণ করতেন এবং অন্যান্য সব ব্রাহ্মণের চেয়ে তাকে বেশী গুরুত্ব দিতেন এবং সম্মান করতেন। বোধিসত্ত্ব এত সম্মান পেয়ে একদিন ভাবতে লাগলেন, রাজা কেন তাকে অন্য ব্রাহ্মণ অপেক্ষা এতো সম্মান, কদর, শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ করেন? তিনি যে অনুগ্রহ পাচ্ছেন তা কী বংশ মর্যাদা ও বিদ্যা শিক্ষার জন্য নাকি তা সদাচারের জন্য তা তিনি পরীক্ষা করতে চাইলেন। পরীক্ষার অংশ হিসেবে একদিন বোধিসত্ত্ব রাজগৃহ থেকে বাড়িতে ফেরার সময় রাজার ধনপালের ধন ভান্ডার থেকে একটি মুদ্রা না বলে তুলে নিলেন। ঐ ধনপাল তাকে এতো শ্রদ্ধা করতেন যে, তিনি ঘটনাটি দেখতে পেয়েও নীরব থাকলেন।

"পরের দিনও বোধিসত্ত্ব একইভাবে দুইটি মুদ্রা চুরি করলেন। সেদিনও শ্রদ্ধাবশত ধনপাল দেখেও নীরব রইলেন। তৃতীয় দিনও পরীক্ষার অংশ হিসেবে তিনি একমুঠো মুদ্রা তুলে নিলেন। তখন ধনপাল চিৎকার করে বলে উঠলেন, আপনি তিনদিন রাজার সম্পদ চুরি করেছেন। তার পরই আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, চোর ধরেছি, চোর ধরেছি বলে। ধনপালের চিৎকার শুনে চারদিক থেকে অনেক লোক ছুটে এসে জড়ো হল। তারা বলতে লাগল 'কেমন ঠাকুর' তুমি না এতদিন নিজেকে শীলবান বলে পরিচয় দিতে। চল তোমায় রাজার কাছে যাই।' এই বলে তারা সবাই বোধিসত্ত্বকে দড়ি দিয়ে বেঁধে উত্তম মধ্যম দিয়ে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে খুবই ব্যাথিত হলেন। বোধিসত্ত্বকে শীলহীন কাজ করার কারণ জানতে তাকে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ দিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, 'আমি চোর নই মহারাজ।'

রাজা তাকে চোর না হয়েও কেন এ কাজ করলেন, তা জিজ্ঞাসা করলেন। তখন বোধিসত্ত্ব বললেন রাজা আমাকে এত সম্মান দেয় তা আমার বংশ মর্যাদা ও বিদ্যা শিক্ষার জন্য নাকি চরিত্রের গুণের জন্য তা পরীক্ষা করার জন্য। এই পরীক্ষা করার জন্য আমি ধনভান্ডার থেকে মুদ্রা তুলে নিয়েছি। এখন বুঝতে পেরেছি, সদাচারের জন্যই আমার এত সম্মান, বিদ্যাশিক্ষা বা বংশমর্যাদার জন্য নয়। তারপর বোধিসত্ত্ব বললেন, শীলই সর্বশ্রেষ্ঠ এর চাইতে উৎকৃষ্ট আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং আমি এখন শীলবান হবো এবং সবসময় সর্বোচ্চ নিষ্ঠার সাথে শীল পালন করবো।' বোধিসত্ত্ব আবার বললেন, 'আমি বুঝতে পেরেছি শীল হচ্ছে একজন মানুষের জীবনে সর্বোত্তম বস্তু। কিন্তু বাড়িতে বসবাস করে বিষয়ভোগে অভিরত থেকে কিছুতেই প্রকৃত শীলবান হওয়া সম্ভব নয়। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি জেতবনে গিয়ে শাস্তার কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করবো।' রাজার অনুমতিক্রমে বোধিসত্ত্ব তার সকল আত্মীয়-স্বজনের বাধা সত্ত্বেও জেতবনে গেল এবং শাস্তার কাছে প্রার্থনা করে প্রব্রজ্যা লাভ করল। এরপরে যথাসময়ে উপসম্পদা প্রাপ্ত হয়ে ধ্যানের মাধ্যমে ক্রমেই তত্ত্বজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে অর্হত্ত্ব লাভ করল।[৯]

উপরি-উক্ত জাতক কাহিনির মূলকথা হলো শীলবান ব্যক্তির সব জায়গায় সমাদর হয়। বোধিসত্ত্ব তাঁর নৈতিকতা ও সদাচারের জন্য সকলের কাছে প্রশংসিত হোন। শীলের অনুশীলনে তাঁর মনের পরিদাহ নির্বাপিত হয়ে শীতল হয়ে তিনি অর্হত্ত্বলাভ করেছেন। শীলবিহীন বা দুঃশীল ব্যক্তি মৃতপ্রায় ও সর্বক্ষেত্রে অপ্রশংসনীয়। তাই বোধিসত্ত্ব পরীক্ষা নেওয়ার জন্য কিছু সময় তিনি শীলবিহীন আচরণ করায় সাধারণ মানুষের কাছে প্রহৃত হয়েছেন পর্যন্ত। একজন দুঃশীল ব্যক্তি সমাজের নীচুস্তরের প্রাণী হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই বোধিসত্ত্বের দুঃশীল আচরণের জন্য রাজা তাঁকে শাস্তি পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলেন। যাদের কাছে শীলের কারণে তিনি পরম পূজ্য ছিলেন। তাদের কাছেই দুঃশীলের জন্য চূড়ান্ত অপমান হয়েছিলেন। তাই শীলজনিত পূণ্যকর্মের গুরুত্বে আমরা দেখতে পাই যে, যতক্ষণ যিনি শীলব্রত পালন করেবেন ততক্ষণ তিনি সকলের কাছে সমাদৃত হবেন আর যদি কেউ শীলভঙ্গ করে দুঃশীল কর্ম সম্পাদন করতে তখন তার পতন অনিবার্য। শীলপালনে চরিত্রের উৎকর্ষতা সাধিত হয়, মোহে আচ্ছন্ন থাকে না, বিদ্বেষভাব থাকে না, মনে কোনো প্রকার হিংসা উৎপন্ন হয় না, পরিবার ও সমাজে শান্তি বিরাজ করে। তাই আমাদের সকলেরই উচিত শীলজনিত পূণ্যকর্ম সম্পাদন করা।

জাতকের কিছু গল্প আছে যেগুলোতে একই সাথে দান ও শীলের মাহাত্ম্যতা প্রকাশ করা হয়েছে। জাতকগুলোতে কীভাবে দান কর্মের মাধ্যমে শীল পালিত হয়, দান কর্মের ফলাফল, শীলজনিত পূণ্যকর্মের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এমন একটি জাতক হচ্ছে শশ জাতক। নিম্নের গল্পে ঘটনাটিতে দান ও শীলের মাহাত্ম্য আলোচনা করা হলো।

অতীতে বারানসীরাজ ব্রাহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব শশক বা খরগোশ রূপে জন্মগ্রহণ। তিনি এক বনে বাস করতেন। ঐ বনের একদিকে রয়েছে পর্বত, একদিকে গ্রাম ও একদিকে নদী। বোধিসত্ত্বের তিন বন্ধু ছিল। শিয়াল, বানর ও উদবিড়াল। তারা চারজনে গঙ্গার তীরে বসবাস করত। চার জনের মধ্যে শশক ছিলেন সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় তার বন্ধুদের ধর্মোপদেশ দিতেন। তিনি তাদেরকে দান করা উচিত, শীলরক্ষা করা উচিত, উপোসথ পালন করা উচিত এবং এই কুশল কর্মগুলোর উপকারিতা সম্পর্কে ধর্মোপদেশ দান করতেন। এভাবেই দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের সময় অতিবাহিত হচ্ছিল।

একদিন বোধিসত্ত্ব শশক চাঁদ দেখে বুঝলেন, পরদিন পূর্ণিমা। তিনি তার বন্ধুদের উদ্দেশে বললেন, আগামীকাল পূর্ণিমা, তোমরা শীলগ্রহণ করে উপসোথ পালন করবে। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দান করবে। শীলবান ব্যক্তির দান হয় মহাফলদায়ক। কোনো যাচক যদি হাজির হয় তাহলে তোমরা নিজ খাবারের অংশ থেকে খাবার দিবে। বন্ধুরা যথা আজ্ঞা বলে পরদিন যে যার মত খাবারের খোঁজে বের হল।
পরদিন সকালে উদবিড়াল খাদ্যের খোঁজে গঙ্গাতীরে গেল। সেখানে একজন জেলে সাতটি রোহিত মাছ ধরে সেগুলোকে লতার মধ্যে রেকে গঙ্গাতীরে বালির মধ্যে খনন করে সেখানে রেখে দিয়েছিলেন এবং আরও মাছ ধরার জন্য নদীর অন্যপাশে গিয়েছিলেন। উদবিড়াল মাছের সুঘ্রান অনুভব করে সেই জায়গা খনন করল এবং মাছগুলোকে দেখে সেখান থেকে টেনে বের করল। উদবিড়াল তিনবার উচ্চস্বরে মাছটি কার? মাছটি কার? বললেন। কেউ উত্তর না দিলে তিনি ভাবলেন তিনি বৈধ উপায়েই খাদ্য সংগ্রহ করেছেন এবং মাছগুলোকে তার বাস স্থানে নিয়ে গেল। তখনও খাদ্য গ্রহণের সময় হয়নি বলে ‘বেলা হলে খাব, এমন সংকল্প করে শীল ও ভাবনা করতে থাকল।

শিয়াল এক বাড়িতে ঢুকল। সে সেখানে দেখল এক হাড়ি মাংস, মিষ্টি ও এক ভার দই বারান্দায় পড়ে রয়েছে। সে ও তিনবার উচ্চস্বরে এগুলো কার বলল, কেউ উত্তর না দিলে শিয়াল সব খাদ্যগুলো নিয়ে তার বাসস্থানে ফিরে গেল এবং বেলা হলে আহার করব সংকল্প করে শীল ও ভাবনা করতে থাকলেন। বানর ও বনে গিয়ে কয়েকটি আম পেরে নিয়ে, বেলা হলে আহার করব, এই চিন্তা করে শীল ভাবনা করতে লাগল। সবাই সবার খাদ্য সংগ্রহ করলে ও বোধিসত্ত্ব চিন্তায় পড়ে গেল। তিনি চিন্তা করলেন, তার খাদ্য হলো ঘাস। ঘাস তো আর মানুষ খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে না। তাহলে কোন যাচক তার সামনে খাদ্যের জন্য উপস্থিত হলে তিনি কী দিয়ে আপ্যায়ন করাবেন তা নিয়ে চিন্তা করতে থাকলেন। তারপর তিনি এক মহাদানের চিন্তা করলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, কোন যাচক তার সামনে খাদ্যের জন্য উপস্থিত হলে, নিজের শরীরের মাংস পুড়িয়ে তা দিয়ে আপ্যায়ন করাবেন।

দেবরাজ শক্র শশকের মহাসংকল্পের কথা জানতে পারলেন। বোধিসত্ত্বের দান পরীক্ষা করার জন্য দেবরাজ এক ব্রাহ্মণের রূপ ধরে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি একে একে সবার কাছে গেলেন ও দান গ্রহণ করে সর্বশেষে শশকের কাছে উপস্থিত হলেন। দেবরাজ বোধিসত্ত্বের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করলে বোধিসত্ত্ব তাকে বলেন, "আপনি আহারের জন্য আমার কাছে এসে খুব ভালো করেছেন। আমি আপনাকে এরূপ দান করব যা আগে কেউ কখনো দান করেনি। আপনি আগুন প্রজ্জলন করুন। আমি সেই আগুনে ঝাঁপ দিব। আমার শরীর আগুনে সিদ্ধ হলে আপনি সেই মাংস খেয়ে শ্রামণ্য ধর্ম পালন করবেন।"

দেবরাজ শক্র আগুন জ্বালালেন। বোধিসত্ত্ব তার শরীরে কোনো পোকা-মাকড় থাকলে তা যেন পড়ে যায় তাই তিনি তিনবার গা ঝাড়া দিলেন। আগুনে ঝাঁপ দিলেন তিনি। কিন্তু তার শরীরে কোনো তাপ অনুভব করলেন না বরং হিম শীতল ঠান্ডা অনুভব হলো। শশক ব্রাহ্মণকে এই ঘটনার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে দেবরাজ নিজের পরিচয় দিলেন এবং তিনি যে পরীক্ষার জন্য এসেছেন তা বললেন। বোধিসত্ত্ব বললেন, 'বিশ্বব্রহ্মান্ডের যে কেউই আসুক না কেন, তার অবস্থান একই থাকবে। তিনি কখনো দান বিমুখ হবে না।' দেবরাজ শক্র খুব খুশি হলেন এবং তাকে আর্শিবাদ করলেন, তার খ্যাতি সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। দেবরাজ চন্দ্রমহলে একটি শশচিহ্ন অঙ্কন করলেন। যার ফলশ্রুতিতে আমরা এখনও চাঁদে একটি শশকের চিহ্ন দেখি। পরবর্তীতে চারবন্ধু সুখে ও সম্প্রীতিভাবে শীলপালন, দান ও উপোসথ ব্রত ধারণ পূর্বক কর্মানুযায়ী গতি লাভ করলেন।[১০] উপরোক্ত জাতকটি দান, শীল ও ধর্মোপদেশের এক অনন্য উদাহরণ। এই জাতকে দশবিধ কুশল কর্মের তিনটি কুশল কর্ম একই সাথে দেখানো হয়েছে। প্রথমেই ধর্মোপদেশ বা ধর্মদেশনাজনিত কুশল কর্মের ফলে বোধিসত্ত্বের তিন বন্ধু ধর্ম শ্রবণের ফলে তাদের মধ্যে শীল ও দান ভাব একই সাথে জাগ্রত হয়েছে। তার তিন জনই ধর্মশ্রবণের ফলে দানবান ও শীলবান হয়ে পরবর্তীতে যথাযথ গতি প্রাপ্ত বা স্বর্গলাভ করেছে। বোধিসত্ত্ব তার মহাদান, শীল ও ধর্মদেশনার ফলে আজও মানুষ তাকে স্মরণে রেখেছে। তার চিহ্ন আজও চাঁদের বুকে দেখা যায়। এভাবেই তিনি দান, শীল ও ধর্ম দেশনার কারণে সকলের মাঝে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এভাবেই বলা যায়, কর্ম কখনো বৃথা যায় না, কুশল কর্মের ফলাফল সকলে ইহলোক-পরলোক উভয় লোকেই পাওয়া যায়।

দশবিধ কুশল কর্মের মধ্যে ধ্যান বা ভাবনা অন্যতম। অস্থির ও চঞ্চল মন বিভিন্ন অকুশল কর্মের আধার। অস্থির ও চঞ্চল চিত্ত যে কোন সময় ভুল ভ্রান্তি করতে পারে। অস্থির ও চঞ্চল মনকে সমাহিত করার নামই হচ্ছে ভাবনা বা ধ্যান। মানসিক উন্নয়নের জন্য ও চিত্তে প্রশান্তির জন্য ধ্যান বা ভাবনার কোনো বিকল্প নেই। এটির মাধ্যমে যে মানসিক উন্নয়নের ফলে যে প্রকৃত সুখ লাভ করা যায় তা নিম্নে জাতক কাহিনির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো।

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব উদীচ্য ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করেন। কামনাই দুঃখ এবং নিষ্কাম হতে পারাটাই সুখকর এই বিবেচনা স্বরূপ তিনি সকল প্রকার কামনা বাসনা ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যানে সমাহিত চিত্ত হলেন। সেখানে তার ধ্যান সাধনার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করে শত শত শিষ্য তার শিষ্যত্ব বরণ করেন। তার পাঁচশত শিষ্য ছিল। একবার বর্ষাকালে বোধিসত্ত্ব তার সকল শিষ্যকে নিয়ে হিমালয়ে থেকে নামলেন। সেখানে নগর ও জনপদে ভিক্ষা করতে করতে বারানসী উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি রাজার আতিথ্য গ্রহণ করে চারমাস অতিবাহিত করলেন। বিদায় নেওয়ার জন্য তিনি রাজার কাছে গেলেন। রাজা বললেন, আপনি বৃদ্ধ হয়েছেন। এই বয়সে আর হিমালয়ে ফিরে যাবেন কেন? শিষ্যদের হিমালয় আশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে আপনি এখানেই থাকুন।

রাজার অনুরোধে তিনি সেখানে অবস্থান করতে রাজি হলেন। তিনি তার প্রধান শিষ্যকে ডেকে বললেন আমি তোমাকে আমার এই পাঁচশত শিষ্যের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিচ্ছি। বোধিসত্ত্বের এই প্রধান শিষ্য আগে রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্য এবং রাজত্ব ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে, ধ্যান সাধনা করে আট রকম ধ্যান ফলের অধিকারী হোন। তিনি গুরুর আদেশ মান্য করে বাকি শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে যান। সেখানে তপস্বীদের সাথে থাকতে থাকতে একদিন তিনি আচার্যকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেন। তিনি অন্যান্য তপস্বীদের বললেন, তোমরা এখানে ভালভাবে থাকো, আমি আচার্যকে বন্দনা করে আসি। এই বলে তিনি বারাণসীতে উপস্থিত হয়ে আচার্যকে প্রণাম করে তার বন্দনা করলেন। তারপর আচার্যের পাশে একটি মাদুর বিছিয়ে তাতে শুয়ে পড়লেন। ঠিক এই সময় রাজাও সেই তপস্তীর সাথে দেখা করার জন্য উপস্থিত হলেন। তিনি তপস্বীকে বন্দনা করে একপাশে বসলেন।

রাজা এসে তাকে বন্দনা করার পরও তিনি আসন ছেড়ে না উঠে ‘আহা! কী সুখ, আহা! কী সুখ’ বলতে লাগলেন। রাজা ভাবলেন তপস্বী তাকে অবজ্ঞা করছে। তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বোধিসত্ত্বকে বললেন ‘প্রভু এই তপস্বী মনে হয় গলা পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেছেন। তা না হলে শুয়ে থেকে আহা কি সুখ। আহা কি সুখ বলে চিৎকার করছেন কেন?’ বোধিসত্ত্ব বললেন, ‘মহারাজ, এই তপস্বী আগে আপনার মতোই রাজা ছিলেন। কিন্তু এখন ইনি রাজ্য ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে ধ্যানদ্বারা যে সুখ লাভ করেছেন, রাজ্য, ঐশ্বর্য ও সৈন্যসামন্ত পরিবেষ্টিত হয়েও তিনি এই সুখ ভোগ করতে পারে নি। রাজ্য সুখ তার কাছে তুচ্ছ মনে হয়। প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান সমাধির সুখে তিনি এখন সর্বোচ্চ শান্তিতে অবস্থান করছেন। তাই এখন তিনি আবেগের উচ্ছাসে এই কথা বলছেন।’

বোধিসত্ত্ব রাজাকে ধর্মশিক্ষা দেবার জন্য বলতে লাগলেন যার মধ্যে কামনা বাসনা নেই তিনিই প্রকৃত সুখী। তিনি কারো ছায়ায় নিজেকে রক্ষা করার কথা চিন্তাও করেন না। নিজের জন্য কিছু করার চিন্তাও করেন না।

এই ধর্মোপদেশ শুনে রাজা সন্তুষ্ট হলেন। তিনি তপস্বীকে প্রণাম করে প্রাসাদে চলে গেলেন। তপস্বীও আচার্যকে প্রণাম করে হিমালয়ে ফিরে গেলেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীতে রয়ে গেলেন। তিনি পূর্ণজ্ঞানসহ দেহত্যাগ করে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।[১১]

উপরোক্ত কাহিনিটিতে আমরা ভাবনাজনিত পূণ্যকর্মের মাহাত্ম্যতা দেখতে পাই। শুধুমাত্র ভাবনাজনিত পূণ্যকর্মের ফলে তিনি মহাপ্রশান্তিতে ছিলেন। রাজ্য ত্যাগ করে তিনি যে মানসিক শান্তি পেয়েছেন তা তিনি প্রচুর ঐশ্বর্য, সম্পদ, দামী পোশাক, সৈন্য সামন্ত সহকারেও তা পাননি। কোনো কুশল কর্ম করতে হলে মানসিক স্থিরতা সর্বাপেক্ষা জরুরী। মানসিক স্থিরতা থাকলে চারিত্রিক উৎকর্ষতা থাকলে যে কোন কুশল কর্মে নিয়োজিত হওয়া যায় ও সফল হওয়া যায়। একজন ধ্যানী ব্যক্তি সকল প্রকার কামনা বাসনার উর্ধ্বে তার নিজেকে নিয়ে কোন চিন্তা থাকে না । সে কারো অধীনে থাকে না। সে শুধু পরের উপকারের চিন্তাই করে। তেমনি বোধিসত্ত্বের প্রধান শিষ্য ভাবনার বলে যে মানসিক উন্নতি সাধন করেছিলেন তার কাছে রাজা ভোগ, সুখ ঐশ্বর্যের কোন মূল্যায়ণ ছিল না। ভোগে নয়, ত্যাগেই প্রকৃত সুখ। দশবিধ কুশলের মধ্যে সেবাজনিত পূণ্যকর্ম অন্যতম। সেবাজনিত পূণ্যকর্মের মূলকথা হলো পিতা মাতার সেবা, আচার্য ও উপাধ্যায় সেবা, যারা সৎ শিক্ষা দেয়, সৎ উপদেশ দেয়, সৎ উপদেশ দেয়, অন্যান্য গুরু জনেদের সেবা, আর্তজন ও দেশসেবা করা উত্তম মঙ্গল সেবা জনিত পূণ্যকর্মের সুফল স্বরূপ একটি শিক্ষামূলক জাতক কাহিনি তুলে ধরা হলো।

প্রাচীনকালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শকুন হয়ে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বড় হওয়ার পর তিনি তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছিলেন। এক পর্বতের উপরে নির্জন গুহায় তারা বাস করতেন। বোধিসত্ত্ব বারানসীর শ্মশান থেকে মৃত গরুর মাংস এনে বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে খাওয়াতেন। ঐ শ্মশানে এক ব্যাধ প্রায়ই শকুন ধরার জন্য ফাঁদ পেতে রাখতেন। একদিন বোধিসত্ত্ব শ্মশানে মাংস খুঁজতে গিয়ে ফাঁদে আটকা পড়লেন। তখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন আমি ফাঁদে আটকা পড়েছি তাতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমর বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে কে খাওয়াবে? কি খেয়ে তারা জীবনধারণ করবে? খেতে না পারলে তারা পাহাড়ের গুহায় মারা যাবে। এই চিন্তা করার পর তিনি বিলাপ করে বলতে লাগলেন, "নিষ্ঠুর ব্যাধের ফাঁদে আমি আটকা পড়েছি। আমার আর উদ্ধার পাওয়ার আশা নেই। আমার বৃদ্ধ পিতা মাতার কী হবে? তাদের দুর্দশা কে প্রশমিত করবে?"

শকুনের এই কান্না শুনে ব্যাধ উত্তরে বললেন, "কী দুঃখ তোমার, কিসের দুর্দশায় পাখি হয়েও মানুষের ভাষায় এভাবে কথা বলতে আমি এখন পর্যন্ত কাউকে শুনিনি।" শকুন তাকে আবার বললেন, "আমার পিতা মাতা অনেক বৃদ্ধ। আমি তাদের দেখা শোনা ও ভরণ পোষণ করি। কিন্তু এখন আমি তোমার ফাঁদে বন্দি। কে এখন তাদের ভরণ পোষণ করবে?" ব্যাধ পুনরায় উত্তরে বললেন,"শকুনরা আকাশের অনেক উপর থেকে মৃত প্রাণী

দেখতে পায়। কিন্তু তুমি দেখতে পেলে না কেন? তার কারণ কী?" শকুন আবার উত্তর দিলেন, "আয়ু শেষ হলে জীবগন কাছের জিনিসও স্পষ্ট দেখতে পায় না। আমিও সেই রকম ফাঁদ দেখতে পাইনি।" ব্যাধ তখন বললেন, "তুমি নিজের জন্য না ভেবে তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতার কথা ভেবেছ। এই ঘটনায় আমি অভিভূত। সেজন্য আমি তোমাকে ফাঁদ থেকে নিঃশর্ত মুক্তি দিলাম। তুমি নির্ভয়ে যেতে পার, পিতা মাতার সেবা কর।" ব্যাধের এমন হৃদয় গ্রাহী কথা শুনে শকুন পুনরায় বললেন, "তুমি ব্যাধ হয়েও দয়াবান। এজন্য তোমার মঙ্গল হোক। তুমিও তোমার আত্মীয়দের সাথে সুখী হবে। আমি আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার কাছে চললাম।" বোধিসত্ত্বরূপী শকুন মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ব্যাধকে ধন্যবাদ দিয়ে শ্মশান থেকে মুখে মাংস নিয়ে পিতা মাতার কাছে চলে গেলেন।[১২]

উপরোক্ত শিক্ষামূলক জাতকে আমরা সেবাজনিত পূণ্যকর্মের এক চমৎকার উদাহরণ দেখতে পেলাম। কীভাবে বোধিসত্ত্ব শকুন হয়ে জন্মগ্রহণ করে ও তার বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করত তা দেখতে পাই। আজকাল মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করে ও যেখানে বৃদ্ধ বাবা মাকে সেবা না করে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে, সেখানে বোধিসত্ত্ব আজ থেকে কয়েক হাজার বছর আগেই বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। শুধুমাত্র বৃদ্ধ বাবা - মাকে সেবা করার ফলেই তিনি নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বেঁচে ফিরেছেন। আবার তাদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। আমাদেরও উচিত আমাদের পিতামাতা, শিক্ষক, গুরুজনসহ সকলকে শ্রদ্ধা করা ও তাদের প্রয়োজন মতো সেবাজনিত পূণ্য কর্ম করা। তাহলেই সমাজে কোনো অন্যায়, অভিযোগ থাকবে না। মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে ও সমাজ থেকে বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হবে।

দশবিধ কুশল কর্মের পূণ্যদানজনিত পূণ্য কর্ম ও পূণ্যনুমোদন জনিত পূণ্যকর্ম অন্যতম পূণ্য হলো চেতনা বা মনকে সহজ, সরল ও নিষ্কলুশ করা। আর দান হচ্ছে সর্বাঙ্গীন ত্যাগ স্বীকার অন্যের প্রতি উদারতা প্রদর্শন, কোন কিছু কাউকে বিনা শর্তে দিয়ে দেওয়া। কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মনে যে পবিত্রবস্থা বিরাজ করে তখন দেবতা, মানুষসহ সকল প্রানীর ভালো হোক, সুখ হোক, এমন কামনা করা। অন্ন-পান, বস্ত্র, দানীয় বস্তু উপযুক্ত পাত্রে দান করে লব্ধ পূণ্যের অংশ সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করাই পূণ্যদান। আর শুধু দান করলেই হবে না, কাকে দান করা হচ্ছে তার অনুমোদন থাকা চাই। অপরের পূণ্য কাজকে সমর্থন জানানো সাধুবাদ জানানো। প্রশংসা করাকেই পূণ্যাণূমোদন বলে। প্রতিটি প্রাণীরই পূণ্যের প্রয়োজন। সেজন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুশল কর্ম সম্পাদন করে অর্জিত পূণ্যরাশিগুলো সকল প্রাণীর সুখ কামনায়, মঙ্গল কামনায় দান করা অবশ্য কর্তব্য। পূণ্যদান করলে তা না কমে, সময়ের বৃদ্ধির সাথে সাথে তাও বৃদ্ধি পায়। মহামতি বুদ্ধ পূণ্যদান ও পূণ্যনুমোদনের উপকারিতা দেখিয়ে পাটলী গ্রামবাসীদের যে ধর্মোপদেশ দিয়েছিলেন তা নিচের মহাপরিনির্বাণ সূত্র থেকে দেখানো হল।

যস্মিং পদেসে কম্পোতি বাসং পন্ডিতজাতিকো
শীলবন্তেত্থষ ভোজেত্বা সঞ্ঞতে ব্রহ্মচারিযো।
যা তত্থ দেবতা অস্সু তাসং দকিন্নাদিসে,
তা পূজিতা পুজযন্তি মানিতা মানযন্তি নং।
দেবতানু কম্পিতো পোসো সদা ভদ্রানি পস্সতী, তি।
ততো নং অনুকম্পোতি মাতা পুত্তং ব ওরসং
দেবতানু কম্পিতো পোসো সদা ভদ্রানি পস্সতী' তি।

অর্থাৎ, পণ্ডিত ব্রহ্মচারী যে স্থানে বাস করে শীলবান সংযত পুরুষদের আহার দান করেন এবং ঐ স্থানে যে সকল দেবতা তাদেরকে দক্ষিণা দান করেন, সেই স্থানে দেবতাগণ পূজিত ও হয়ে তার পূজা ও সম্মান করেন। মাতা যেমন নিজের গর্ভজাত পুত্রকে সব সময় অনুগ্রহ করেন, তেমন দেবতারা ও পূণ্যদান কারীদের প্রতি অনুগ্রহ করে থাকেন। দেবতার অনুগ্রহলাভী ব্যক্তি সবসময় মঙ্গল দর্শন করেন।[১৩]

পূণ্যদান ও পূণ্যানুমোদন এর ফলাফল সম্পর্কে মৎস্যদান জাতকে খুব সুন্দর উদাহরণ বর্ণিত হয়েছে। প্রাচীন কালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক ধনী জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বয়স প্রাপ্তি হলে তিনি অনেক ঐশ্বর্যের মালিক হয়েছিলেন। বোধিসত্ত্বের এক ছোট ভাই ছিল। যথাসময়ে বোধিসত্ত্বের বাবা মায়ের মৃত্যুর পর দুই ভাই তাদের বাবার পাওনা এক হাজার মুদ্রা আদায় করে নদীর তীরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। নৌকা আসতে দেরী করায় দুই ভাই একসাথে খাবার খেতে বসলেন। বোধিসত্ত্ব তার খাদ্যের অবশিষ্ট অংশ নদীর মাছদের খাওয়ানোর জন্য নদীতে ফেলে দিলেন। দানের ফল নদী দেবতাকে দান করলেন।

নদী দেবতা এতে পরিতুষ্ট হলেন। বোধিসত্ত্ব নদীর তীরে উত্তরীয় বিছিয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। বোধিসত্ত্বের ছোট ভাই কিছুটা চোর স্বভাবের ছিলেন। সে বোধিসত্ত্বকে বঞ্চিত হাজার মুদ্রা তিনি একাই আত্মসাৎ করতে চেয়েছিলেন। তাই মুদ্রার ব্যাগটি নিজের কাছে রেখে, একই রকম দেখতে আরেকটি ব্যাগে পাথরকুচি রেখে বোধিসত্ত্বের পাশে রেখে দিলেন। তারপর নৌকা আসলে দুই ভাই তাতে উঠল। নৌকা নদীর মাঝখানে আসলে ছোট ভাই নৌকা থেকে পড়ে যাওয়ার অভিনয় করে মুদ্রার ব্যাগটিকে পাথরের ব্যাগ মনে করে ফেলে দিল। তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করলেন। বোধিসত্ত্ব শান্ত নির্বিকার ভাবে ছোট ভাইকে দুঃখ করতে না করলেন। নদী দেবতা পুরো ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি ভাবলেন যার পূণ্যফল দানে আমার পূণ্য শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে, তার সম্পত্তিও আমাকে রক্ষা করতে হবে। তিনি দেববলে একটি বড় মাছের পেটে হাজার মুদ্রায় পরিপূর্ণ থলেটি গলধঃকরণ করালেন এবং নিজে তা রক্ষার ভার নিলেন। বোধিসত্ত্বের অসাধু ছোট ভাই

বাড়িতে গিয়ে বড় ভাইকে ঠকিয়েছেন এই আনন্দে উদ্বেলিত ছিল। কিন্তু, ব্যাগটি খুলে যখন দেখল সেটি পাথরে পরিপূর্ণ, তখন তিনি হতাশ হয়ে খাটের কোণে বসে পড়ল।

জেলেরা এদিকে নদীতে মাছ ধরবার জন্য জাল ফেললে, নদী দেবতার প্রভাবে সেই বড় মাছটি জালে ধরা পড়ল। জেলেরা মাছটিকে বিক্রির জন্য রাজধানীতে নিয়ে গেলেন। মানুষ জন এতবড় মাছ দেখে উৎসাহ নিয়ে মাছটির দাম জিজ্ঞাসা করল। জেলেরা এক হাজার মুদ্রা ও সাত পয়সা মাছটার দাম চাইলেন। তৎকালীন সময়ের লোকেরা এত দামী মাছ কখনো দেখেনি। মাছের দাম শুনে তারা হাসি ঠাট্টা করতে লাগলো। জেলেরা মাছ নিয়ে বোধিসত্ত্বের বাড়ির সামনে গেলেন ও তাকে মাছটি কিনতে অনুরোধ করলেন। বোধিসত্ত্ব মাছের দাম জিজ্ঞাসা করলে, জেলের সাত পয়সা দাম চাইলেন। বলল, 'অন্য কেউ নিলে এক হাজার সাত পয়সা নিব, কিন্তু আপনি নিলে শুধু সাত পয়সা দিলেই হবে।'

বোধিসত্ত্ব সাত পয়সা দিয়ে মাছটা কিনলেন। তারপর সেটি কাটার জন্য তার স্ত্রীর কাছে পাঠালেন তার স্ত্রী মাছটি কাটার সময় হাজার পয়সার মুদ্রার ব্যাগটি গেল ও বোধিসত্ত্বকে দিয়ে দিল। বোধিসত্ত্ব সেটি তার নিজের থলি বলে চিনতে পারলেন এবং ভাবলেন, জেলেরা অন্যের কাছে বিক্রি করতে গিয়ে এক হাজার মুদ্রা ও সাত পয়সা দাম চেয়েছিল। কিন্তু এই হাজার মুদ্রা আমারই সম্পত্তি বলে আমাকে মাত্র সাত পয়সায় বিক্রি করেছে। তারপর তিনি ভাবতে লাগলেন, কেন তিনি এগুলো পুনরায় ফেরত পেলেন? এগুলো তো জলে পড়ে গিয়েছিল। তখন নদী দেবতা আকাশে অদৃশ্যভাবে অবস্থান করে বললেন, "আমি গঙ্গাদেবী তুমি খাওয়ার পর তোমার অবশিষ্ট খাবার মাছদের দান করে তার পূণ্যফল আমায় দিয়েছিলে তাই আমি তোমার সম্পত্তি রক্ষা করেছি।" এরপর তিনি তার ছোট ভাইয়ের কুকর্ম বুঝিয়ে দিলেন এবং বললেন, "পাপীষ্ঠের বুক ভেঙ্গে গেছে। সে এখন শয্যায় পড়ে আছে। এই রকম কুকর্মে কারো উন্নতি হয় না কখনো। আমি তোমার সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করেছি। এগুলো যেন নষ্ট না হয়। তোমার ছোট ভাইকে এগুলোর ভাগ দিবে না। সম্পূর্ণটাই নিজে ভোগ করবে।" পরবর্তীতে কেন ছোট ভাইকে সম্পত্তির ভাগ দেওয়া উচিত নয় সেই সম্পর্কিত একটি গাথা বললেন, "যে ঠক সে কখনো দেবতার অনগ্রহ পায় না। যে ভাই তার নিজের বড় ভাইকে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে সব সম্পত্তি নিজে আত্মসাৎ করতে চায় সে কখনো তার অংশ পাবার উপযুক্ত নয়।"

কিন্তু বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন, আমার ছোট ভাই যত অন্যায়ই করুক, আমি তাকে নিরাশ করতে পারব না। এই বলে তিনি তার ছোট ভাইকে পাঁচশত মুদ্রা দান করলেন।[১৪] উপরি-উক্ত জাতকে আমরা পূণ্যদান ও পূণ্যানুমোদন জনিত কুশল কর্মের সুফল দেখতে পাই। সামান্য পূণ্যদান ও যে কতটা চমৎকার ভাবে ফিরে আসে, কতটা সুফল প্রদান করে তা আমরা উপরোক্ত মৎস্যদান জাতকে দেখতে পাই। মহামতি তার খাবারের অবশিষ্টাংশ শুধুমাত্র দিয়েছিলেন মাছদের খাবারের জন্য এবং পূণ্যদানের ফল প্রদান করেছিলেন গঙ্গাদেবীকে ।

তার এই পূণ্যদানেই গঙ্গাদেবীর দেবশক্তি বৃদ্ধি পায়। তিনি এই দান অনুমোদন করেন এবং তার ফলশ্রুতিতে সেই পূণ্যদানের ফল ফিরিয়ে দেবার জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। তৎকালীন হাজার মুদ্রার দাম ছিল অপরিসীম। গঙ্গাদেবী তার সংকল্পরক্ষার্থে সেই মুদ্রাই আবার বোধিসত্ত্বকে ফিরিয়ে দেন। এভাবেই পূণ্যদান ও পূণ্যানুমোদন জনিত কর্ম অঙ্গাঅঙ্গিভাবে একে অপরের সাথে জড়িত। এই কর্মের মাধ্যমে দেবতা ও মানুষ উভয়েই উপকৃত হয়। যাকে দান করা হয় তার যেমন উপকার হয়, তেমনি যিনি পূণ্যদান করেন তার ও যশ বৃদ্ধি হয়, মনে পবিত্রাবস্থা বিরাজ করে। তাই আমাদের উচিত যথাসম্ভব পূণ্যদান সম্পন্ন করা ও যাকে পূণ্যদান করা হচ্ছে তারও উচিত সেই পূণ্যদান অনুমোদন করে, পূণ্যদানকারীকে উৎসাহ প্রদান করা, যাতে সে এইরূপ কর্ম বারবার সম্পাদন করে।

বুদ্ধ তাঁর অতীত জন্মের কাহিনিতে অনেক শিক্ষনীয় ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যেখানে তিনি ধর্মোপদেশের ছলে সমাজের অবহেলিত মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা তাদের নিজ গুণবলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমন অনেক জাতকে দেখা যায়, মহামতি তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছেন। এমননি একটি শিক্ষামূলক জাতক হচ্ছে '*কালকর্ণী জাতক*' যেখানে বুদ্ধের ধর্মোপদেশের মাধ্যমে সমাজের অবহেলিতদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন ও বন্ধুত্বের মর্যাদা দিয়েছেন।

প্রাচীনকালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একজন বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ছিলেন। কালকর্ণী নামে তার এক বন্ধু ছিল। কালকর্ণী ছিল তার শৈশবের বিদ্যাশিক্ষা ও খেলাধুলার সাথী। একসময় কালকর্ণী কোনো এক কারণে সহায়, সম্বলহীন ও দুর্দশাগ্রস্থ হয়ে পড়েন। তখন সে তার ছেলে বেলার বন্ধু বোধিসত্ত্বের কাছে আশ্রয় চান। বোধিসত্ত্ব তাকে সাদরে আশ্রয় দেন এবং বেতন দিয়ে বাড়ির ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত করেন। সেই থেকে কালকর্ণী তার কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে লাগলেন।

কালকর্ণী সব সময় বোধিসত্ত্বের সাথে সাথে থাকতেন এবং বোধিসত্ত্বও তাকে বিশ্বস্ত ভেবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে দিতেন। কালকর্ণী বন্ধুর বাসায় আসার পর থেকেই কালকর্ণী দাঁড়াও, কালকর্ণী বস, কালকর্ণী খাও, এই কথাগুলো বোধিসত্ত্ব বলতেন। তখন বোধিসত্ত্বের কিছু হিংসুক বন্ধু কালকর্ণীর এই সমাদর সহ্য করতে পারতে না। তারা কয়েকজন একত্রিত হয়ে কুমন্ত্রণা দেওয়ার জন্য বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে বললেন, "আপনার বাড়ি থেকে কালকর্ণীকে সম্বোধন করে বস, দাড়াও, খাও প্রভৃতি কথা শোনা যায়। আপনি এই চালচুলোহীন লোককে বড় বেশি সম্মান দিচ্ছেন। 'কালকর্ণী' শব্দের অর্থ যেমন অলক্ষ্মী তেমনি তার সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘরেও অলক্ষ্মী বাসা বেঁধেছে। এই নাম শুনলে রাক্ষসও পালিয়ে যায়। এই লোক আপনার সম শ্রেণির নয়। আপনি তাকে অনেক প্রশ্রয় দিয়েছেন। আপনি এর সঙ্গ পরিত্যাগ করুন।"

বোধিসত্ত্ব নাম দিয়ে কী আসে যায় বললেন। নাম শুধুমাত্র বস্তু নির্দেশ করে। পন্ডিতেরা নাম দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর গুণ বিচার করেন না। কোনো নাম দিয়ে অমঙ্গল হবে এই চিন্তা করা উচিত নয়। কোনো নামের উপর ভিত্তি করে বাল্য বন্ধুর উপর আমি বিমুখ হব না। আমার কাছে কর্মেই পরিচয়। শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের একটি ভোগ গ্রাম ছিল। রাজা তার ভোগের জন্য গ্রামটি তাকে দান করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব একদিন কাজ উপলক্ষে সেই গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে তার রাতযাপন করতে হবে। তাই তিনি বাড়ি পাহারা দেওযার দায়িত্ব নিশ্চিন্ত মনে কালকর্ণীর হাতে দিয়ে গেলেন। এই সুযোগে চোরেরা ভাবল, যেহেতু শ্রেষ্ঠী বাড়িতে নেই, সেহেতু তার বাড়ি থেকে সবকিছু অপহরণ করার এই সুযোগ।

এরূপ ভেবে চোরেরা সেদিন রাতে অস্ত্র সস্ত্র নিয়ে শ্রেষ্ঠীর বাড়ি ঘিরে ফেলল। কিন্তু কালকর্ণী আগেই সন্দেহ করেছিল। চোরেরা সেই রাতে আসতে পারে। তাই সে রাতে জেগেই ছিল। যখন কালকর্ণী চোরেদের উপস্থিতি বুঝতে পারল, তখন সে প্রতিবেশিদের জানানোর জন্য ঢাক-ঢোল বাজাও শাঁখ বাজাও বলে চিৎকার করতে থাকল। সে সারা বাড়িতে এদিক ওদিক করে তোলপাড় করতে লাগল। চিৎকার শুনে চোরেরা ভাবল, শ্রেষ্ঠী মনে হয় ফিরে এসেছে। তাছাড়া বাড়িতে অনেক মানুষ জেগে আছে। তা না হলে এত চিৎকার চেচামেচি কেন হবে? তারা এই চিন্তা করল আজকে আর চুরি করা সম্ভব নয়। তাই তারা ভয়ে, হতাশায় লাটি সোটা পাথর, অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেল। পরের দিন সকালে এলাকার লোকজন চোরদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র-শস্ত্র দেখে বুঝতে পারল, গতরাতে চোর এসেছিল। তারা ভয়ে পালিয়ে গেছে। তখন তারা বলাবলি করতে লাগল। যদি কালকর্ণীর মত বুদ্ধিমান লোক না থাকত, তাহলে চোরেরা শ্রেষ্ঠীর সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যেত। শ্রেষ্ঠী সৌভাগ্যবান যে, কালকর্ণীর মত এত বিশ্বস্ত লোক পেয়েছেন।

বোধিসত্ত্ব গ্রামে ফিরে এসে সকল ঘটনা শুনলেন। তখন তিনি তার বাড়ির লোকজন ও বন্ধু বান্ধবদের বললেন, তোমরা কালকর্ণীকে ত্যাগ করতে বলেছিলে, তাড়িয়ে দিতে বলেছিলে। তোমাদের কথা শুনে আমি যদি তখন আমার এই বিশ্বস্ত বন্ধুটিকে তাড়িয়ে দিতাম তাহলে আমি আজ সর্বস্ব হারাতাম। চোরেরা আমার সব চুরি করে নিয়ে যেত। এরপর তিনি একটি গাথা পাঠ করে তাদের ধর্মোপদেশ দান করলেন। সেই গাথার অর্থ হলো কারো সাথে সাত পা হাঁটলে তাকে বন্ধু বা মিত্র ডাকা যায়। কারো সাথে বারো দিন একত্রে থাকলে তাকে সখা করে নেওয়া যায়। কারো সাথে পনের দিন বা একমাস কাটালে তাকে আত্মীয়ের মর্যাদা দেওয়া যায়। তারও বেশিদিন কারো সাথে একত্রে থাকলে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যায়। আর কালকর্ণী হচ্ছে আমার বাল্যকালের বন্ধু। নিজের সুখের জন্য বাল্য কালের বন্ধুকে কী আমি ত্যাগ করতে পারি? এই বলে সকলকে উপদেশ দিলেন বোধিসত্ত্ব। তারপর বোধিসত্ত্ব বাল্যবন্ধু কালকর্ণীর বেতন বাড়িয়ে দিলেন ও শ্রেষ্ঠীভবনে নতুন বিশ্বস্থতার ও বন্ধুত্বের স্বরূপ স্থাপন করলেন।[১৫]

উপরোক্ত জাতকে আমরা একই সাথে বিশ্বস্থতা ও মিত্রতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ দেখতে পাই্ বোধিসত্ত্বরূপী শ্রেষ্ঠী যেমন তার অসহায়, সহায় সম্বলহীণ বন্ধুকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন, তেমনি সেই বন্ধুটি ও তার কর্ম দ্বারা সেই বন্ধুত্বের প্রতিদান দিয়েছেন। কালকর্ণীর কর্মই তাদের বন্ধুত্বের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়েছে। কালকর্ণী পূর্বের কর্মের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন বলেই বোধিসত্ত্ব তাকে বাড়ি দেখা শোনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। অন্যান্য ধনী বন্ধুরা কালকর্ণীকে তাদের সমমর্যাদার নয় বলে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব নামে নয় কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। বোধিসত্ত্ব বিশ্বাস করতেন, নামের গুনে মানুষের ভালো মন্দ নির্ধারিত হয় না। মানুষের প্রকৃত গুণ থাকে তার হৃদয়ে, তার কর্মে। বিপদে প্রকৃত বন্ধুর পরীক্ষা হয়। মানুষের কর্ম যদি সঠিক হয়, তাহলে কোন না কোন দিন তার মূল্যায়ণ হবেই। কাজেই কুশল কর্ম সম্পাদন করতে হবে, তাহলে তার সুফল সে পাবেই পাবে। কর্মই মানুষকে তার প্রকৃত গন্তব্যে নিয়ে যায়।

কর্মবাদের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হলো কোনো সময় বিপদে পড়লে অস্থির না হয়ে উদ্ধারের পথ খুঁজতে হয়। সঠিক ও উদ্যমী হয়ে কর্ম করলে যত কঠিন বিপদই আসুক না কেন তা থেকে উত্তরণ সম্ভব। কর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে উদ্যামী হয়ে, কাজ করলে তার সুফল অবশ্যই পাওয়া যায় এমনি একটি উপদেশমূলক কাহিনি জাতকে বিধৃত রয়ছে যার নাম বন্নপথ জাতক। নিম্নে জাতকের কাহিনি উপস্থাপনের মাধ্যমে এর শিক্ষামূলক দিকগুলো তুলে ধরা হলো।

প্রাচীনকালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এক বণিকের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। বয়স প্রাপ্ত হলে তিনি বাণিজ্যে মনোনিবেশ করেন। তার পাঁচশত গরুর গাড়ি ছিল যাতে করে পণ্য বোঝাই করে বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করে বেড়াতেন তিনি। বাণিজ্যের কাজে বের হয়ে তিনি একবার ষাট যোজন বিস্তৃত মরু অঞ্চলে পৌছান। সেই মরুভূমির বালি এত সূক্ষ্ম ও মিহি ছিল যে সে বালি হাতের মুঠোয় নিয়ে রাখা যেত না। আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে পড়ে যেত। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই বালি আগুনের মত গরম হয়ে যেত এবং তার উপর দিয়ে কারও পক্ষে যাতায়াত করা সম্ভব হতো না।

ওই মরুপথে তাই দিনে চলাচল করা অসম্ভব ছিল। এখানে রাতে চলাচল করতে হত এবং দিনে শিবির টানিয়ে বিশ্রাম নিতে হতো। বণিকেরা চলার পথে চাল, ডাল, তেল, জল, লাকড়ি রাখতেন। সূর্যোদয় হলে যাত্রা বন্ধ করে গরু গুলোকে গাড়ি থেকে খুলে গাড়ি গুলো গোল করে সাজিয়ে শিবির টানিয়ে দ্রুতই রান্না করে খেয়ে শিবিরের নিচে বিশ্রাম করত। আবার সুর্য ডোবার আগে দ্রুত রান্না করে খেয়ে আবার যাত্রা শুর করত। সেখানে নাবিকদের মত মরু পথিকদের রাত্রে নক্ষত্র দেখে পথ চলতে হতো। নক্ষত্র দেখে যারা পথ চলতে পারত তাদের স্থান নিয়ামক বলা হতো। সব মরুযাত্রী দলেই একজন করে স্থান নিয়ামক থাকত। বোধিসত্ত্ব একদিন মরুভুমির উনষাট যোজন পথ অতিক্রম করে ফেললেন। তিনি ভাবলেন বাকি এক যোজন পথ রাতের

মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। এই চিন্তা করে সেই দিন সন্ধ্যার পর জল, কাঠ ও অনেক খাদ্যদ্রব্য দরকার নেই বলে ফেলে দেওয়ার আদেশ দিলেন। কারণ, এতে বোঝা হালকা হবে,গরুগুলিও কিছুটা কম কষ্টে পথ চলতে পারবে এবং মরুভূমি পার হয়ে গেলে সেসব জিনিস সব জায়গায় পাওয়া যাবে। দীর্ঘ উনষাট যোজন পথ মরুভূমির মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে স্থান নিয়ামকের পর্যাপ্ত ঘুম হচ্ছিল না। সেই রাতে তিনি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। গরুগুলোও নিজের মনমত উল্টো পথে চলতে লাগলেন। ভোর বেলায় স্থান নিরামকের ঘুম ভাঙ্গলে তিনি গাড়ি ঘোরাও গড়ি ঘোরাও বলে চিৎকার শুরু করলেন। সমস্ত গাড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে দেখল সকাল হয়ে গিয়েছে এবং গত সন্ধ্যায় যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেখানেই এসে পৌছেছেন।

তখন বোধিসত্ত্বের অনুচরেরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। গাড়িতে জল নেই, কাঠ নেই, তাদের কী হবে চিন্তা করতে করতে কোন উপায় না দেখে গরুগুলোকে খুলে দিয়ে হতাশ হয়ে গাড়িগুলোর নিচে শুয়ে পড়ল।এই রকম চরম বিপদের সময়েও বোধিসত্ত্ব ধৈর্য হারালেন না। তিনি দলপতি তিনি ধৈর্য হারালে সবার বিপদ নিশ্চিত। সবার মৃত্যু নিশ্চিত। এই ভেবে তিনি জলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। কিছুদূর গিয়ে এক জায়গায় এক গুচ্ছ ঘাস দেখতে পেলেন। তিনি ভাবলেন এই ঘাসের নিচে অবশ্যই জল আছে, তা না হলে এ সুবিশাল মরুভূমিতে ঘাস জন্মানো অসম্ভব।

বোধিসত্ত্ব তার অনুচরদের কোদাল দিয়ে সেই স্থানে কূপ খনন করতে বললেন। অনেক মাটি খনন করেও ষাট হাত নিচে ও জল পাওয়া গেল না। উল্টে দেখা গেল সেখানে মাটি নেই, শুধু মাত্র পাথর ভর্তি। বোধিসত্ত্ব তখন নিচে নেমে গিয়ে পাথরের উপর কান পেতে ভিতরে জল প্রবাহের শব্দ শুনতে পেলেন। বুঝতে পারলেন পাথরের নিচে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে। বোধিসত্ত্ব উপরে উঠে এসে এক যুবক অনুচরকে বললেন, বড় হাতুড়ি নিয়ে পাথরের গায়ে ক্রমাগত ঘা মারতে এর নিচ দিয়ে জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে। সেই অনুচরটি কোন দ্বিধা না করে বোধিসত্ত্বের আদেশে হাতুড়ি দিয়ে ক্রমাগত আঘাত করতে লাগল পাথরটির উপর। সেই অনুচরটি ছিল সাহসী উৎসাহী ও উদ্যমী। তার কিছুক্ষণ চেষ্টাতেই পাথর ভেঙ্গে গেল। স্বচ্ছ জলের এক ফোয়ারা বেগে উঠে এল। সকলে মহাখুশিতে স্নান করল, পানের জল তুলে রাখল প্রচুর পরিমাণে। তারপর রান্নার ব্যবস্থা করল। গাড়িতে যেসব বাড়তি চাকা ও কাঠের সরঞ্জাম ছিল সেগুলো চিরে জ্বালানী কাঠ তৈরি করল। সেই কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালানো হল, রান্না করা হলো, খাওয়া দাওয়া করা হলো। গরুগুলিকে ও খাইয়ে চনমনে করা হলো। তারপর কুয়োর পাশে একটি পতাকা পুঁতে দিল, যাতে দূর থেকে পতাকাটি ও অন্য বণিকেরা দেখে সহজেই কুয়াটি চিনতে পারে। সন্ধ্যা হলে তারা গন্তব্য স্থানের পথে রওনা হলেন। যথাসময়ে বাণিজ্য স্থানে পৌছে গেল। সেখানে বোধিসত্ত্ব দ্বিগুণ, চর্তুগুণ দামে সমস্ত পণ্য দ্রব্য বিক্রী করে প্রচুর লাভ করেন। তারপর দেশে

ফিরে এসে সুখে শান্তিতে বাস করতে লাগলেন। সারাজীবন দানাদি পূণ্য কর্ম সম্পন্ন করে পরিণত বয়সে পরলোক গমন করে স্বর্গে গেলেন।[১৬]

উপরোক্ত জাতকটি পাঠে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনুধাবন করলাম। এখানে যে কোন বিপদ উদ্যমতা ও সাহসীকতার সাথে যেমন সঠিক সময় সঠিক কর্মের মাধ্যমে পার হওয়া যায় তেমনি যে কোন যদি অধ্যবসায়ের সাথে করা যায়, বিপদ আসলে ভয় না পেয়ে অধ্যাবসায় চালিয়ে যেতে হয় , তাহলে যে কোন সমস্যা থেকে উত্তরণ সম্ভব। মানুষ মাত্রই জীবনে ভুল ভ্রান্তি হবে। সেই ভুল ভ্রান্তি থেকে বাধা বিপত্তি ও আসবে। কিন্তু তাতে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। মনোবল ঠিক রাখতে হবে। উদ্যমী হতে হবে, কুশল কর্ম সম্পাদন করতে হবে ও কর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। তাহলেই সাফল্য এসে ধরা দিবে ও সেই কর্মটি ও সঠিক হবে। কর্মই শক্তি, কর্মই মুক্তি। কুশল কর্মই মানুষকে তার গন্তব্যে পৌছে দিবে।

আমাদের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় অনেক সময় এমন কিছু ঘটনা দেখা যায় যেখানে এক জনের দোষ আরেক জনের উপর চাপানো হয়। একজনের অকুশল কর্মের ফল ভোগ করে আরেকজন বিনা দোষে কেউ গুরুতর শাস্তি পাচ্ছে, আবার অপরাধী বুক ফুলিয়ে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সঠিক প্রমাণের অভাবে নির্দোষ প্রাণী শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছে। কিন্তু বোধিসত্ত্ব তার কর্মবলে দোষীকে শাস্তি দিয়েছেন, আরো নির্দোষকে মুক্ত করেছেন। নিম্নে কুক্কুর জাতকের মাধ্যমে বোধিসত্ত্বের প্রজ্ঞা সম্পর্কে দেখানো হল ও তার নিখুত কর্ম প্রদর্শন করা হলো।

প্রাচীনকালে বারানসী রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে পূর্বজন্মের কর্মফল স্বরূপ বোধিসত্ত্ব কুকুর হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শত শত কুকুর এর অধিপতি হয়ে মহাশশ্মানে বাস করতেন। একদিন রাজা সিন্ধুদেশের সাদা ঘোড়ায় টানা বিভিন্ন অলঙ্কার যুক্ত রথে চড়ে উদ্যান ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখানে সারাদিন বিহার করে সূর্য অস্ত যাবার পর রাজধানীতে ফিলে এলেন। রথে চামড়ার সে সাজ ছিল তা সেদিন কেউ খুলে রাখল না। সেই চামড়ার সাজসহ রথ রাজবাড়িতে উঠানেই থেকে গেল। সেদিন রাতে বৃষ্টি হলো এবং চামড়ার সাজ গুলি সব ভিজে গেল। রাজবাড়িতে যেসব শিকারী কুকুর অবস্থান করত, তারা এসে চামড়ার সব সাজ খেয়ে নিল। কিন্তু পরদিন রাজার অনুচররার রাজাকে জানাল যে, বাইরে থেকে নর্দমার মুখ দিয়ে কুকুর এসে চামড়ার সব সাজ খেয়ে ফেলেছে। রাজা এই কথা শুনে ভয়াবহ রাগান্বিত হলেন এবং যেখানেই কুকুর দেখা যাবে, সেখানেই তাদের মেরে ফেলতে আদেশ দিলেন।

রাজার এই আদেশে রাজধানীতে ভয়াবহ কুকুর হত্যা শুরু হলো। যেখানেই কুকুর দেখতে পাওয়া যেত, রাজা কর্মচারীরা সেখানেই তাদের মারিতে শুরু করল। তখন সব কুকুর রাজধানী থেকে শ্মশানে আশ্রয় নিয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে উপস্থিত হলো। বোধিসত্ত্ব সব কুকুরকে একসাথে দেখে শ্মশানে আসার কারণ জিজ্ঞাসা

করল। কুকুরদের কাছে সম্পূর্ণ ঘটনাটি শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, রাজ ভবন হচ্ছে সুরক্ষিত স্থান। এত সুরক্ষিত স্থানে বাইরের কুকুর প্রবেশ করতে পারে না। রাজ ভবনের মধ্যে যেসব উচুমানের কুকুর আছে, এ হচ্ছে তাদের কাজ। প্রকৃত অপরাধীরা ভিতরে নিরাপদে রয়েছে। আর যারা নিরাপরাধ তারা মারা যাচ্ছে। এরূপ অবস্থায় রাজাকে প্রকৃত অপরাধী দেখিয়ে জাতি কুলের প্রাণ রক্ষা করা উচিত। এরপর তিনি রাজধানীর কুকুরদের আশ্বাস দিলেন ভয় না পাবার এবং তিনি যতক্ষণ ফিরে না আসে ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করার। বোধিসত্ত্ব তখন মৈত্রীভাব অবলম্বন করে পথে যেন কেউ তাকে আঘাত না করে এই ইচ্ছা করে একাই রাজ ভবনের দিকে যাত্রা করলেন। তিনি প্রকৃত অহিংস ও মৈত্রিভাব অবলম্বন করায় পথে কেউ তাকে আঘাত করল না। বোধিসত্ত্ব নিরাপদে রাজভবনে পৌছালেন। রাজা তখন রাজ সভায় বসেছিলেন। বোধিসত্ত্ব রাজসভায় প্রবেশ করে এক লাফে সিংহাসনের নিচে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাজার অনুচরেরা তাকে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেও রাজা বোধিসত্ত্বের অহিংস ও মৈত্রী রূপ দেখে রাজা তাদের নিষেধ করলেন।

বোধিসত্ত্ব রাজাকে ভরসা করে তাকে প্রণাম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনিই কি কুকুরদের হত্যার আদেশ দিয়েছেন? রাজা উত্তরে হ্যাঁ বললেন। বোধিসত্ত্ব আবার কুকুরদের অপরাধ কি তা জানতে চাইলেন। উত্তরে রাজা সব চামড়ার সাজ খেয়ে ফেলার কথা বললেন। বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, কোন কুকুরে তা খেয়েছে তা জানেন কিনা? উত্তরে রাজা না বললেন। বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, কে প্রকৃত অপরাধী তা না জেনেই কুকুর দেখামাত্রই তাদের হত্যা করতে হবে এমন আদেশ দেওয়া উচিত হয়নি। উত্তরে রাজা বললেন, কুকুর রথের সাজ খেয়েছে, তাই তাদের মারতে আদেশ দিয়েছি। বোধিসত্ত্ব তখন আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার অনুচররা সব কুকুরই মারছে, না কোন কোন কুকুরকে না মারার আদেশ আছে? রাজা বললেন আমার বাড়িতে যে সব উচ্চমানের শিকারী কুকুর আছে তাদের মারা হচ্ছে না। বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, আপনি বলেছেন, কুকুর, রথের চামড়া খেয়েছে তাই তাদের হত্যার আদেশ দিয়েছেন কিন্তু বলছেন বাড়ির কুকরদের মারা হচ্ছে না। এটা কোন ধরনের নীতি আপনার? বিচারের সময় রাজাদের তুলার মত নরম থাকতে হয়। প্রকৃত অপরাধী কে বা কারা তা না জেনে আপনি যে বিচার করেছেন তা পক্ষপাতদুষ্ট ও ন্যায় বিরুদ্ধ।এ হচ্ছে দুর্বলের উপর অত্যাচার।রাজা তখন জিজ্ঞাসা করলেন কোন কুকুর রথের চামড়া খেয়েছে তা বোধিসত্ত্ব জানেন কিনা? উত্তরে বোধিসত্ত্ব রাজ ভবনে বসবাসরত কুকুরদের দোষী বললেন। রাজা তখন কিভাবে বুঝবে, তারাই প্রকৃত অপরাধী।

বোধিসত্ত্ব তখন প্রমাণ দেওয়ার জন্য রাজ ভবনের সব কুকুরদের নিয়ে আসতে বললেন এবং সাথে ঘোল ও কুশ আনতে বললেন। রাজার আদেশে রাজবাড়ির কুকুর এবং ঘোল ও কুশ নিয়ে আসা হল। তখন বোধিসত্ত্ব কুশ গুলিকে বেটে ঘোলের সাথে মিশিয়ে সেই কুকুরদের খাইয়ে দিতে বললেন। কুশ মেলানো ঘোল খেয়ে

কুকুরগুলো সাথে সাথে বমি করে দিল।এবং চামড়ার টুকরাগুলি বমির সাথে সাথে বের হয়ে আসলো। তা দেখে রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এ যে দেখছি সর্বজ্ঞ বুদ্ধের উচিত কাজ।' রাজা তখন নিজের রাজ চিহ্ন দান করে সম্মানিত করলেন বোধিসত্ত্বকে। বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে পঞ্চশীলের শিক্ষা দিলেন ও নানা বিষয়ে ধর্মোপদেশ দান করলেন। রাজা তার রাজ্যের সকল প্রাণীদের অভয় দিলেন এবং বোধিসত্ত্বসহ সকল কুকুরদের প্রতিদিন রাজ ভোগের ব্যবস্থা করলেন। বোধিসত্ত্ব রাজ চিহ্নটি রাজাকে ফেরত দিয়ে পুনরায় শ্মশানে ফিরে গেলেন।

সেই দিন থেকে রাজা বোধিসত্ত্বের উপদেশ অনুসরণ করে সৎ কর্ম করে যথাকালে সদগতি প্রাপ্ত হলেন।[১৭]
উপরোক্ত জাতকটির কাহিনি আমাদের বর্তমান সমাজের জন্য খুবই উপযোগী একটি শিক্ষা। সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ অসংগতি বুদ্ধ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন এই কুক্কুর জাতকে। এই জাতকে একই সাথে অহিংসা, মৈত্রীভাব, কুশল কর্ম ও অকুশল কর্মের ফলাফল এবং ন্যায় বিচারের সুন্দর উদাহরণটা প্রস্ফুটিত হয়েছে। মহামতি আজ থেকে হাজার বছর পূর্বেই সমাজের এই অসংগতিটি তুলে ধরেছেন এবং ন্যায় বিচারের ব্যবস্থা করেছেন। উক্ত জাতকে আমরা দেখি যে, কুকুররুপী বোধিসত্ত্ব যদি তার কর্ম থেকে নিজেকে বিরত রাখতেন, নিজেও ভয় পেয়ে লুকিয়ে থাকতেন, সেদিন ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হত না। দোষী বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং নির্দোষী মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে বেড়াতেন। বোধিসত্ত্ব সঠিক সময় সঠিক কাজটি করে, নিজে মৃত্যুর ভয় না পেয়ে নিজের জাতিকূলকে যেমন রক্ষা করেছেন, তেমনি মহারাজকেও সঠিক পথে নিয়ে এসেছেন। তাকে সঠিক ন্যায় বিচার করতে সাহায্য করেছেন এবং পঞ্চশীল পালন ও সৎ কর্মের পরামর্শ দিয়ে সদগতি প্রাপ্ত হতে সাহায্য করেছেন। তাই আমাদেরও উচিত সমাজে যখন কোন অসংগতি দেখব, কোন নির্দোষের শাস্তি পেতে দেখব, তখন মৌন না থেকে নিজেদের স্থান থেকে যতটুকু সম্ভব, ততটুকু করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করব। এভাবেই দেশ ও সমাজ একদিন কলংক মুক্ত হবে ও সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

জাতকের উপরের কাহিনি গুলোতে আমরা কুশল কর্মের প্রভাব ও ফলাফল দেখেছি। জাতকের কাহিনি গুলোতে যেমন কুশল কর্মের কাহিনির উল্লেখ রয়েছে। তেমনি অকুশল কর্মের অনেক ঘটনাও লিপিবদ্ধ রয়েছে। অকুশল কর্মের ফলাফল যে খারাপই হয় তা মহামতি জাতকের গল্পগুলোতে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কোন মানুষ অকুশল কর্ম করে যতই আত্মতৃপ্তিতে ভূগুক, যতই সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকুক নির্দিষ্ট সময় পর তাকে দুঃখ ভোগ করতেই হবে। এমনই বিভিন্ন ঘটনা জাতকে উল্লেখ রয়েছে। নিম্নে এমন কয়েকটি কাহিনি তুলে ধরার মাধ্যমে অকুশল কর্মকারীদের করুন পরিণতি তুলে ধরা হলো।

শুরুতেই লোভের কারণে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটে এবং দুঃখ দুর্দশা আসে এমন কয়েকটি জাতক তুলে ধরা হলোঃ কপোত জাতক, এমন একটি জাতক যাতে লোভের কারণে তার করুন পরিণতি তুলে ধরা হলোঃ

প্রাচীন কালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব পায়রা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন বারনসীর লোকেরা পূণ্য কামনায় পাখিদের সেবা করত। পাখিদের জন্য ঘরের ও বাইরের বিভিন্ন জায়গায় ঝুড়ি ঝুলিয়ে রাখত। পায়রা রূপী বোধিসত্ত্ব এই রকম একটি ঝুড়িতে বসবাস করতেন। বারাণসী নগরের প্রধান শ্রেষ্ঠীর পাচক বা রাধুনী তার রান্না ঘরের পাশেই একটি ঝুড়ি রেখেছিল। বোধিসত্ত্ব প্রধান শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে রাখা বুড়িতেই থাকতেন। তিনি প্রতিদিন সকালে খাদ্যের খোঁজে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন আর সন্ধ্যা হলেই ফিরে এসে সেই ঝুড়িতে শুয়ে থাকতেন।

একদিন এক কাক প্রধান শ্রেষ্ঠীর রান্না ঘরের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন মাছ ও মাংস রান্নার গন্ধ পেল। কিভাবে সে মাছ ও মাংস খেতে পারবে, কিভাবে তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ হবে তা ভাবতে ভাবতে সে সেই রান্না ঘরের পাশেই বসেছিল। তারপর সে পায়রা রূপী বোধিসত্ত্বকে রান্না ঘরে ঢুকতে দেখে ভাবল এই পায়রাটিকেই অবলম্বন করে তার কার্যসিদ্ধি করতে হবে। পরদিন ভোরে বোধিসত্ত্ব ঘুম থেকে উঠে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে পরলেন। কাকও তার পেছন পেছন ছুটল। বোধিসত্ত্ব কাককে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন কেন কাক তার পিছু নিয়েছে? ধূর্ত কাক বলল, বোধিসত্ত্বের চালচলন তার পছন্দ হয়েছে তখন থেকে কাক তার অনুচর হয়ে থাকবে।

বোধিসত্ত্ব বললেন পায়রা ও কাকের খাবার ভিন্ন ধরনের। সুতরাং, কাক যদি তার সাথে থাকে তাহলে কাকের অসুবিধা হবে। কিন্তু চালাক কাক তার কার্যসিদ্ধির জন্য বললেন, বোধিসত্ত্ব যখন তার খাবার খুজতে থাকতে তখন সেও তার খাবার খুজবে। সে সব সময় বোধিসত্ত্বের সাথে সাথে থাকবে। বোধিসত্ত্ব এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন এবং কাককে খুব সাবধানে চলতে পরামর্শ দিলেন। এই ভাবে কাককে সতর্ক করে বোধিসত্ত্ব চরতে চরতে তৃণবীজ খেতে লাগল এবং কাকও গোবরের নিচের কীট খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে থাকল। বোধিসত্ত্ব তার খাবার শেষ করে বাসার দিকে যেতে লাগল। কাকও তাকে অনুসরণ করতে লাগলো। বোধিসত্ত্ব যখন রান্না ঘরে ঢুকলেন, কাকও রান্নাঘরে ঢুকে পড়লেন। রাধুনী ভাবল যেহেতু পায়রাটির সাথে একজন নতুন বন্ধু এসেছে। সেহেতু একেও তার থাকার জন্য আরেকটি ঝুড়ি ঝুলিয়ে দিলেন। একদিন শ্রেষ্ঠী প্রচুর পরিমাণে মাছ ও মাংস কিনে রাধুনীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তা দেখে কাকের মাছ মাংস খাবার লোভ হলো। সে মনে মনে চিন্তা করল। সে আজ খাদ্যের খোঁজে বাইরে যাবে না। তাহলে বেশ কিছু মাছ, মাংস খেতে পারবে। এই ঠিক করে সে পেটের অসুখের অভিনয় করে পড়ে রইল। সকাল হলে বোধিসত্ত্ব কাককে নেবার জন্য আসলে কাক তার অসুস্থতার অভিনয় করে পড়ে রইল। সকাল হলে বোধিসত্ত্ব কাককে নেবার জন্য আসলে কাক তার অসুস্থতার কথা বলে, আজ তার পক্ষে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় তা বলতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব অবাক হলেন,

কারণ তিনি কখনো কাকদের পেটের ব্যাথা বা রোগ সংক্রান্ত কিছু শুনেন নি। বোধিসত্ত্ব কাকের অভীলিপ্সা বুঝতে পারলেন ও কাককে মাছ মাংসের দিকে মনোযোগ না দিয়ে তার সাথে বাইরে খাদ্য সংগ্রহ করতে যেতে বললেন। কাক বললেন, সে খুব অসুস্থ। বোধিসত্ত্ব কাককে লোভী হয়ে কোনো অন্যায কাজ করতে নিষেধ করে নিজের খাদ্যের উদ্দেশ্যে বের হয়ে গেলেন।

এই দিকে রাধুনী সব মাছ মাংস রান্না করে, গরম রান্না কিছুটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য রান্নার পাত্রগুলির মুখ কিছুটা খুলে দিলেন। গরম পরিবেশে রান্না করার জন্য রাধুনী অনেকটা ঘর্মাক্ত হলেন এবং রান্না ঘরের বাইরে গিয়ে ঘাম মুছতে লাগলেন। এই সময় ধূর্ত কাক ঝুড়ি থেকে বাইরে বের হয়ে দেখল রাধুনী রান্নাঘরে নেই। সে তখন ভাবল তার মাংস খাবার সময় হয়েছে। বড় মাংসের খণ্ড না খেয়ে ছোট ছোট মাংসের টুকরা খেলে তার পেট ভরবে না। তাই সে ঝুড়ি থেকে উড়ে গিয়ে যে বড় পাত্রে মাংস রাখা ছিল তার উপর বসল। সাথে সাথে পাত্রটা উল্টে পড়ে গিয়ে শব্দ হলো। পাচক সাথে সাথে রান্না ঘরে গিয়ে কাককে দেখতে পেল। রাধুনী দরজা জানালা সব বন্ধ করে কাককে ধরে ফেলল। রাধুনী কাকের অসৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পারল। রাধুনী কাকের শরীর থেকে সব পালক ছাড়িয়ে দিয়ে লবণ ও জিরা বেটে টক ঝোলের সাথে মিশিয়ে কাকের সারা শরীরে মাখিয়ে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিল। কাকের সারা শরীর জ্বালা করতে লাগল ও সে সারাদিন যন্ত্রনায় আর্তনাদ করতে লাগল।

সন্ধ্যায় বোধিসত্ত্ব বাসায় ফিরে কাকের এই শোচনীয় অবস্থা দেখে সম্পূর্ণ ঘটনাটা বুঝতে পারলেন। তিনি ভাবলেন, কাক তার কথা না শুনে এই মহাকষ্ট ভোগ করছে। তিনি তার পর একটি গাথা বললেন, যার অর্থ দাড়ায় "যে ব্যক্তি হিতৈষী বন্ধুর কথা শোনে না, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী তার এমনি বিপত্তি হয়। তার প্রমাণ হচ্ছে এই কাক।" বোধিসত্ত্ব গাথাটি বলার পর মনে মনে স্থির করলেন, সে এখানে থাকবে না। এই কাকের জন্য তার সুনাম নষ্ট হয়েছে। তাই তিনি অন্য স্থানে চলে গেলেন। তখন কাক ও যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে সেখানেই মৃত্যুবরণ করলেন। পাচক ঝুড়িসহ কাককে বাইরে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিলেন।[১৮]

লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু এই প্রবাদটির সত্যিকারের উদাহরণ হচ্ছে কপোত-জাতক। লোভের কারণে অকাল মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল ধূর্তকাকটির। কর্মবাদের আলোচনার অন্যতম উপজীব্য বিষয় হচ্ছে সৎ কর্ম সম্পাদন করা। কোনো কর্ম যদি সৎ থাকে তাহলে সেইকর্মের ফলাফলও কুশল হবে। আর কোন কর্মের চিন্তাই যদি হয় অসৎ, তাহলে ফলাফল হবে ভয়াবহ। ধূর্ত কাকটি প্রথম থেকেই লোভী ও অসৎ চিন্তাধারার অধিকারী ছিল। অন্যের সুনামকে উপজীব্য করে সে তার কার্যসিদ্ধ করতে চেয়েছিল। ছলনার আশ্রয় নিয়ে সে বোধিসত্ত্বকে ঠকিয়ে সেই রন্ধনশালার সুস্বাদু মাছ মাংস খাওয়াই ছিল তার মূল উদ্দেশ্য। এই অসৎ চিন্তা ধারাই এই অসৎ কর্মই তাকে দীর্ঘ যন্ত্রনা দায়ক মৃত্যু দিয়েছে। তাই আমাদের কুশল কর্মে মনোযোগী হতে হবে ও

কুশল কর্মের চর্চা অব্যহত রাখতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, অসৎ কর্ম, অসৎ চিন্তার ফলাফল কখনোই সুখকর কিছু বয়ে আনতে পারে না।

লোভের কারণে যে মৃত্যু হতে পারে এমন আরেকটি উদাহরণ হলো বক জাতক। বক জাতকে লোভের করুন পরিণতি দেখানো হয়েছে। প্রাচীনকালে বোধিসত্ত্ব একটি বনের মাঝে পদ্ম সরোবরের কাছে বৃক্ষ দেবতা হয়ে বাস করতেন। সেই পদ্ম সরোবরের কিছু দূরেই একটি পুকুর ছিল। সেই পুকুরটি গভীর ছিল না। তাই প্রতি বছর গ্রীষ্মকালে সেই পুকুরের জল একবারেই কমে যেত। সেই পুকুরে অনেক মাছ থাকত। সেই পুকুরের কাছেই এক বক বাস করত। একবার গ্রীষ্মকারে পুকুরের জল যখন খুবই কমে গেল তখন সেই বক পুকুরের কাছে বসে চিন্তা করতে লাগল, কিভাবে মাছগুলোকে ধরে খাওয়া যায়। তার মাথায় একটি উপায় আসলো এবং পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সে মন খারাপ করে চিন্তিত হয়ে বসে রইলেন। বককে এভাবে বিষন্ন হয়ে বসে থাকতে দেখে পুকুরের মাছেরা তাকে চিন্তিত হয়ে বসে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। বক প্রতিত্ত্যুরে বলল যে সে মাছদের কথাই ভাবছে। মাছগুলো ভাবনার কারণ জিজ্ঞাসা করলে বক বলল,'এখন গ্রীষ্মকাল প্রচন্ড গরম পড়েছে। পুকুরের জল ও অনেক কমে গেছে। দিনে দিনে এই জল আরও কমে যাবে। তখন তোমরা কি করবে? কি করে জলের অভাবে বাঁচবে, সেই চিন্তার আমি কাতর হচ্ছি।'

মাছেরা তখন, বলল আপনি ঠিকই বলেছেন আর্য। আমাদের করণীয় কি তা বলুন। বক বলল, যদি আমায় বিশ্বাস কর, তাহলে একটা উপায় বলতে পারি। এখান থেকে কিছু দূরে একটা বিশাল সরোবর আছে। তাতে সারা বছরই অনেক জল থাকে। সেই সরোবরে পাঁচ রঙের পদ্মফুল ফোটে। আমি তোমাদের এক একটিকে আমার ঠোঁট দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই সরোবরের জলে ছেড়ে দিব। মাছেরা বলল, পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে কোন বক মাছদের কথা ভাবেনি, শুধু আপনি ছাড়া। কিন্তু বলুন দেখি, আপনি আমাদের এক একটি করে খেয়ে ফেলার মতলব করেননি তো? বক বলল, না না তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস করো তাহলে আমি তোমাদের কখনও হত্যা করব না আমি যে সরোবরের কথা বলছি তা সত্যি সত্যি আছে কিনা এবং আমার কথা সত্যি কিনা তা দেখার জন্য তোমাদের একজন আমার সাথে আসতে পার। তোমাদের একজনকে আমার সঙ্গে দাও। মাছেরা তখন যুক্তি করে এক বিশাল মাছকে এনে দিল। বক তার ঠোঁট দিয়ে ধরে নিয়ে উড়ে গিয়ে সরোবরের জলে ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ পর তার সরোবর দেখা শেষ হলে তাকে নিয়ে আবার সেই পুকুরের মাছদের কাছে নিয়ে গেল। সেই বড় মাছটি গিয়ে অন্য মাছদের সেই বড় সরোবর ও অনেক জলের কথা বলল। তখন পুকুরের সব মাছ সেই সরোবরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল। তারা সমস্বরে বককে বলল, 'আপনি সত্যি সুন্দর একটি ব্যবস্থা ঠিক করেছেন আমাদের জন্য। আপনি আমাদের এক এক করে সেই সরোবরের বুকে ছেড়ে আসুন। এছাড়া আর কোন উপায় নেই।'

বক তখন খুশি মনে এক একটি করে মাছকে সরোবরের দিকে নিয়ে গেল। কিন্তু তাদের জলে ছেড়ে না দিয়ে সরোবরের তীরে একটি গাছের নিচে নিয়ে খেয়ে ফেলল। এই ভাবে ধূর্ত বকটি এক এক করে পুকুরের সব মাছ ছেড়ে দেওয়ার নাম করে গাছের নিচে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেলল। মাছদের কাটার স্তুপ হয়ে গেল সেই গাছের নিচে। বক যে এভাবে তাদের খেয়ে যাবে তারা তা বিন্দু মাত্র সন্দেহও করেনি। তারা সরল বিশ্বাসে নিজেদের বকের কাছে সমর্পণ করছিল। এইভাবে পুকুরের সব মাছ যখন শেষ হয়ে গেল তখন শুধুমাত্র একটি কাঁকড়া পড়ে রইল। বক তখন কাঁকড়াকে বলল, 'পুকুরের সব মাছকে সেই পদ্ম সরোবরে দিয়ে এসেছি। এবার তোমার পালা চল তোমাকেও রেখে আসি।' তখন কাঁকড়া বলল, তুমি আমাকে কিভাবে নিয়ে যাবে? আমি তোমার ঠোঁটে যেতে পারব না। আমার শক্ত মসৃণ দেহটাকে তোমার ঠোঁট দিয়ে ধরলেই তা পিছলে মাটিতে পড়ে যাবে এবং আমার হাড় গোড় ভেঙ্গে যাবে। তার চেয়ে আমি আমার দাঁড়দুটো দিয়ে তোমার গলাটাকে জড়িয়ে ধরবো। এইভাবে নিয়ে যেতে পারলে আমি তোমার সাথে যেতে রাজি আছি। কাঁকড়া আসলে মাছদের মত বককে বিশ্বাস করত না। মাছদের সরোবরের জলে ছেড়ে দিয়ে এসেছে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে তার। তাই সে বকের কথা বিশ্বাস করল না। এদিকে কাঁকড়ার কথা বিশ্বাস করে ফেলল বক। কাঁকড়া যেভাবে চাইলো বক সেভাবেই তাকে নিয়ে যেতে রাজি হলো। কাঁকড়া বকের গলায় শিংদুটো দিয়ে শক্ত করে ধরল আর বক তাকে নিয়ে উড়ে যেতে থাকল। বকের মূল উদ্দেশ্য ছিল কাঁকড়াকে খাওয়ার। বক তাই কাঁকড়াকে সরোবরে না নিয়ে সেই গাছতার তলায় নিয়ে গেল যেখানে সে সব মাছদের খেয়েছিল। মাছের কাঁটার স্তূপ দেখে কাঁকড়া ঘটনাটি বুঝে ফেলল ও বককে প্রশ্ন করল কেন সরোবরে না নিয়ে গিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে বক বলল, সে তাকে খাবে বলেই এখানে নিয়ে এসেছে।

কাঁকড়া তখন বলল, 'মরতে হলে দুজন একসাথে মরব। তোমাকে মজা দেখাচ্ছি। আমি তোমার গলা কেটে ফেলে দিব।' এই বলে কাঁকড়া প্রাণপণ শক্তিতে বকের গলা চেপে ধরল। বক তীব্র যন্ত্রনায় সহ্য করতে না পেরে কেঁদে কেঁদে বলল, সে ভুল করেছে, তাকে ক্ষমা করতে। কাঁকড়াকে বক সরোবরে নিয়ে যেতে রাজী হল। বক যখন কাঁকড়াকে তুলে নিয়ে সরোবরে ছেড়ে দিল। তখন কাঁকড়ার সব মাছদের হত্যার প্রতিফলন স্বরুপ অবলীলা ক্রমে বকের গলা কেটে ফেলল। বৃক্ষ দেবতারুপী বোধিসত্ত্ব এই ঘটনাটি দেখে কাঁকড়ার কর্মকে সমর্থন করে "সাধু সাধু" বলে উঠলেন। তিনি তখন এই গাথাটি বললেন যার অর্থ দাড়ায়-"যে ব্যক্তি সর্বদাই প্রবঞ্চনা পরায়ণ, সে তার সারা জীবনে কখনো সুখ ভোগ করতে পারে না। তার স্বাক্ষী হল এই প্রবঞ্চক বক। সে তার কর্মের ফল স্বরূপ কাঁকড়ার দংশনে প্রাণ ত্যাগ করে নরকে গেল।[১৯]

উপরোক্ত জাতকেও আমরা লোভের প্রতিফলন দেখতে পেলাম মৃত্যু। অতিরিক্ত লোভই ধূর্ত বককে মৃত্যু মুখে পতিত করেছে। বকটি তার অসৎ চিন্তা ও অসৎ উদ্দেশ্য দ্বারা সহজ সরল মাছদের প্রবঞ্চিত করতে পারলেও

কাঁকড়াকে পারেনি। অসৎ কর্মের এক অসাধারণ উদাহরণ হলো এই বক জাতক। বকের অকুশল কর্মের ফলাফল স্বরূপ তার যেমন অকাল মৃত্যু হল, তেমনি তার নরক প্রাপ্তিও নিশ্চিত হলো। অর্থ্যাৎ অকুশল কর্ম করে কেউ মুক্তি পাবে না। বকের পাপের কলসি পূর্ণ হওয়ায় তার এই পরিণতি হল। সুতরাং, সর্বদা অসৎ চিন্তা, অসৎ কর্ম পরিহার করে কুশল কর্মে ব্রতী হতে হবে।

কর্মবাদের একটি অতি গুরুত্বপুর্ণ বিষয় হলো একতাই বল। যখন কোন কর্ম একা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন সেই কাজটি কয়েকজন মিলে সম্মিলিত প্রচেষ্টা করলেই সহজ হয়ে যায়। আবার ঐক্যবদ্ধ শক্তিতে যদি কোন বিভাজন সৃষ্টি হয় তাহলে সেই কর্ম করা যেমন দুরূহ হয়ে পড়ে, তেমনি যদি কোন শত্রু পক্ষ থাকে, তাহলে তারা সেই বিভাজনের সুযোগ নিয়ে দুর্বল করে ফেলতে পারে। এমনি একটা উদাহরণ পাই আমরা সম্মোদমান জাতকে। নিচে এই কাহিনির শিক্ষণীয় দিকটি তুলে ধরা হলো।

প্রাচীনকালে বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব একবার শকুনরুপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হাজার হাজার শকুনের সাথে বনে বাস করতেন। একদিন এক শকুনি ব্যাধি সেই বনে এসে উপস্থিত হলো। শকুন বধই ছিল তার পেশা। সেই ব্যাধ হুবহু শকুনিদের স্বর নকল করতে পারত। সে শকুনিদের স্বর করে ডাকত। যখন সেই ডাক শুনে অন্য শকুনিরা এক জায়গায় এসে জড়ো হত, তখন সে জাল ফেরে শকুনিদের জালে আবদ্ধ করত। তারপর সে শকুনদের ঝুড়িতে ভরে বিক্রি করতে নিয়ে যেত। এই ভাবে সে জীবিকা নির্বাহ করত। এইভাবে শকুনদের সংখ্যা ক্রমশ কতে থাকল। একদিন বোধিসত্ত্ব শকুনদের ডেকে বললেন, "দেখ, এই শকুনিক আমাদের জ্ঞাতি বন্ধুদের নির্মূল করতে এসেছে। আমি একটি উপায় জানি তা অবলম্বন করলে ব্যাধ আমাদের আর ধরতে পারবে না। এখন থেকে তোমাদের উপর জাল ফেলা মাত্র তোমরা জালের প্রতিটি ছিদ্র দিয়ে মুখ বের করবে এবং জালসহ উড়ে গিয়ে কাঁটা গাছের উপর নামবে।" সকলেই এই প্রস্তাবে সম্মত হলো।

পরদিন ব্যাধ শকুন ধরার জন্য জাল ফেলল। কিন্তু বোধিসত্ত্বের উপদেশ মত একসাথে জাল নিয়ে উড়ে গেল। তার পর সেই জালটা একটা কাটা গাছে আটকে দিয়ে নিজেরা জালের নিচ দিয়ে পালিয়ে গেল। ঐ কাটাগাছ থেকে জাল উদ্ধার করতেই ব্যাধ সারাদিন পার করে ফেলল। সন্ধ্যার সময় খালি হাতেই বাড়ি ফিরল।এরপর থেকে শকুনরা প্রতিদিনই একই পন্থা অবলম্বন করতে লাগল আর ব্যাধ প্রতিদিন সূর্যাস্ত পর্যন্ত জাল ছাড়াবার কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রতিদিনই খালি হাতে বাড়ি ফিরতে লাগল। প্রতিদিনই একই ঘটনা দেখে স্ত্রী তখন রেগে গিয়ে বলল, "তুমি প্রতিদিনই খালি হাতে বাসায় আসো। তোমার হয়ত অন্য কোথাও স্ত্রী আছে। যা রোজগার কর, তাকেই হয়ত সম্পূর্ণটা দিয়ে আসো।"

ব্যাধ বলল, আমার অন্য কোথাও অন্য কোনো স্ত্রী নেই। প্রকৃত ঘটনাটা হলো, শকুরনরা এখন একসাথে মিলে মিশে চলছে। আমি যখনই তাদের উপর জাল ফেলি, তখন তারা জলটাকে নিয়ে উড়ে গিয়ে কাঁটা গাছের উপর

বসে। সেখানে জাল আটকে তারা পালিয়ে যায়, ফলে কাটা থেকে জাল ছাড়াতে আমার সারাদিন চলে যায়। তবে ভরসা এই যে, সারাজীবন ওদের মধ্যে এই একতা থাকবে না। ওদের মধ্যে যখন ঝগড়া শুরু হবে, তখন ওদের সবগুলোকে ধরে তোমাকে দিয়ে তোমার হাসিমুখ দেখব। এরপর একদিন শকুনরা যেখানে উড়ে বেড়ায় সেখানে নামার সময় এক শকুন ভুলবশত আরেক শকুনের মাথার উপর এসে পড়ল। যার মাথার উপর পড়ল, সেই শকুন রেগে গিয়ে অন্য শকুনকে বলল, কে আমার মাথায় পা দিলরে?" প্রথম শকুনটি বলল, "ভাই, হঠাৎ অন্যায় করে ফেলেছি, তুমি রাগ করো না।" কিন্তু এত বিনয়ের সাথে কথায়ও তার রাগ কমল না। সে বলল, "বড় যে স্পর্ধা দেখছি, মনে হচ্ছে তুমি একাই জাল নিয়ে উড়ে যাও।" তখন বনের মধ্যে বাক-বিতর্ক ও তর্কাতর্কি চলতে লাগল। কেউ কাউকে ছাড় দিতে রাজি নয়। পরস্পর বিদ্রুপ করতে লাগল। এই সব দেখে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, যারা কলহ প্রিয় তাদের সাথে থাকা উচিত নয়। এখন দেখছি এর একত্রে জাল গিয়ে উড়ে যাবে না। তাতে ব্যাধের সুবিধা হবে, সে সব শকুনদের সহজেই ধরে ফেলবে। এই ভেবে সে তার পরিজন বর্গকে নিয়ে অন্যস্থানে চলে গেলেন। বোধিসত্ত্ব যা ভেবে ছিলেন তাই হলো। কয়েকদিন পর ব্যাধ আবার জাল ফেলল। তখন শকুনরা একে অন্যকে জাল তুলতে বলতে লাগলেন। এক শকুনি অন্য শকুনিকে বলতে লাগলো, "শুনতে পাই জাল তুলতে তুলতে তোমার মাথায় লোম উঠে গেছে।" দ্বিতীয় শকুনিটি বলল, শুনেছি, "জাল তুলতে তুলতে তোমার মাথায় পালক উঠে গেছে। এবার জাল তোল। কার কত শক্তি দেখা যাবে।" এই ভাবে শকুনিরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও বিদ্রুপ করতে থাকল। কেউ তাদের মধ্যে জাল তুলল না। তখন ব্যাধ নিজেই জাল তুলল। পরে শকুনদের এক জায়গায় জড়ো করে তার ঝুড়িতে ভরে নিল। তারপর সেগুলো নিয়ে তার স্ত্রীকে দিলে তার স্ত্রীর মুখে হাসি দেখা দিল।[২০]

উপরোক্ত জাতকে আমরা শিক্ষণীয় একটি ঘটনা দেখতে পাই। জ্ঞাতিবিরোধ খুবই গহিত কর্ম। যতদিন সকলে মিলে মিশে থাকা যায় ততদিন শত্রু কিছু করতে সক্ষম হয় না। কিন্তু পরস্পরের বিবাদ, বিভাজন শুরু হলেই সর্বনাশের উৎপত্তি হয়। শকুনরা যতদিন বোধিসত্ত্বের কথা মান্য করে একই সাথে তাদের কর্ম সম্পাদন করছিল, ততদিন ব্যাধ খালি হাতেই বাড়িতে ফিরতে বাধ্য হয়েছিল। আবার সামান্য একটু ঘটনায় তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হলে, ব্যাধ সেই সুযোগ নিলেন ও শকুনদের অকাল মৃত্যু পরিণতি হলো। তারা যদি তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতো তাহলে হয়তো তাদের এই করুন পরিনতি দেখতে হত না। তাই যে কুশল কর্ম একার প্রচেষ্টায় করা সম্ভব নয় তা যদি কয়েকজন মিলে করার ফলে সকলের উপকার হয় তাহলে সেই কুশল কর্ম ও একতার সাথে করাই উচিত।

বৌদ্ধদর্শনে যে কয়েকটি বিষয়কে কঠোরভাবে বিধি নিষেধ করা হয়েছে তাদের মধ্যে ব্যভিচার অন্যতম। ব্যভিচার অর্থ বিপরীত বা অন্যায় আচরণ, অন্যথাচরণ, স্ত্রী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি। পঞ্চশীল,

অষ্টশীল, দশশীলে ব্যাভিচারের কুফল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। একটি পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি ধ্বংস করতে ব্যভিচার খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি সুখের সংসার নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে ব্যভিচারের কারণে। নিচে দুইটি জাতকে ব্যভিচারের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রাচীনকালে বারানসী রাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব রাজার প্রধান স্ত্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিল। তার নাম রাখা হয়েছিল পদ্মকুমার। পদ্মকুমারের পরে তার আরও ছয়টি ভাই জন্মগ্রহণ করেন কালক্রমে সাত রাজকুমার বড় হয়ে বিবাহ করে রাজার সহচর রূপে বাস করতে লাগলেন। একদিন রাজা তার ঘরের জানালা থেকে দেখল, রাজ কুমারের অনেক অনুচর সাথে নিয়ে রাজার সাথে দেখা করতে আসছে। তার মনে হলো তারা তাকে হত্যা করে রাজ্য দখল করতে পারে। অনেক রাজপুত্রই পূর্বে রাজ্যের জন্য পিতাকে হত্যা করে সিংহাসন আরোহণ করেছেন। এই চিন্তা করে তিনি রাজ কুমারদের ডেকে রাজধানী থেকে চলে যেতে বললেন। তিনি মারা গেলে এসে পিতৃরাজ্য গ্রহণ করার কথা বললেন।

পিতার আদেশ রক্ষার্থে রাজকুমাররা কাঁদতে কাঁদতে নিজের স্ত্রীদের নিয়ে রাজধানী থেকে বের হয়ে গেলেন। তারা ঠিক করলেন, যেখানে গিয়ে হোক, যেভাবেই হোক, নিজেরাই জীবিকা অর্জন করে জীবন যাপন করবে। কিছুদিন পর তারা মরুভূমির মত এক জলবিহীন দেশে পৌছালেন। সেখানে খাদ্য পানীয় কিছু পাওয়া না যাওয়ায় অত্যান্ত ক্ষুধার্ত হয়ে পড়লেন এবং কোনো উপায় না দেখে তারা স্থির করলেন, সব ভাইয়েরা তাদের স্ত্রীদের হত্যা করে তাদের মাংস খেয়ে প্রাণ বাঁচাবে। কারণ বেঁচে থাকলে স্ত্রীর অভাব হবে না। এই কথা বলার পর তারা প্রথমে ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে হত্যা করে মাংস তেরো ভাগ করে খেলেন। বোধিসত্ত্ব তার ও তার স্ত্রীর অংশ থেকে এক ভাগ না খেয়ে রেখে দিলেন। এই ভাবে ছয় দিনে ছয় ভাইয়ের স্ত্রীদের হত্যা করা হল। এরপর বড় ভাই বোধিসত্ত্বের স্ত্রীর পালা এলে বোধিসত্ত্ব জমিয়ে রাখা ছয় ভাগ মাংস ছয় ভাইকে খেতে দিলেন। নিজে কিছুই খেলেন না। তারপর রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বোধিসত্ত্ব স্ত্রীকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

সূর্য ওঠার আগেই তারা মরুপ্রদেশ ত্যাগ করতে পারল। কিন্তু যেখানে গেল, সেখানেও জল নেই। তার স্ত্রী পথ চলতে না পারায় বোধিসত্ত্ব তাকে কাঁধে নিয়ে পথ চলতে লাগলেন। বোধিসত্ত্বের স্ত্রী পিপাসায় কাতর হয়ে পড়লেন। কিন্তু কোথাও কোন জলের দেখা পেলেন না। এদিকে স্ত্রী পিপাসা সহ্য করতে না পারায় বোধিসত্ত্ব নিজের জানুর মাংস কেটে স্ত্রীকে রক্ত খেয়ে তৃষ্ণা মেটাতে বললেন। আর স্ত্রী তাই করলেন। অবশেষে তারা হাটতে হাটতে গঙ্গার তীরে পৌছালেন। তখন দুজনে গঙ্গার জল পান করে স্নান করে নিলেন। তারপর বনের কিছু ফলমূল খেয়ে সুস্থ হয়ে এক জায়গায় বসে বিশ্রাম নিলেন। পরে সেখানে লতা পাতা দিয়ে কুটির তৈরি করে বাস করতে থাকলেন।

একদিন গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে রাজদ্রোহিতার অপরাধে এক দস্যুর হাত পা কেটে একটি ডোঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লোকটি তীব্র যন্ত্রনায় প্রচন্ড চিৎকার করতে করতে ভেসে যাচ্ছিল। বোধিসত্ত্ব তার করুন আর্তনাদ শুনতে পেয়ে তাকে তার গৃহে নিয়ে আসলেন। তার ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে তাকে ওষুধের প্রলেপ দিয়ে দিলেন। তাকে ফলমূল খেতে দিয়ে তার থাকার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তার স্ত্রী ভাবলেন কি আপদ এসে জুটল? একে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে হবে। লোকটাকে দেখলেই তার এমন ঘৃণা উৎপন্ন হত যে, তিনি"ছ্যা ছ্যা" করে থুথু ফেলতেন। লোকটার সেবার জন্য কয়েকদিন ফলমূল আনতে যেতে পারেননি বোধিসত্ত্ব। লোকটির গা শুকাতে থাকলে আবার বনে যেতে লাগল। কুটিরে শুধু তার স্ত্রী ও সেই লোকটি থাকত। সারাদিন একসাথে থাকতে বোধিসত্ত্বের স্ত্রী লোকটির প্রেমে পড়ে গেলেন এবং দিনের পর দিন তারা অনাচার করতে লাগলেন। তিনি এতটাই প্রেমাসক্ত হয়ে পড়লেন যে, বোধিসত্ত্বকে হত্যার পরিকল্পনা করতে লাগলেন। অবশেষে একটি উপায় বের করলেন। তিনি বোধিসত্ত্বকে বললেন, তুমি যখন আমাকে কাধে নিয়ে পথ চলছিলে তখন আমি পর্বত দেবতার কাছে মানত করেছিলাম, আমরা যদি নিরাপদ স্থানে পৌছাতে পারি তাহলে তার পূজা দিব।

বোধিসত্ত্ব রাজি হয়ে পূজার উপাচার সংগ্রহ করে স্ত্রীকে নিয়ে সেই পর্বতের শীর্ষে উঠলেন। বোধিসত্ত্বের স্ত্রী বললেন পতিই সতী নারীর প্রধান দেবতা। তাই পর্বত দেবকে পূজা করার আগে তোমাকে পূজা করব। এরপর তিনি বোধিসত্ত্বের চারপাশে প্রদক্ষিণ করার ছলে বোধিসত্ত্বর পিঠে তাকে ধাক্কা দিয়ে পর্বত থেকে নিচে ফেলে দিলেন। এত উচু পর্বত থেকে পড়লে নিশ্চিত মৃত্যু হবে এই চিন্তা করে সেখান থেকে ফিরে অকর্মা লোকটির কাছে গেল। তারা স্বামী স্ত্রী পরিচয়ে বাস করতে লাগলেন। এদিকে বোধিসত্ত্ব পর্বত থেকে নিচে পড়ে যাওয়ার সময় পাহাড়ের গায়ে একটি উড়ুম্বর গাছের মাথায় লতাস্তূপের উপর পড়লেন। কিন্তু সেখান থেকে নেমে পাহাড়ের নিচে যেতে পারলেন না। সেখানে থেকেই গাছের ফল খেয়ে জীবন ধারন করতে লাগলেন। এক বিশাল গোধা বা গোসাপ সেই গাছের ফল খেতেন। প্রথম দিন তিনি বোধিসত্ত্বকে দেখে চলে যান। পরদিন গাছের একদিক থেকে ফল খেয়ে চলে যান। এভাবে প্রতিদিন আসতে আসতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরী হল। বোধিসত্ত্ব তার সব ঘটনা খুলে বললেন। এরপর গোধারাজ তার পিঠের উপর বোধিসত্ত্বকে বসিয়ে নিচে নিয়ে গেলেন। তারপর তাকে বনের বাইরে নিয়ে লোকালয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়ে দিলেন।

বোধিসত্ত্ব সেখান থকে একটি গ্রামে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। কিছুদিন পর রাজার মৃত্যু হয়েছে এই কথা জানার পর সে বারানসী চলে যান ও সেখানে গিয়ে রাজত্ব গ্রহণ করেন। এদিকে বোধিসত্ত্বের পাপিষ্ঠা স্ত্রী গঙ্গাতীরে না থেকে লোকালয়ে এসে সেই অঙ্গহীন লোকটাকে কাঁধে করে গ্রামে রাজধানীতে ভিক্ষা করে বেড়ায়। এই ভাবে সে লোকটার ভরণ পোষণ করে বেড়ায়। কেউ লোকটার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে সে বলে,

"আমার মা বাবা এর সঙ্গে আমাকে বিয়ে দিয়েছে, এর আত্মীয় স্বজনেরা কেউ একে দেখে না। কিন্তু ছিন্নাঙ্গ হলেও এ আমার স্বামী, আমি ওকে কোথায় ফেলব? তাই খুব কষ্ট হলেও একে ভিক্ষা করে খাওয়াই।" তার এই কথা শুনে মানুষ জন তার প্রতি সহানুভূতি জানায়। তাকে বেশি করে ভিক্ষা দেয় আর বলাবলি করে, মেয়েটি সতিসাধ্বি পতিব্রতা।

অনেকে তাকে পরামর্শ দেয় বারানসী নগরের রাজা পদ্মরাজ প্রচুর পরিমাণে দান করেন। তুমি তার কাছে যাও। তিনি তোমার একটি ব্যবস্থা করে দিবেন। যাতে চিরদিনের মত তোমার দুঃখ কষ্ট ঘুচে যায়। সেই খারাপ মহিলা অঙ্গহীন দস্যুকে ঝুড়িতে রেখে মাথায় চাপিয়ে বারনসীতে গেল। বোধিসত্ত্ব তখন রাজধানীতে চারটি দানশালা ও রাজবাড়ির কাছে দুটি দানশালা নির্মাণ করে, গরীব দুঃখীদের লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করেন। খারাপ মহিলাটি সেই অঙ্গহীন লোকটাকে নিয়ে একটি দানশালায় খাবার খেয়ে দিনানিপাত কর ছিলেন। একদিন বোধিসত্ত্ব সেই দান শাল পরিদর্শনে গিযে কয়েকজনকে নিজের হাতে দান দিয়ে ফিরে আসছিলেন। তখন তার স্ত্রী ঝুড়িতে বসা সেই লোকটিকে নিয়ে বোধিসত্ত্বের সামনে উপস্থিত হলেন। বোধিসত্ত্ব তাদের দেখা মাত্রই চিনতে পারলেন, তবু তাকে ঝুড়ি থেকে নামাতে বলে জিজ্ঞাসা করলেন, "এ তোমার কে হয়?" দুষ্ট মহিলাটি সবাইকে যা বলে রাজাকে ও তাই বললেন। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞাসা করলেন, "এ তোমার স্বামী?" রমনী বললেন, "হ্যাঁ মহারাজ"। বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, "তবে এই ব্যক্তি কি বারানসী রাজের পুত্র? তুমি না বারানসী রাজের বড় ছেলে পদ্ম কুমারের স্ত্রী? অমুক রাজার কন্যা? তোমার নাম অমুক। তুমি না এই বিকলাঙ্গ এই লোকের প্রেমে পড়ে আমাকে পর্বতচূড়া থেকে ফেলে দিয়েছিলে? ভেবেছিলে আমি মারা গিয়েছি। তাই তুমি এখন এসেছ তোমার শাস্তি গ্রহণ করতে। আমি এখনো বেঁচে আছি।" বোধিসত্ত্ব তখন আমাত্যদের বললেন, "তখন আমি আপনাদের কি বলেছিলাম তা মনে আছে? আমার ছয় ভাই তাদের স্ত্রীদের হত্যা করে মাংস খেয়েছিল। কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে রক্ষা করেছি। তারপর গঙ্গাতীরে কুটির নির্মাণ করে বাস করছিলাম। এই ছিন্নাঙ্গ লোকটাকে রক্ষা করে সুস্থ করে ভুলেছিলাম। আমার পাপীষ্ঠা স্ত্রী এই লোকটির প্রেমে পড়েই আমাকে পাহাড় থেকে ফেলে দেয়। আমি মৈত্রী পারমিতার বলে প্রাণ লাভ করি। আমাকে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়েছিল। আমি যে ছিন্নাঙ্গ লোকটাকে উদ্ধার করি সে আর কেউ নয় এই লোক।" এরপর বোধিসত্ত্ব গাথার মাধ্যমে বলেন, এই পাপীষ্ঠা রমনীকে প্রাণে হত্যা না করে, ওর নাক, কান কেটে দাও শাস্তি স্বরূপ। তিনি এই কথা প্রথমে বললেও পরে অন্য শাস্তি দিলেন। তিনি সেই অঙ্গহীন লোকটাকে ঝুড়িতে বসিয়ে পাপীষ্ঠার মাথায় এমন শক্ত করে বেঁধে দিলেন যে, শত চেষ্টা করে ও সেই ঝুড়ি মাথায় থেকে সেই ঝুড়ি না নামাতে পারে। তারপর তাদেরকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করলেন।[২১]

উপরোক্ত জাতকে আমরা ব্যভিচারের করুন পরিণতি দেখতে পাই। একজন ব্যভিচারীর নানা রকম সমস্যা হয়। ব্যভিচারীর কোন লজ্জা থাকে না। সে যৌন পিপাসা পরিতৃপ্তির নেশায় তার লজ্জা শরম হারিয়ে ফেলে। বৈধ অবৈধের মধ্যে কোন পার্থক্য সে খুঁজে পায় না। এর মাধ্যমে বিবাহ, পরিবার ও সন্তান সন্তুষ্টির প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি হয়। ফলে, আবহমান কাল ধরে চলে আসা পরিবার প্রথা ধ্বংস হয়ে যায়। বোধিসত্ত্ব তার স্ত্রীর জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন। তার নিজের শরীরের রক্ত পান করিয়ে তার স্ত্রীর জীবন বাঁচিয়েছেন। কিন্তু তার স্ত্রী ব্যভিচারে রত হওয়ায়, কুশল অকুশল কর্মের পার্থক্য বুঝতে পারে না। সে বোধিসত্ত্ব প্রাণ হরণের চিন্তা করেন ও পরিকল্পনার অংশটি সেরে তাকে পাহাড়ের চূড়া থেকে ফেলে দেয়। কর্মবাদের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, অকুশল কর্মের ফলাফল পৃথিবীতেও পেতে হয়। তার ব্যভিচার নামক অকুশল কর্মের ফল স্বরূপ সে রানীর পদমর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়। অঙ্গহীন ব্যক্তিকে নিয়ে পথে পথে ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করতে হয়। অকুশল কর্ম কখনো কুশল ফলাফল আনতে পারে না। তাই উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে উপরি উল্লিখিত রাক্ত জাতক।

ব্যভিচার এমন একটি খারাপ মানসিক ব্যাধি যার ফলে একজন মানুষের নৈতিকতার চরম স্থলন হয়। হিতাহিত জ্ঞান শূণ্য হয়ে যায় সে ব্যক্তি। সে সমাজ, রাষ্ট্র, পরিবার ও পারিপার্শ্বিক সব ভুলে ব্যভিচার করার জন্য সে পাগল হয়ে যায়। ফলে ঘটে নানা রকম অনাচার ও অত্যাচার । এমনি একটি নৈতিক স্থলনের মাধ্যমে সর্বোচ্চ পতনের উদাহরণ হলো "মণিচোর জাতক"।

প্রাচীন কালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বারানসী নগরের অদূরে এক গ্রামে এক গৃহস্থের পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব বড় হলে তার আত্মীয় স্বজন বারানসীর এক কুলকণ্যার সাথে বিয়ে দেন। কন্যার নাম সুজাতা। পরম রুপবতী ছিলেন সুজাতা। তার গায়ের রং ছিল তপ্ত স্বর্ণের মত উজ্জ্বল। পুষ্পলতার মতো সুললিত ছিল তার দেহ। তিনি যেমন পতিব্রতা ছিলেন। তেমন ছিলেন শীল সম্পন্না ও কর্তব্য পরায়ণা। তিনি প্রতিনিয়ত স্বামী ও শ্বশুড় শাশুড়ির সেবা করতেন। তিনি বোধিসত্ত্বের খুব প্রিয় ছিলেন। তারা স্বামী স্ত্রী পরমসুখে দুজনে বসবাস করত। একদিন সুজাতা তার স্বামী বোধিসত্ত্বকে বললেন, তিনি তার বাবা মাকে দেখতে চান। বোধিসত্ত্ব সাথে সাথে রাজী হয়ে গেলেন। পথ ভ্রমণের উপযুক্ত খাদ্য সুজাতাকে প্রস্তুত করতে বললেন। বিভিন্ন রকমের খাদ্য প্রস্তুত করে বোধিসত্ত্ব গাড়িতে তুললেন। তারপর সুজাতাকে গাড়ির পিছনে বসিয়ে নিজেই গাড়ি চালাতে লাগলেন। তার বারাণসীর কাছে গিয়ে গাড়ি খুলে দিয়ে স্নান করলেন ও খাদ্য গ্রহণ করলেন। সুজাতা তার পোশাক পরিবর্তন করে সুন্দর পোশাক ও অলংকার পরে গাড়ির পিছনে বসে রাজধানীর উদ্দেশ্যে যেতে লাগলেন।

এই সময় বারাণসীর রাজা হাতির পিঠে চড়ে রাজধানী প্রদক্ষিণ করছিলেন। এমন সময় বোধিসত্ত্বের গাড়িটি রাজার হাতির সামনে এসে পড়ল। রাজা সুজাতাকে দেখে তার অপরূপ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হয়ে পড়লেন।

তিনি এক আমাত্যকে ডেকে বললেন, তার স্বামী আছে কিনা দেখে আসার জন্য। আমত্য ফিরে এসে জানালো যে, রমণীটি বিবাহিত এবং যিনি রথ চালাচ্ছেন তিনি ওই মহিলাটির স্বামী।

কিন্তু সুজাতাকে দেখে রাজার মনে দুর্বার কামভাব উৎপন্ন হলো যা তিনি দমন করতে পারলেন না। তিনি ঠিক করলেন, যেভাবেই হোক লোকটিকে মেরে ঐ রমনীকে লাভ করতে হবে। তিনি একজন অনুচরকে ডাকলেন তাকে বললেন, এই চূড়ামণিটি নাও। রাস্তা দিয়ে এমন ভাবে যাবে যেন মনে হয় তুমি এভাবেই এই পথ অতিক্রম করছ। তারপর চূড়ামণিটি ওই গাড়ির মধ্যে কৌশলে ফেলে দিয়ে আসবে। অনুচর চূড়ামণি নিয়ে গাড়িতে ফোন দিয়ে এসে রাজাকে জানালো। রাজা তখন চিৎকার শুরু করে বলতে শুরু করলেন তার চূড়ামণি চুড়ি হয়ে গেছে। রাজধানীর সব গেট বন্ধ করে দাও। কেউ যাতে বাইরে যেতে না পারে। চোরকে ধর। সকলে তখন ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি শুরু করল। তখন যে অনুচরটি গাড়ির মধ্যে চূড়ামণি ফেলে দিয়েছিল, সে আর ও কয়েক জনকে নিয়ে বোধিসত্ত্বের গাড়ির সামনে গিয়ে বলল, "ওহে বাপু, গাড়ি থামাও। রাজার চূড়ামনি চুরি হয়েছে। তোমার গাড়ি খোঁজ করে দেখতে হবে।" লোকটি তখন গাড়ির ভিতরে খোঁজার অভিনয় করে মণিটি তুলে এনে রাজাকে বলল, এই গাড়িতে মণিটি পাওয়া গিয়েছে।

রাজা বোধিসত্ত্বের শিরচ্ছেদ করার আদেশ দিলেন। রাজার অনুচরেরা বোধিসত্ত্বকে বেঁধে মারতে মারতে নগরের বাইরে শ্মশানের দিকে নিয়ে যেতে থাকল। সুজাতা কাঁদতে কাঁদতে বোধিসত্ত্বের পিছুপিছু ছুটতে লাগলেন। তিনি বললেন, আমার স্বামীর কোন দোষ নেই। আমরা নিষ্ঠার সাথে সব সময় শীলব্রত পালন করে আসছি। আমাদের মত শীলবান মানুষদের রক্ষা করার জন্য কি কোন দেবতা এ জগতে নেই?" সুজাতা কাঁদতে কাঁদতে বারবার এই কথা বলতে থাকলে দেবরাজ শক্রর আসন উত্তপ্ত হয়ে উঠল। শক্র সব কিছু জানতে পেরে স্বশরীরে বারাণসীতে পদার্পণ করলেন। সে সময় ঘাতক বোধিসত্ত্বকে চিৎকার শুইয়ে তার শিরচ্ছেদ করতে উদ্যত হয়েছিল শক্রকে দেখে যে থেমে গেল। দেবরাজ শক্র সকলের সামনে রাজার কুকীর্তি প্রকাশ করলেন। হাতির পিঠ থেকে পাপীষ্ঠ রাজাকে নামিয়ে ঘাতকের সামনে চিৎ করে শোয়ালেন এবং বোধিসত্ত্বকে রাজ বিভূষণে সজ্জিত করে হাতির পিঠে বসালেন। ঘাতককে দিয়ে সেই পাপীষ্ঠ রাজার শিরচ্ছেদ করালেন।

তারপর দেবরাজ বোধিসত্ত্বকে রাজপথে অভিষিক্ত করালেন এবং সুজাতাকে অগ্রমহিষীর পদ দিলেন। তারপর জনসাধারণের উদ্দেশ্যে বললেন, "এই শীলবান ব্যক্তিটিই তোমাদের রাজা হবে। এর সুশাসনে তোমরা সুখে বসবাস করবে। রাজা অধার্মিক হলে অকালে প্রবল বর্ষণ হয় এবং প্রয়োজনে বর্ষণ হয় না। প্রজারা দস্যু ও দুর্ভিক্ষের দ্বারা উৎপীড়িত হয়।" এই বলে দেবরাজ স্বর্গলোকে চলে গেলেন। তখন নগরবাসীরা খুশি হলেন এবং বোধিসত্ত্বের শাসনে সুখে বাস করতে লাগলেন।[২২]

উপরোক্ত জাতকে আমরা শিক্ষণীয় একটি ঘটনা দেখতে পাই। এখানে দেখানো হয়েছে শুধু ব্যভিচার করলেই যে তার ফলাফল অশুভ হবে তা নয়, ব্যাভিচারের ইচ্ছাও অশুভ ফলাফল নিয়ে আসে। মণিচোর জাতকে আমরা যে রাজাকে দেখতে পাই, তিনি যদি তার ইন্দ্রিয়কে দমন করে, অপরের স্ত্রী লাভের কুবাসনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারতেন, তাহলে হয়তো তিনি আরো কিছুদিন বাঁচতে পারতেন। কিন্তু ব্যাভিচারের বাসনা তার মনকে এতটাই লোলুপ করে তুলেছিল যে, তিনি কুশল ও অকুশল কর্মের পার্থক্য বুঝতে পারলেন না। একজন শীলসম্পন্ন ব্যক্তিকে তিনি হত্যা করার আদেশ দিয়ে বসলেন। কিন্তু একজন শীলবান মানুষের কর্ম কখনও বৃথা যায় না। শীলবান ব্যক্তির আকুতিতে স্বয়ং দেবরাজ পৃথিবীতে পদার্পন করেন এবং দুষ্টের দমন করেন ও শিষ্টের পালন করেন। অত্যাচারী রাজা তারা অকুশল কর্মের ফলাফল হাতে নাতে পান। তার মৃত্যু নিশ্চিত হয় এবং শীলবান ব্যক্তি শীল পালনের সুফল ও সাথে সাথে পান। দীর্ঘদিন শীলজনিত সুকর্মের ফলে অন্যায়ের হাত থেকে মুক্তি পান। স্বয়ং দেবরাজের মাধ্যমে তার রাজ্যভিষেক হয়। বোধিসত্ত্বের স্ত্রী তার সতীত্ব অক্ষুন্ন রাখতে পারেন এবং অগ্রমহিষীর পদমর্যাদা প্রাপ্ত হন। তাই অকুশল কর্ম ভুলবশত করার আগেও শতবার চিন্তা করতে হবে এবং কুশল চর্চা বারবার চালিয়ে যেতে হবে।

কোনো উপকারীর উপকার স্বীকার করাকে কৃতজ্ঞতা, উপকার স্বীকার না করাকে অকৃতজ্ঞতা এবং উপকারীর অপকার করাকে কৃতঘ্ন বলে। উপকারীর উপকার স্বীকার করা এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে সেই উপকারীর উপকার করাই হলো কুশল কর্ম এবং উপকারীর উপকার স্বীকার না করা এবং ক্ষতি করতে চাওয়া হচ্ছে এমন অকুশল কর্ম। আমরা জানি যে, অকুশল কর্মকারীর ফলাফলও অকুশল হয়। এমনি একটি জাতক কাহিনি হচ্ছে "সতং-কিল-জাতক"। এই গল্পটির মাধ্যমে আমরা অকৃতজ্ঞের ফলাফল দেখতে পাব।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের দুষ্টু কুমার নামে এক পুত্র ছিল। তার নাম যেমন ছিল, তার স্বভাব ও তেমন ভয়াবহ ছিল। সে ছিল প্রচন্ড নিষ্ঠুর। সকলকে গালাগালি করা, তাদের শরীরে আঘাত করা ছিল তার নিত্য কর্ম। তাকে দেখে সকলেই ভয় পেত মনে হত একটা রাক্ষস বোধ হয় তাদের গ্রাস করতে আসছে। একদিন দুষ্টুকুমার তার অনুচরদের নিয়ে নদীতে জল কেলি করতে গেল। যখন নদীতে জল কেলি করছিল, তখন প্রচন্ড ঝড় উঠল। সে তার অনুচরদের বলল, মাঝ নদীতে স্নান করিয়ে আনতে। এই সুযোগে অনুচররা তার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তাকে মাঝ নদীতে ফেলে চলে আসল। যখন তাকে পাওয়া যাচ্ছিল না তখন অনুচরদের জিজ্ঞাসা করলে তার বলে, ঝড় বৃষ্টি দেখে হয়তো রাজকুমার আগেই ফিরে গেছেন। রাজাও অনেক খোঁজ খবর করে না পেয়ে হতাশ হয়ে বাড়িতে ফিরল।

এদিকে দুষ্টু কুমার অসহায়ভাবে চিৎকার করতে করতে স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল। এমন সময় একটি বড় কাঠ ভেসে আসছে দেখে তার উপর চেপে বসল। পরে দেখল একটি সাপ, একটি ইদুর ও একটি শুক

পাখি ও ভাসতে ভাসতে সেই কাঠের উপর আশ্রয় নিলো।ঐ সাপ ও ইদুর পূর্ব জন্মে কৃপণ ব্যবসায়ী ছিলেন। এই দুজন ব্যবসায়ীই তাদের সঞ্চিত চল্লিশ কোটি ও ত্রিশ কোটি মুদ্রা এক জায়গায় গর্ত করে পুঁতে রাখে। মৃত্যুর পর সেই সম্পত্তি পাহারা দেবার জন্য একজন সাপ ও আরেকজন ইদুর হয়ে সেই গর্তে ঢুকে পাহারা দিতে থাকে। প্রবল বর্ষণে সেখানে জল ঢুকে যাওয়ায় তারা ভাসতে ভাসতে কাঠের খন্ডে আশ্রয় নেয়। শুক পাখিটি নদীর তীরে একটি গায়ে বাস করত। প্রচন্ড ঝড়ে গাছ উপড়ে নদীতে পড়ে যায় আর শুক পাখিটি সেই কাঠের খন্ডে আশ্রয় নেয়। এই ভাবে একটি কাঠের খন্ডে চারটি প্রাণী আশ্রয় নেয়।

সেই সময় বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করে ঐ নদীর তীরে এক কুটির নির্মাণ করে থাকতেন। রাজকুমারের আর্তনাদ শুনে তিনি তাদের দেখতে পেয়ে একে একে চারজনকে উদ্ধার করে আশ্রমে নিয়ে আসে। আগুন জ্বেলে তাদের শরীর সেকে দিলেন। তারপর ইদুর, সাপ, শুক পাখিকে ফলমূল খেতে দিলেন। এরপর রাজকুমারকে ফল খেতে দিলেন।এতে রাজকুমারের মনে ক্রোধের সঞ্চার হলো। সে ভাবল সে রাজপুত্র। অথচ সন্ন্যাসী আগে ইতর প্রাণীদের সেবা করছে। তিনি মনে মনে বললেন, একে হাতের কাছে পরে গেলে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে একে হত্যা করবে।

দুই একদিনের মধ্যে সকলে সুস্থ হলো। বন্যার জল কমে গেল। একে একে সকলে বিদায় নেবার সময় প্রথমে সাপ বললেন, অমুক স্থানে আমার অনেক সম্পত্তি আছে। আপনি সেখানে গিয়ে আমাকে ডাক দিলে আমি আমার সব সম্পত্তি আপনাকে দিয়ে দিব। ইদুরও একই কথা বললেন, শুকপাখি বিদায় নেবার সময় বললেন, আমার ধন নেই, কিন্তু ধান আছে। প্রয়োজন হলে ঐ গাছের তলায় আমাকে ডাকবেন। আমি আপনাকে রাশি রাশি ধান সংগ্রহ করে দিব। দুষ্টু কুমার মনের ভাব গোপন করে বলল, রাজপদ পেলে সময় করে রাজ বাড়িতে পায়ের ধুলা দেবেন। আমি যথাসাধ্য উপাচারে আপনার পূজা করব।

এভাবে বোধিসত্ত্ব একদিন কে কিভাবে তার প্রতিজ্ঞা রাখে তা পরীক্ষা করে দেখার সংকল্প করলেন। তিনি প্রথমে সাপের কাছে গিয়ে সাপকে ডাকলে, সাপ বেরিয়ে এসে সব সম্পত্তি দিতে চাইলে বোধিসত্ত্ব প্রয়োজন হলে পরে নিব বলে পর্যায়ক্রমে ইঁদুর ও শুকপাখির কাছে ও একই প্রতিদান পেলেন। সব শেষে তিনি রাজবাড়িতে গেলেন। দুষ্টু কুমার দূর থেকে দেখেই তাকে হত্যা করার আদেশ দিলেন। রাজ কর্মচারীরা তাকে ধরে বেধে চৌরাস্তায় নিয়ে প্রহার করতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব কোন প্রতিবাদ না করে শুধু গাথার মাধ্যমে বললেন, মানুষ আর কাঠ একসঙ্গে ভেসে যাচ্ছে। আমি কাঠ না তুলে মানুষ তুলে ভুল করেছি। কারণ কাঠই বেশি মূলবান।

যখন বোধিসত্ত্বকে প্রহার করা হচ্ছিল তখন অনেক মানুষ এসে জড়ো হয়। তাদের মধ্যে কিছু বৃদ্ধ লোক ছিলো। তারা বোধিসত্ত্বের এই কথার মমার্থ জানতে চাইলেন। বোধিসত্ত্ব সম্পূর্ণ ঘটনা সব জনগনের সামনে বললেন। বোধিসত্ত্বের কথা শুনে বিজ্ঞ লোকেরা বলতে লাগলেন, "আমাদের রাজা কি রকম দেখ। যে ব্যক্তি তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, রাজা তারই প্রাণ বধ করতে যাচ্ছে। যে অকৃতজ্ঞ পিশাচ উপকারীর উপকার স্বীকার করে না তার কোন ক্ষমা নেই।" তখন সকল জনগন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা বলাবলি করতে লাগল, "এমন দুষ্ট রাজা দিয়ে কোন কাজ হবে না। অতএব, তাকে এক্ষুনী মেরে ফেল।" এই বলে তারা লাঠি-সোটা, তীর, বল্লম প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল রাজাকে। নগরের অধিবাসীরা তাদের সাহায্য করলো। রাজার সেনারাও এই পাপীষ্ঠ রাজাকে সাহায্য করল না। রাজা জনরোষ থেকে বাঁচতে পালিয়ে গেল। প্রজাদের আক্রমণে রাজা হাতির পিঠ থেকে মাটিতে পড়ে সাথে সাথে প্রাণ ত্যাগ করলেন। বিশুদ্ধ প্রজারা রাজার দেহকে টেনে আবর্জনায় ফেলে দিল। তারা সকলে সমস্বরে বলল, "এই সন্নাসীই এখন হতে এই রাজ্য শাসন করবে।"
প্রজারা এই বলে তখনি বোধিসত্ত্বকে রাজ প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে যথাসময়ে রাজপদে অভিষিক্ত করল। বোধিসত্ত্ব যথাধর্ম রাজ্য শাসন ও প্রজাপালন করতে লাগলেন। তিনি নিয়মিত দান জনিত পূণ্যকর্ম সম্পাদন করতে লাগলেন। কিছুকাল পরে কয়েকজন অনুচর সঙ্গে নিয়ে সাপের কাছে গিয়ে সাপকে ডাকলেন। সাপ তাকে চল্লিশ কোটি মুদ্রা তুলে দিল। এরপর ইদুরের কাছে গেলে ইদুরও একই ভাবে ত্রিশ কোটি মুদ্রা দিলেন। সবশেষে শুক পাখির কাছে গেলে শুকপাখি বলল, প্রভু আমি ধান সংগ্রহ করে এনে দিব। 'বোধিসত্ত্ব বললেন, প্রয়োজন হলে বলব।'

এই ভাবে তিনি উপকারী বন্ধু সাপ, ইদুর ও শুকপাখিকে নিয়ে রাজ প্রাসাদে গেলেন। তারপর তাদের পরম যত্নের সাথে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করলেন। সাপ ও ইদুরের জন্য শোবার গর্ত ও সুড়ঙ্গ করে দিলেন। শুকপাখির জন্য তৈরী করলেন শোবার খাঁচা। সাপ ও শুক পাখির জন্য মধু মিশ্রিত খই এবং ইদুরের জন্য সুগন্ধি আতপ চাল জোগাড় করে দিলেন বোধিসত্ত্ব। এই ভাবে সাপ, ইদুর, শুক পাখি সহ বিভিন্ন ইতর প্রাণীর সাথে মৈত্রী নীতির সঙ্গে দিন যাপন করতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব রাজ্যের প্রজাদের নিজ সন্তানের মত স্নেহ করতেন। অবশেষে যথাসময়ে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে নিজ কর্মের ফলভোগের জন্য স্বর্গে গেলেন।[২৩]

উপরোক্ত জাতকে অকৃতজ্ঞতার ফলাফল সম্পর্কে সুন্দর উদাহরণ দেখলাম। দুষ্ট কুমারের প্রাণ যখন সংশয়ে ছিল, তখন বোধিসত্ত্ব তাকে উদ্ধার করে, আগুণে সেকে ফলমূল খায়িয়ে সুস্থ করেন। তার সাথে আরও তিনটি ইতর প্রাণীকেও একই ভাবে সেবা শ্রুশুষা করে তাদের সুস্থ করেন। সেই ইতর প্রাণীগুলো বোধিসত্ত্বের উপকার মনে রেখে তার উপকার করতে চাইলেও অকৃতজ্ঞ দুষ্টকুমার বোধিসত্ত্বের প্রাণনাশের আদেশ দেন। এই অকুশল কর্মের ফলাফল তিনি হাতে নাতে পান। জনরোষে তার মৃত্যু হয়। আর কুশল কর্মের ফলাফল ও

বোধিসত্ত্ব পান তখনই। সেই রাজ্যের রাজা হন তিনি। বাকি তিনটি ইতর প্রাণীও তাদের কৃতজ্ঞতার জন্য পুরস্কার লাভ করেন। কোনো উপকারীর উপকার পরবর্তীতে করতে না পারলেও কখনো তার অপকার করা উচিত নয়। আমাদের সকলের যথাসাধ্য চেষ্টা থাকবে যে, যিনি আমাদের উপকার করেছেন, সব সময় তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা এবং তার প্রয়োজনে তাকে উপকার করা।

বৌদ্ধ দর্শনে পঞ্চশীল পালনের কথা খুব গুরুত্বের সাথে বলা হয়েছে। প্রাণী হত্যা না করার কথা বারবার বলা হয়েছে এবং প্রাণী হত্যার কুফল এর ফলাফল সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। সব ধর্ম দর্শনেই প্রাণী হত্যা মহাপাপ বলা হয়েছে। আর সে হত্যা যদি ছলনা করে করা হয় তা আরও বেশি পাপময় হয়। এমনি প্রাণী হত্যার কুফল সম্পর্কে জাতকে অনেক শিক্ষণীয় ঘটনা রয়েছে। তেমনি একটি জাতক হচ্ছে 'চুল্লনিন্দক জাতক' এখানে প্রাণী হত্যার ভয়াবহ দিকটি তুরে ধরা হয়েছে। নিম্নে চুল্লনিন্দক জাতকে প্রাণীহত্যার কুফল ও শিক্ষণীয় দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রাচীনকালে বারানসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব বানররূপে জন্ম গ্রহণ করেন। তার নাম ছিল মহানিন্দক ও তার ভাইয়ের নাম ছিল চুল্লনিন্দক। তারা হিমালয় পর্বত প্রদেশের অর্ন্তগত বনমধ্যে বিচরণ করতেন। আশি হাজার বানর তাদের অনুসরণ করতেন। বোধিসত্ত্বের গর্ভধারিণী মা ছিলেন অন্ধ। বোধিসত্ত্ব তার অন্ধ মাতার দেখাশোনা করতেন। খাদ্য সংগ্রহ করার সময় তিনি তার মাকে রেখে অন্য বানগণের সঙ্গে যেতেন। সব বানরদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও ছিল তার উপর। তাই তিনি কোন সুমিষ্ট ফল পেলে নিজে না খেয়ে অন্য অনুচর দিয়ে তা তার মার কাছে পাঠাতেন। কিন্তু তিনি যে অনুচর বানর দিয়ে তা পাঠাতেন, সে বানর তার মাকে ফল দিত না। ফলে তার মা না খেতে পেয়ে রোগা হয়ে যেতে থাকলেন। বোধিসত্ত্ব তার মায়ের এমন করুন পরিণতির একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমি তোমাকে প্রতিদিন ফল পাঠাই, তবু তুমি কেন এত রোগ হয়ে যাচ্ছ? বৃদ্ধা মা বানরী বলল, 'কই বাপু আমি তো ফল পাই না।'

বোধিসত্ত্ব তখন চিন্তা করলেন, তিনি যদি এই বিশাল বানর যূথের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে ব্যস্ত থাকে তাহলে তার গর্ভধারিনী মা অনাহারেই মারা যাবে। এই ভেবে তিনি তার ছোট ভাই চুল্লনিন্দককে ডেকে যূথরক্ষার ভার নিতে বললেন। তিনি মায়ের সেবা করবে বলে জানালেন। কিন্তু, চূল্লনিন্দক বড় ভাইয়ের কথায় অসম্মতি জানিয়ে বললেন তিনিও তার মায়ের সেবা করবে। এই চিন্তা করে দুই ভাই সেই বানরদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ত্যাগ করে হিমালয় থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে এক বটগাছের তলায় বাস করে মার সেবা যত্ন করতে লাগলেন। সেই সময় বারানসীর এক ব্রাহ্মণ পুত্র তক্ষশিলায় গিয়ে এক বিখ্যাত আচার্যের কাছে বিদ্যা অর্জন করেছিল। তার বিদ্যা শিক্ষা শেষ হলে সে আচার্যের কাছে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করছিলেন। অঙ্গবিদ্যার প্রভাবে আচার্য জানতে পেরেছিলেন তার শিষ্যের চরিত্র অত্যন্ত কঠোর, নিষ্ঠুর ও নির্মম। তিনি তার

শিষ্যকে বললেন, তুমি অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। এই প্রকৃতির লোকদের চিরদিন ভালো যায় না। কোন না কোন সময় মহাদুঃখ এসে উপস্থিত হবেই। সুতরাং, তুমি এই নিষ্ঠুর স্বভাব ত্যাগ কর। পরে যাতে অনুতাপ করতে হয় এমন কোন কর্ম করো না। এই বলে আচার্য তাকে বিদায় দিয়েছিলেন।

ব্রাহ্মণকুমার আচার্যকে প্রণাম করে বাড়িতে ফিরে সংসারী হয়েছিলেন। কিন্তু অন্য কোন বিদ্যার মাধ্যমে জীবিকা অর্জনে সুবিধা করতে না পেরে সে ঠিক করেছিল ধনুবিদ্যার মাধ্যমে জীবিকা অর্জন ও সংসার চালাবেন। ব্যাধবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের চিন্তা করে সে বারাণসী নগর থেকে দূরে এক গ্রামে গিয়ে বসবাস করছিলেন। তিনি ধনুক ও তূণী নিয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। কোন হরিণ দেখলে তাকে হত্যা করে সেই মাংস বিক্রি করে সংসার চালাতেন।একদিন বনে কোন শিকার না পেয়ে বনের মাঝখানে এক ফাঁকা জায়ঘায় একটি বট গাছ দেখতে পেল। সে এই প্রকান্ড গাছ দেখে ভাবল, এই গাছে নিশ্চয় কিছু পাওয়া যাবে। এই চিন্তা করে সে বটগাছের দিকে আগাতে থাকল। ঐ সময় বোধিসত্ত্ব ও তার ভাই তাদের মাকে খাইয়ে গাছের শাখার আাড়লে বসেছিলেন। ব্যাধকে আসতে দেখে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, ব্যাধ তাদের অন্ধ ও জরাজীর্ণ মাকে হত্যা করবে না।

এদিকে ব্যাধ সেই অন্ধ ও জরাজীর্ণ বানরীকে বটগাছের তলায় দেখতে পেয়ে ভাবল, খালি হাতে বাড়িতে না ফিরে এই বানরীকে মেরে নিয়ে যাওয়া ভালো। এই ভেবে ব্যাধ যখন তীর নিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন, তখনই বোধিসত্ত্ব শাখার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তীরের সামনে দাড়িয়ে বললো তাকে হত্যা করতে, বিনিময়ে তার মাকে ছেড়ে দিতে। ব্যাধ রাজি হয়ে বোধিসত্ত্বকে হত্যা করে, তার কথা না রেখে তার বৃদ্ধা মাকে হত্যা করতে চাইল। তখন আবার শাখার আড়াল থেকে ছোট ভাই চুল্লনিন্দক এসে, তার মাকে হত্যার বদলে তাকে হত্যা করতে বললেন এবং মাকে ছেড়ে দিতে বললেন। ব্যাধ রাজি হয়ে চুল্লনিন্দককেও হত্যা করল। কিন্তু ব্যাধ দুই ভাইয়ের কথা রাখলেন না। সে তাদের বানরী মাতাকেও হত্যা করে তিনটি প্রাণীর মৃতদেহ একটি বাঁকের শিকায় চাপিয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু সেই সময় সেই নিষ্ঠুর পাপীষ্ঠ ব্যাধের মহা পাপের ফলে ব্যাধের বাড়িতে বজ্রপাত হলা। বাড়ির সাথে সাথে তার স্ত্রী ও ছেলেও দগ্ধ হলো। বজ্রের আগুনে সম্পূর্ণ ঘর পুড়ে গিয়ে শুধুমাত্র খুঁটিগুলো অবশিষ্ট রইলো। এই সময় গ্রামের একজন তাকে সব জানালো। সে তার মাংস, তীর, ধনুক, ফেলে দিয়ে স্ত্রী পুত্র শোকে বিলাপ করতে লাগলো। এই অবস্থায় ব্যাধ ঘরে ঢুকতে গেলে একটি খুঁটি ভেঙ্গে তার মাথার উপর পড়ল। সেই আঘাতে তার মাথা ফেটে রক্ত বেরোতে লাগল। এমন সময় সেই জায়গার মাটি ফাঁক হয়ে গেল। পৃথিবী তাকে গ্রাস করতে উদ্যত হলো। তখন সে গাথার মাধ্যমে আচার্যের কথা স্মরণ করে বলল, ‘হায়, আচার্য আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, পরে অনুতাপ করতে হয় এমন কোন কাজ করো না। কিন্তু নিষ্ঠুর ও

পাপীষ্ঠ আমি সে কথা শুনিনি। পাপের বীজ যেমন হয়, তার ফলও তেমনি হয়। এটাই হচ্ছে প্রকৃতির নিয়ম। এই ভাবে বিলাপ করতে করতে ভূগর্ভে সে পড়ে গেল। পৃথিবী তাকে গ্রাস করলো।[২৪]

উপরোক্ত জাতকটি খুবই শিক্ষণীয় একটি জাতক। এখানে একই সাথে বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতি করণীয় ও প্রাণী হত্যার কুফল সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। বোধিসত্ত্ব ও তার ছোট ভাই দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে সমস্ত কিছুর মোহ পরিত্যাগ করে বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করতে হবে। বিপদে পাশে দাড়াত হবে। আজকের সমাজে দেখা যায়, যেখানে পিতা মাতা তাদের সর্বস্ব চিন্তা বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিন্তা করে, নিজের সুখের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে সন্তানকে আরো ভালো রাখার চেষ্টা করেন, কখনো সবচেয়ে প্রিয় বস্তু নিজে ভোগ না করে সন্তানদের দিয়ে দেয়। সেখানে কিছু সন্তানরা পিতা মাতা বৃদ্ধ হল তাদের অবহেলা করে, বোঝা মনে করে, তাদের দায়িত্ব নিতে চায় না। একসাথে থাকতে চায় না, তাদের বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসে। বোধিসত্ত্ব সেখানে আজ থেকে আরো কয়েক হাজার বছর আগেই দেখিয়ে দিয়েছেন কিভাবে নেতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে, নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে বৃদ্ধা মমতাময়ী মা কে বাঁচাতে হয়, বাঁচানোর চেষ্টা করতে হয়। আবার এই গল্পে আমরা এক নিষ্ঠুর পাপীষ্ঠ মানুষকে দেখতে পাই, যিনি তার অকুশল কর্ম দ্বারা নিষ্ঠুরতার সব মাত্রা অতিক্রম করেছে। একই সাথে তিনজন বানরকে হত্যা করেছে। সম্পূর্ণ পরিবার ধ্বংস করে ফেলেছে। কথা দিয়েও কথা রাখেনি। তার নিষ্ঠুরতা জনিত অকুশল কর্মের ফল তিনি সাথে সাথেই পেয়েছেন। তিনি যেমন একটি সম্পূর্ণ পরিবার ধ্বংস করেছেন, তিনিও প্রিয় পরিবারের মৃতদেহ সাথে সাথেই দেখেছেন। প্রকৃতি তাকেও ক্ষমা করেনি। তার অকুশল কর্মের শাস্তি স্বরূপ পৃথিবী তাকে নিজের মধ্যে গ্রাস করেছে। এই গল্পের শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উপলব্ধি করে আমাদের প্রাণী হত্যা নামক চরম অকুশল কর্ম ত্যাগ করা উচিত এবং নিয়মিত কুশল কর্মে ব্রতী হওয়া উচিত। উপকারীর উপকার স্বীকার না করে অপকার করার ফলাফল আমরা পূর্বের সত্যং কিল-জাতকে আলোচনা করেছি। সেখানে দুষ্টকুমারের ভয়াবহ পরিণতি দেখেছি এবার 'মহামতি জাতকে আমরা আবার উপকারীর অপকার করলে কি ফলাফল হয় তা দেখব এবং বোধিসত্ত্বের পারমী পূরণের মাধ্যমে তিনি কি কি কুশল কর্ম সম্পাদন করেছিলেন তা জানব।

প্রাচীনকালে বারণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে কাশীগ্রামে এক কৃষক ব্রাহ্মণ ছিল। একদিন তিনি ক্ষেতে জমি চাষ করার সময় তার গরুগুলি ছেড়ে দিয়েছিলেন। গরুগুলি বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে ঘুরতে বনে পালিয়ে যায়।
ক্রমে বেলা বাড়তে থাকলে তিনি তার গরু খুঁজতে খুঁজতে হিমালয় প্রদেশে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। তিনি কোন পথে এসেছেন, কোথায় যাবেন তা বুঝতে পারেন না। তিনি প্রায় এক সপ্তাহ পর্যন্ত অনাহারে থাকার পর একটি গাব গাছ দেখতে পেলেন। তিনি সেই গাছে উঠে ফল খেতে

লাগলেন। হঠাৎ করে তিনি সেখান থেকে পিছলে পড়ে ষাট হাত নিচে অন্ধকার গহ্বরে তিনি দশদিন আটক ছিলেন।

বোধিসত্ত্ব ঐ সময় বানরকূলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি খুবই বলবান ছিলেন। প্রাপ্ত বয়সে তিনি মহাকপি হয়ে উঠেন। (কপি শব্দের অর্থ হচ্ছে বানর) একদিন বোধিসত্ত্ব বন্য ফল খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে সেই গহ্বরের সামনে আসেন। সেখানে তিনি সেই অসহায় ব্রাহ্মণকে দেখতে পান। তিনি সেই ব্রাহ্মণকে সেই গর্ত থেকে উদ্ধার করেন। ব্রাহ্মণ ফলমূল ও জল খেয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে দেখেন বোধিসত্ত্ব কিছুটা দূরেই ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে। এ সময় কৃষক বোধিসত্ত্বের মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করেন, তাকে মেরে খাবার উদ্দেশ্যে। সাথে সাথে বোধিসত্ত্বের ঘুম ভেঙে গেল ও তিনি লাফ দিয়ে এক গাছে উঠে পড়লেন। শীলভঙ্গ হবে বলে তিনি কৃষকের উপর রাগান্বিত হলেন না, বরং তাকে সেই বন থেকে বের হওয়ার রাস্তা দেখিয়ে দিলেন। এদিকে উদ্ধারকারী প্রাণদাতার হত্যা করার চেষ্টা করার ফলাফল সাথে সাথেই পেলেন। তিনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলেন। তার হাত ও পায়ের আঙ্গুল ক্ষয় হয়ে গেল। তার মুখ, কান, নাক বিকৃত হয়ে গেল। তার মুখমণ্ডল প্রেতাকৃতি ধারণ করল। সাত বছর তিনি এই অসীম যন্ত্রনা ভোগ করে বেড়াতে লাগলেন। অবশেষে একদিন বারানসীর মৃগাবীর নামক উদ্যানে ঢুকে মাটির উপর কলা পাতা বিছিয়ে শুয়ে পড়লেন। এমন সময় বারাণসী রাজ সেই উদ্যানে বেড়াতে এসে পাপীষ্ঠ ব্রাহ্মণকে দেখতে পেলেন। কোন দুষ্কর্মের ফলে তার এই অবস্থা তা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রাহ্মণ গাথার মাধ্যমে উত্তর দিলেন। "আমি এক ব্রাহ্মণ কৃষক। একদিন আমার চাষের দুইটি গরু পালিয়ে যায়। আমি টানা সাতদিন তাদের খুঁজতে থাকি। পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হিমালয় প্রদেশের পর্বতের কাছেই এক গভীর বনে ঢুকে পড়ি। সাত দিন অনাহারে থাকায় আমি ক্ষুধায় খুব পিড়িত হয়ে উঠি। হঠাৎ একটি ফলে ভরা গাব গাছ দেখে সেই গাছে উঠে ফল খেতে থাকি। গাছের একটি শাখা এক গভীর খাদের উপর ঝুকে ছিল। সেই শাখায় অনেক ফল থাকায় আমি তাতে উঠতে গিয়ে খাদে গিয়ে পড়ি। সেই খাদের নিচে সামান্য জল জমে ছিল বলে আমার হাড় চূর্ণবিচূর্ণ হয়নি। সেই খাদে আমি দশদিন অনাহারে পড়ে রইলাম।দশদিন পর দেখলাম এক বিশাল বানর সেই গাছে ফল খাচ্ছে। আমাকে উদ্ধার করার জন্য আমি তার কাছে বিনীত অনুরোধ করলাম। সেই মহাকপি আমাকে তার পিঠে চড়িয়ে খাদ থেকে উদ্ধার করল। এই উদ্ধার কার্যে তার অনেক পরিশ্রম হওয়ায় সে অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। আমাকে উপরে উঠিয়ে সে বলে আমি অনেক ক্লান্ত। আমি এখন ঘুমাব। তুমি আমার কাছে থেকে রক্ষা করবে। এই বনে অনেক হিংস্র পশু আছে। কেউ যেন আমার ক্ষতি না করে।

এই বলে মহাকপি ঘুমিয়ে পড়ল। আমি তখন দশদিন না খেতে পেয়ে ক্ষুধার জ্বালায় ভুগছি। তাই আমি ভাবলাম হাতের কাছে যেহেতু কোন খাদ্য দ্রব্য নেই, তখন এই বানরকেই খাব। এই ভেবে একটি পাথর নিয়ে বানরের মাথায় আঘাত করলাম। কিন্তু দীর্ঘদিন অনাহারে থাকায়, আমার হাতে তেমন কোন জোড় ছিল না। মহাকপি জেগে গিয়ে গাছের উপর উঠে পড়ল। সে তখন আমার দিকে জল ভরা চোখে তাকিয়ে বলল, "তুমি নীচাশয় ও পাপীষ্ঠ । তাই পাপকর্মের কথা তোমার মাথায় আসল। এই ধরনের কর্ম আর কখনো করো না। আমি তোমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলাম। আর তুমি আমার প্রাণ বধের চিন্তা করলে। আমি আশির্বাদ করি এমন পাপের শাস্তি তোমায় পেতে না হয়।" তিনি গাছের ডালে ডালে পথ দেখিয়ে নিয়ে আমাকে সেই বন পার করে দিল। সেই মহাকপি চলে যেতেই আমার সারা শরীরে কুষ্ঠ দেখা দিল। আমার সারা শরীর বিকৃতাকার ধারণ করল। আমি শহর গ্রাম যেখানেই যেতাম মানুষ আমাকে তাড়িয়ে দিত। অবশেষে আমি ঘুরতে ঘুরতে এই উদ্যানে আসি।

রাজার সাথে যে সকল লোকজন ছিল তাদের উদ্দেশ্য করে ব্রাহ্মণ বলল, 'আমার মত কেউ কখনো মিত্রের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করো না। তাহলে তোমার ও এমন সাথে সাথেই ফল পাবে। আমার মত কুষ্ঠ রোগী হবে।' ব্রাহ্মণ যখন আত্মকাহিনি বর্ণনা করছিলেন রাজার কাছে তখন হঠাৎ করেই মাটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। এক বিশাল গর্তের সৃষ্টি হল। ব্রাহ্মণ দেখতে দেখতে তার মধ্যে চলে গেলেন এবং অবীচি নরকে উৎপন্ন হলেন। রাজা তখন উদ্যান থেকে বের হয়ে নগরে চলে গেলেন।[২৫]

উপরোক্ত জাতকে বোধিসত্ত্বের এই শিক্ষা সকলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। তিনি নিজের জীবন বিপন্ন করে কৃষককে বাঁচিয়েছেন। কৃষক তার মাথায় পাথর দিয়ে আঘাত করা সত্ত্বেও তিনি কৃষকের প্রতি কোন রকম প্রতিহিংসা মূলক আচরণ না করে চরম সহনশীলতা, উদারতা, শীলবান ও ক্ষান্তির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি যদি সেখান থেকে তখন চলে যেতেন, তাহলে সেই বনেই এক সময় কুশল কর্ম তিনি করেছেন বলেই তিনি বোধিসত্ত্ব। এতগুলো কুশল কর্ম করেছেন বলেই তিনি মহামতি সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধ হয়ে জন্মাতে পেয়েছেন। তার কুশল কর্মের ফলাফল তাকে এই জন্ম প্রদান করেছে। অপরদিকে পাপীষ্ঠ কৃষক ও তার অকুশল কর্মের ফল বিশ্বাসঘাতকতার ফল ইহকাল ও পরকাল দুই সময়েই পেয়েছেন। বর্তমান জন্মে তিনি সাত বছর অশেষ কষ্ট ভোগ করেন। লোকে তাকে সহ্য করতে পারত না। তার বিকৃত দর্শন রূপ দেখে তাকে তাড়িয়ে দিত। অনেক অবহেলা ও কষ্টে সে টানা সাত বছর দুঃখ ভোগ করে পৃথিবী তাকে গ্রাস করে নিয়েছে তার এই মহা দুষ্কর্মের ফল স্বরূপ মৃত্যুর পর অধীচি নরকে উৎপন্ন হয়েছে। এভাবে আমরা এই জাতক থেকে কুশল কর্মের ও অকুশল কর্মের ফলাফল জেনে কুশল কর্মে বলীয়ান হতে পারি।

গৌতম বুদ্ধের বর্ণিত জাতকের গল্পগুলো মানবজীবনের প্রতিটি পদে পদে শিক্ষা দেয়। কর্মবাদের শিক্ষা দেয়। কুশল অকুশল কর্মের শিক্ষা দেয়। জাতক সাহিত্যের প্রতিটি গল্পই কর্মবাদের শিক্ষা। এখানে যেমন স্ব-ইচ্ছা, উদ্যম ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মানুষ অনেক কিছু করতে পারে তার শিক্ষা দেয়, দশবিধ কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে তার সুফল পায়, তেমনি অকুশল কর্ম করার মাধ্যমে যে মানুষের ভয়াবহ দূর্গতি হয় এই ঘটনা দেখা যায়। জাতক শিক্ষা দেয় কুশল কর্ম, মঙ্গলজনক কর্ম, সম্যক কর্ম, শুভ কর্ম, অপরের হিতের জন্য কর্ম যেমন ব্যক্তির জীবনকে স্বার্থক করে তোলে, বর্তমান জীবন ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনে সুখের সঞ্চার করে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে, জীবনকে স্বার্থক করে, স্বর্গ ও নির্বাণ প্রাপ্তি নিশ্চিত করে, তেমনি অকুশল কর্ম, অমঙ্গল জনক কর্ম, অশুভ কর্ম, অপরের জন্য ক্ষতির কারণ হয়। এরূপ কর্ম বর্তমান ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনে মহাদুঃখের সঞ্চার করে, জীবনে দুঃখ ডেকে আনে, মৃত্যু পরবর্তী নরক নিশ্চিত করেও বারবার এই মহাদুঃখময় জীবনে সবসময় অনুসরণ করে । এজন্য আমাদের উচিত হবে জাতক পাঠের মাধ্যমে এর বিষয়গুলো উপলব্ধি করে, কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে বর্তমান জীবন ও পরজন্মে সুখ, শান্তি, উন্নতি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করে জীবন আলোকিত করা এবং কুশল কর্ম চেতনার মাধ্যমে উদ্ভাসিত চিত্তে সকল অকুশল কর্মের অন্ধকার দূরীভূত করা।

তথ্য নির্দেশিকা

১. ভূমিকা, *জাতক সমগ্র*, সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, কামিনী প্রকাশালয়, পঞ্চম প্রকাশ, জানুয়ারী, ২০১৪, পৃ. ৬

২. *জাতক*, সুমন কান্তি বড়ুয়া, বাংলা পিডিয়া, ২০১৪

৩. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস* ১*ম খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা, ১৯৮০, বাংলা একাডেমী) পৃ. ২৫৬

৪. Jatakas, 1st, 2nd Part, Bangla, *TPS*, Bangladesh, p.60

৫. সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ*, প্যাপিরাস, ঢাকা, জুলাই, ২০০৬, পৃ. ২৪৬

৬. জাতক পরিচিতি, *বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা*, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, এস,এস,সি প্রোগ্রাম, ২০১৯, পৃ. ১০৮

৭. শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ, *জাতক চতুর্থ খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী, ৪৯৯ নং জাতক, শিবিজাতক, পৃ. ৮৩৭-৮৪৬

৮. শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির, উদ্বৃত্ত, *দশ পারমী ও চরিযা ত্রিপিটক*, ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৮৭, পৃ. ২৭

৯. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক প্রথম খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা,১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী), ৮৬ নং শীলমীমাংসা জাতক, পৃ. ৩৮০-৩৮৩

১০.শ্রীঈষান চন্দ্র ঘোষ, *জাতক তৃতীয় খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা, ১৩৯১, বাংলা, করুণা প্রকাশনী), ৩১৬নং শশ জাতক, পৃ. ৮২-৮৭]

১১. ১২. শ্রীঈষান চন্দ্র ঘোষ, *জাতক প্রথম খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী), ১০ নং সুখ বিহারী জাতক, পৃ. ১৪২-১৪৪

১২. শ্রীঈষান চন্দ্র ঘোষ, *জাতক তৃতীয় খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী), ৩৯৯ নং গৃধ্রজাতক, পৃ. ৩০৮-৩১০

১৩. ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘনিকায় দ্বিতীয় খণ্ড*, মহাবর্গ, প্রথম অখণ্ড প্রকাশ, (কলকাতা, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ, মহাবোধি বুক এজেন্সি), মহাপরিনির্বাণ সূত্র, ৩১নং, পৃ. ২৮৭

১৪. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক দ্বিতীয় খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রন, (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী) ২৮৮ নং মৎস্যদান জাতক, পৃ. ১০৪১-১০৪৪

১৫. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক প্রথম খণ্ড*, দ্বিতীয় খণ্ড, (কলকাতা, ১৩৯১, বাংলা, করুণা প্রকাশনী), ৮৩ নং কালকর্ণী জাতক, পৃ. ৩৭৫-৩৭৭

১৬. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক প্রথম খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা, ১৩৯১, বাংলা, করুণা প্রকাশনী) ২ নং বন্নুপথ জাতক, পৃ. ১০৯-১১৩

১৭. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক প্রথম খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী) ২২ নং কুকুর জাতক, পৃ. ১৭৬-১৭৮

১৮. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক প্রথম খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী) ৪২ নং কপোত জাতক, পৃ. ২৪৮-২৫০

১৯. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক প্রথম খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা, ১৩৯১, বাংলা, করুণা প্রকাশনী) ৩৮ নং বক জাতক, পৃ. ২২১-২২৫

২০. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক প্রথম খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী) ৩৩ নং সম্মোদমান জাতক, পৃ. ২০৯-২১১

২১. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক দ্বিতীয় খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা, ১৩৯১, বাংলা, করুণা প্রকাশনী),১৯৩ নং চূলপদ্ম জাতক, পৃ. ৭৬০-৭৬৬

২২.শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক দ্বিতীয় খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রন (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী) ১৯৪ নং মণিচোর জাতক, পৃ. ৭৬৬-৭৬৯

২৩. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক প্রথম খণ্ড*, দ্বিতীয় খণ্ড, মুদ্রণ (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী), ৭৩ নং সত্যং-কিল-জাতক, পৃ. ৩৩১-৩৩৬

২৪. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক দ্বিতীয় খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী) ২২২ নং চূল্লনিন্দক জাতক, পৃ. ৮৩৭-৮৪০

২৫. শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক পঞ্চম খণ্ড*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী), ৫১৬ নং মহাকপি জাতক, পৃ. ৮৬-৯৩

উপসংহার

পৃথিবীতে যতগুলো ধর্ম ও দর্শন প্রচারিত হচ্ছে তাদের মধ্যে বৌদ্ধ দর্শন অন্যতম। গৌতম বুদ্ধের উপদেশ ও বাণীর মাধ্যমে দর্শনটির উদ্ভব। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর যে মতবাদ রয়েছে বা তিনি যে উপদেশ দিয়েছেন তার উপর ভিত্তি করেই 'বৌদ্ধ দর্শন'। দুঃখময় জগৎ পাড়ি দিয়ে কিভাবে দুঃখকে জয় করা যায় তা এই দর্শনতত্ত্বে বিধৃত হয়েছে। দর্শনটিতে যে কয়েকটি বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে তার মধ্যে কর্মবাদ অন্যতম।

বুদ্ধের কর্মবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে মানুষের কাছে প্রচার করেছেন যাতে মানুষ তার নিজ কর্ম সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। কর্মবাদের মূল আলোচ্য বিষয় হলো, মানুষকে তার কৃতকর্মের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এটি হচ্ছে একটি সর্বজনীন ও অলঙ্ঘনীয় নিয়ম। কুশল ও অকুশল কর্ম ভেদে প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফলাফল ভোগ করতে হবে।

বৌদ্ধ দর্শন তত্ত্বের মধ্যে কর্মতত্ত্ব এক গভীর রহস্য। কর্মের এমনি শক্তি রয়েছে যে, তা সমগ্র বিশ্ব পরিচালনা করছে। কর্মের এই শক্তির কারণে কুশল ও অকুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে মানুষে মানুষে বিভাজন তৈরি হচ্ছে। সুকর্ম বা কুশল কর্ম সম্পাদনকারীরা মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করছে এবং পরবর্তীতে মানুষ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করে উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করে, নিরোগ, আনন্দময় জীবন অতিবাহিত করছে। আবার দুষ্কর্ম বা অকুশল কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিরা তাদের কর্মফল স্বরূপ মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হচ্ছে। দীর্ঘকাল নরক ভোগ করার পর বিভিন্ন পশুযোনীতে উৎপন্ন হচ্ছে। আর মানুষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করলে নীচুকূলে জন্মগ্রহণ করে দুঃখ, শোক, অসুস্থতা ও বঞ্চনার মাধ্যমে দুঃখময় জীবন অতিবাহিত করছে। কর্মফল প্রত্যেক প্রাণীকে ছায়ার মত অনুসরণ করে। অকুশল কর্ম করে তা থেকে পালিয়ে বেড়ানো ও তা থেকে পরিত্রাণের কোন সুযোগ নেই। সুতরাং, বলা যায় যে কর্ম সুখ, দুঃখময় পুনঃজন্ম সংঘটন করতে বা সুখ-দুঃখ দান করতে সক্ষম। এই কর্ম ও কর্মফল রূপে জীবন প্রবাহ সামনের দিকে ধাবিত হচ্ছে যা চলবে অনন্তকাল পর্যন্ত। এই কর্ম প্রভাবেই কেউ উচ্চপদে আসীন হচ্ছে, আবার কেউ সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করছে। অতীত কর্মের দ্বারা যেমন বর্তমান জীবন পরিচালিত হচ্ছে, তেমনি আমাদের বর্তমান কর্মের দ্বারা ভবিষ্যত জীবন নির্ধারিত হবে।

যে সকল কর্মের মধ্যে কোন রকম লোভ, দ্বেষ, মোহ ও পাপের অস্তিত্ব নেই তাকে কুশল কর্ম বলে। আর লোভ, দ্বেষ, মোহ ও পাপযুক্ত কর্মই হলো অকুশল কর্ম। কুশল কর্মের মাধ্যমে যেমন দেশ, জাতি, ও সমাজের সর্বস্তরের উন্নতি সম্ভব, তেমনি অকুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কোন দেশ, জাতি ও সমাজকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করা সম্ভব, সমূলে বিনষ্ট করা সম্ভব। তাই বুদ্ধ বলেছেন, কুশল কর্মের নিয়মিত অনুশীলন করতে এবং কোন রূপ অকুশল কর্ম করে থাকলে, তা তখনই বন্ধ করতে। বৌদ্ধ দর্শনে সর্বদা দশ প্রকার অকুশল কর্মে

Dhaka University Institutional Repository

অনুৎসাহী করা হয় এবং দশ প্রকার কুশল কর্মের প্রতি উৎসাহী করা হয়। কুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি যেমন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়, সর্বস্তরে তার জয়জয়কার হয়, তেমনি তিনি মৃত্যুর পর সুগতি প্রাপ্ত হন। আবার অকুশল কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তির সমাজে কোন মূল্য থাকে না, কেউ তাকে সম্মান দেয় না এবং তিনি মৃত্যুর পর অবশ্যই দুর্গতি প্রাপ্ত হোন।

পরিশেষে বলা যায়, বৌদ্ধ দর্শন জগতে কর্মবাদ একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। বৌদ্ধ দর্শনের প্রতিটি ধাপেই রয়েছে কর্মবাদ সম্পর্কিত আলোচনা। কর্মবাদের আলোচনার মাধ্যমে বৌদ্ধ দর্শন যেমন সমৃদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে, তেমনি মানুষও এই কর্মবাদ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছে। সুকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে যেমন সকলের কাছে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকা যায় তেমনি দুষ্কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তি বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যায়। তাই আমাদের উচিত কুশল কর্মের অনুশীলন করা এবং অকুশল কর্ম পরিহার করা। তাহলেই সমাজে উন্নতি, শান্তি ও সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হবে। মানুষ পাবে মুক্তির দিশা।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা

অধ্যাপক এন. মূখার্জী, *দর্শন পরিক্রমা* (কলকাতা: বাণী প্রকাশন, ২০১৫)

অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণ (রাঙ্গামটি : ২০০৪, বনভান্তে প্রকাশনী), পৃ. ২২৭ আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, *বৌদ্ধ দর্শনে সত্য দর্শন* (কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০১০)

গিরিশচন্দ্র বড়ুয়া, *ধম্মপদ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৬)

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বৌদ্ধ ধর্ম, *গৌতম বুদ্ধের জীবন ও ধর্ম* (ঢাকা:প্রজ্ঞা প্রকাশনী সংস্থা: ২০১৩)

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, বৌদ্ধ দর্শনের বৈশিষ্ট্য: *বৌদ্ধ দর্শনের রূপরেখা*, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১)

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *বিদর্শন ধ্যান* (ঢাকা: অন্যধারা, ২০১৩)

ড.সুকোমল চৌধুরী, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন* (কলিকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৯৭)

ড.সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত, *বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (কলিকাতা: ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী)

ড. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা :বাংলা একাডেমি, ২০০০)

ড. প্রিয় নাথ বড়ুয়া, *কার্যকারণনীতি* (চট্টগ্রাম : ২০০৭)

ড.জগন্নাথ বড়ুয়া, *গৌতম বুদ্ধের মহাজীবন ও ধর্মদর্শন* (ঢাকা : নররাগ প্রকাশনী, ২০১৪)

ডা. সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, *দশ পারমী ও চরিযা ত্রিপিটক*, চট্টগ্রাম

নীরুকুমার চাকমা, *বুদ্ধ ঃ ধর্ম ও দর্শন*(ঢাকা: অবসর প্রকাশ; ২০০৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা* (বাংলাদেশ : ১৯৩৫, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি ২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা* (বাংলাদেশ :ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা* (বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি)

পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা (বাংলাদেশ:* ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা* (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, প্রজ্ঞালোক স্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরগাথা* (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনূদিত, *খুদ্দকনিকায়ে থেরীগাথা* (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি-২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনূদিত, খুদ্দক নিকায়ে থেরী গাথা (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি-২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে থেরীগাথা (বাংলাদেশ :* ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি-২০১৭)

শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির অনূদিত, খুদ্দক নিকায়ে প্রেতকাহিনি (বাংলাদেশ :ত্রিপিটক পাবলিশিং, সোসাইটি)

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো বিমান কাহিনি অটঠকথা প্রসঙ্গ, (ঢাকা : কল্পতরু, ২০১৭)

পবিত্র প্রিপিটক, শ্রী শীলালঙ্কার মহাস্থবির, *খুদ্দক নিকায়ে বিমান বত্থু* (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে ধম্মপদ* (বাংলাদেশ : পাবলিশিং সোসাইটি ২০১৭),

পবিত্র ত্রিপিটক, শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে জাতক*, প্রথম খণ্ড (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *খুদ্দক নিকায়ে জাতক*, তৃতীয় খণ্ড (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি ২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, খুদ্দক নিকায়ে ধর্মপদ (বাংলাদেশ : ১৯৫৪, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, *খুদ্দক নিকায়ে মিলিন্দপ্রশ্ন*, শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক অনূদিত (বাংলাদেশ ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭),

পবিত্র ত্রিপিক ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক অনুদিত, *মধ্যম নিকায়*, ৩য় খণ্ড সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত, ১৯৯৩, পঞ্চম খণ্ড (বাংলাদেশ:ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক, ডক্টর বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্তৃক অনূদিত, ক্ষুদ্রকর্ম বিভঙ্গ সূত্র ও মহাকর্ম বিভঙ্গ সূত্র, *সূত্রপিটকে মধ্যম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড কলিকাত: (ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৩)

বাংলাপিডিয়া (ঢাকা: ২০১৫, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাাইটি)

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষু শীলভদ্র, *ধম্মপদ* (কলকাতা:মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৯)

ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘনিকায় দ্বিতীয় খণ্ড*, মহাবর্গ, প্রথম অখণ্ড প্রকাশ, (কলকাতা, ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দ, মহাবোধি বুক এজেন্সি)

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু কর্তৃক অনূদিত *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চক নিপাত (বাংলাদেশ: ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

মিহির গুপ্ত অনূদিত, *ধর্মপদ* (কলিকাতা:হরফ প্রকাশনী: ১৯৯৬)

রাহুল সাংকৃত্যায়ন, *দর্শন দিগদর্শন*, অনুবাদ, ছন্দা চট্টোপাধ্যায় প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড)

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৮), পৃ. ২২৫-২২৬

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস* ১*ম খণ্ড*, প্রথম প্রকাশ (ঢাকা, ১৯৮০, বাংলা একাডেমী)

শ্রী বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত,*মধ্যমনিকায়*, প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা: ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দ, যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক প্রথম খণ্ড*, দ্বিতীয় খণ্ড, মুদ্রণ (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী)

শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক দ্বিতীয় খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী)

শ্রীঈষান চন্দ্র ঘোষ, *জাতক তৃতীয় খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী)

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ, *জাতক চতুর্থ খণ্ড*, দ্বিতীয় মুদ্রণ (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী)

শ্রীঈষানচন্দ্র ঘোষ, *জাতক পঞ্চম খণ্ড*, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় মুদ্রণ, (কলকাতা, ১৩৯১ বাংলা, করুণা প্রকাশনী),

শ্রীঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, ষষ্ঠ খণ্ড (কলিকাতা:১৩৯১, করুণা প্রকাশনী)

শান্তি ভূষণ চাকমা, *বৌদ্ধধর্ম্ম ও দর্শন* (রাঙ্গামাটি:২০০০)

শ্রী চারচন্দ্র বসু, *ধম্মপদ (*কলকাতা: ১৯০৪)

শ্রী জ্যোতিপাল মহাথের, *কর্ম্মতত্ত্ব*, (কুমিল্লা: ১৯৭৯)

সরদার ফজলুল করিম, *দর্শনকোষ* (ঢাকা :২০০৬ প্যাপিরাস,)

সাধনকমল চৌধুরী, *মিলিন্দপঞ্হ*, (কলিকাতা: করুণা প্রকাশনী)

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ, *জাতক সমগ্র*, কামিনী প্রকাশালয়

ইংরেজি

Bhikkhu Bodhi Pariyatti, *A comprehensive monual of Abhidhamma,* (2000)

Charles Drekmeier Kingship *and* C*ommunity in Early India,* (1962: Standford University Press)

Dhaka University Institutional Repository

Drewes, David (2010), "*Early Indian Mahayana Buddhism I: Recent Scholarship*" Religion Compass

Dan Lusthaus *Buddist Phenomenology: A Philosophical Investigation of Yogacora Buddhism and the ch'eng wei-shih,Lun,* (2014: Routledge)

Edward Conze, ed. *Buddhist Texts Through the Ages* (Oxford,:1954)

George Chryssides; Margaret Wilkins *A Reader in New Religious Movements,* (2006: A & C B)

Hallisey, Charles (2015), *Therigatha: Poems of the First Buddist Women*, Cambridge MA Harvard University Press. pp. X. ISBN 9780674427730

Kalupahana, David J, *A History of Buddhist Philosophy*, Delhi: Motilal Banarsidass Publishers Private Limited) and (David Kalupahana, *Mulamadhyamakakarika of Nagarjuna*, Delhi : 1994, Motilal Banarsidass, 2006, P. 1

Milinda's Question. Vol-1. Translator's Introduction, (Sacred Books of Buddhists. Vol-33. London 1963

Norman, Kenneth Roy (1983), *Pali Literature*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Thanissaro Bhikkhu (Geoffrey DeGraff (2015) *Poems of Elders* P.3

Thanissaro Bhikkhu, *Introducion to the patimokkha Rules* (1994). Acess to insight org,

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

গবেষণার শিরোনাম : বৌদ্ধ দর্শনে কর্মবাদঃ স্বরূপ অন্বেষণ

গবেষক : গৌতম দাস, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। তাঁর উপদেশের মধ্যে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি সমগ্র দর্শনের আধার বা আশ্রয়। কুশল-অকুশল, ভালো-মন্দ ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকেই আমার সচরাচর কর্ম বলে অভিহিত করি। আবার অন্যভাবেও বলা যায়, চিত্ত ও চৈতসিকের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অভিব্যক্তিই কর্ম। তবে যেকোনো কর্ম আগে চিত্তে উৎপন্ন হয় তারপর কায়িক সহযোগে তা সংগঠিত হয়। প্রতিটি কর্মই অপর একটি কর্মের সাথে ওতোপ্রেতভাবে জড়িত। বুদ্ধ মনে করেন, কর্মনিয়ম যান্ত্রিক নিয়ম নয়। নিয়মটি স্বীকার করে যে, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এ তিনটির মধ্যে মানুষ ইচ্ছা করলে তার পূর্বতন কর্মের পরিবর্তন করে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তর করতে পারে। এমনকি অমৃতময় মুক্তি লাভ (নির্বাণ) করতে পারে। এরূপ নিজের কৃতকর্মের নিয়ন্ত্রক অন্যকেউ না হয়ে মানুষের উপর নির্ভর হওয়ায় মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতাকে আরো বেশি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

আমাদের যাপিতজীবনে প্রাণীদের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে অসংখ্য মতবাদ রয়েছে। তবে বুদ্ধ মতে, বৈষম্যের অন্যতম কারণ কর্ম। এখানে কর্মকে মানসিক কার্য-কারণ বিধি-বিধান বলা হয়। কর্মের অনুসিদ্ধান্তই হলো পুর্নজন্ম। বলা বাহুল্য, কর্ম এবং পুর্নজন্ম একে-অপরের পরিপূরকও বটে। মহামতি গৌতম বুদ্ধই সর্বপ্রথম প্রজ্ঞোচিত যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্য উপস্থাপন করেন।

জীবের জীবন হচ্ছে কর্ম নির্ভর। কর্মের বিশ্বব্যাপী শক্তি সমস্ত বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। কর্মের বিচিত্র ও বহুমুখি শক্তির কারণে জীবনপ্রবাহ অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলছে।কুশল ও অকুশল কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে, কর্মের বিভাজনে কেউ কেউ ব্রহ্মলোক, কেউ দেবলোক, কেউ মনুষ্যলোক আবার কেউ অন্য প্রাণীরূপে জন্ম গ্রহণ করছে। বৌদ্ধ দর্শনের মূল ভিত্তিই হচ্ছে কর্মবাদ। নীচ কূলে জন্মগ্রহণ করে সুকর্ম করে সে পরবর্তীতে উচ্চ স্থানে আসীন হচ্ছে আবার উচ্চকূলে জন্মগ্রহণ করে ও দুস্কর্মের মাধ্যমে তার পদমর্যাদা হারিয়ে সে তার স্থান হচ্ছে নীচুকূলে। সুতরাং কর্মই বন্ধু আবার দুষ্কর্মই তার শত্রু। বুদ্ধ বলেন কর্মফল অচিন্তনীয় এবং জগতে কর্মই শ্রেষ্ঠ। কর্মের অসাধারণ ও বিচিত্র শক্তি দার্শনিক সমাজকে মুগ্ধ করেছেন।

প্রত্যেক মানুষই আলাদা চরিত্র আলাদা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এদের মধ্যে কেউ স্বল্পায়ু, আবার কেউ দীর্ঘ জীবনের অধিকারী, কেউ সুন্দর আবার কেউ কুৎসিত, কেউ ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী, আবার কেউ সুস্বাস্থ্যের

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারী, কেউ অন্ধ, বধির, প্রতিবন্ধী আবার কেউ অনেক উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী। কেউ ধনী, কেউ গরীব, কেউ রোগী, কেউ নিরোগ, কেউ জ্ঞানী, কেউ অজ্ঞানী ইত্যাদি কর্ম ফলের কারণেই হয়ে থাকে। কারণ প্রাণী মাত্রই কর্মের অধীন। মহামতি বুদ্ধের মতে, মানুষে মানুষ প্রাণীতে প্রাণীতে এ বৈষ্যমের কারণ হচ্ছে কর্ম। কর্মই প্রাণীগণকে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন পদ প্রদান করে। তাদের উৎপত্তির কারণ, কর্ম বন্ধু, কর্ম প্রতিশরণ। কেননা, কর্মই হীন-উৎকৃষ্টরূপে বিভক্ত করে। এই কর্মপরিণতির সবিস্তার গৌতম বুদ্ধ শুভ মানবককে উপলক্ষ করে চুল্লকর্মবিভঙ্গ সূত্রে মানুষের বৈষম্যের কারণ প্রদর্শন করে বলেন : মানুষ মাত্রই কর্মের অধীন। কর্মের ফল ভোগ করতে হয়। কর্ম তাদের উৎপত্তির কারণ, কর্ম বন্ধু, কর্ম প্রতিশরণ। কেননা, কর্মই হীন-উৎকৃষ্টরূপে বিভক্ত করে। বুদ্ধ বলেন: জন্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ, কৃষক, শিল্প, বণিক, চাকর, চোর, যুদ্ধজীবী, যাজক ইত্যাদি হয়। এই জন্য প্রতীত্যসমুৎপাদ দর্শনকারী ও কর্মফলে বিশ্বাসী পণ্ডিত কর্মকে সম্যকভাবে দর্শন করে সতত সুন্দরভাবে জীবন যাপন করেন।

বুদ্ধ তাঁর দর্শনে কর্মবাদকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর সমগ্র দর্শনে কর্মবাদকে জানার জন্যই আমি উপরি-উক্ত শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভ রচনা করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করি। আমার গবেষণা কর্মের অধ্যায় উপসংহারসহ অধ্যায় পাঁচটি। অধ্যায়গুলো হলো : প্রথম অধ্যায়: বৌদ্ধধর্মে কর্মবাদ : উৎস সন্ধান; দ্বিতীয় অধ্যায় : বৌদ্ধ কর্মবাদ : প্রায়োগিক ব্যবহারের স্বরূপ অন্বেষণ; তৃতীয় অধ্যায় : কর্মের শ্রেণি বিভাজন; চতুর্থ অধ্যায়: জাতক সাহিত্যে বর্ণিত কর্মবাদ তত্ত্ব : একটি পর্যালোচনা এবং উপসংহার। প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে আমি যথাসাধ্য আলোচনা করার চেষ্টা করছি।